শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি

মহান মে দিবস ২০১৫

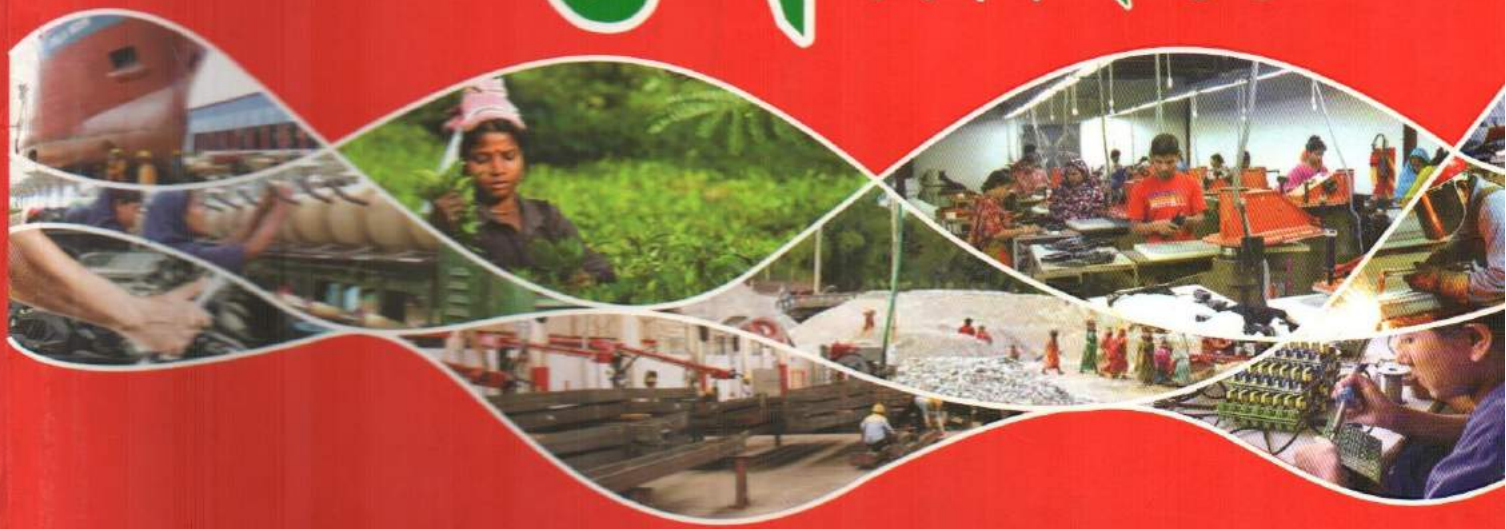

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মহান মে দিবস ২০১৫

মোঃ ফোরকান আহসান
তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

'যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা
গৌরী, যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান'

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৮ বৈশাখ ১৪২২
০১ মে ২০১৫

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবময় দিন। আজ থেকে ১২৯ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ১ মে শিকাগো শহরে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক সংগঠনের যে বিজয় অর্জিত হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে বিশ্বে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। আমি আজকের এ দিনে বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান বিশ্ব পরিবর্তনশীল এবং তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করণসহ বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন করার বিকল্প নেই। এ জন্য শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। বর্তমান সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং দেশের মেহনতি শ্রমজীবী মানুষ এর সুফল পাচ্ছেন।

শিল্প-কলকারখানা সামগ্রিক উন্নয়নে প্রয়োজন মালিকের সদিচ্ছা, শ্রমিকের একাগ্রতা এবং পারস্পরিক আন্তরিকতা। সকল পক্ষের ইতিবাচক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ পণ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করতে 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শ্রমিক-মালিকের মধ্যকার বিদ্যমান আন্তরিক সম্পর্ক অব্যাহত রেখে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্পোদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহান মে দিবসের সাথে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার, স্বার্থ ও কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আট ঘণ্টার কর্মদিবস, মজুরি বৃদ্ধি, কাজের উন্নততর পরিবেশসহ শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত মে দিবসের তাৎপর্য এখনো বিশ্বে সমভাবে প্রযোজ্য। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সকলে এগিয়ে আসবেন, মহান মে দিবসে এ প্রত্যাশা করি।

আমি মহান মে দিবস ২০১৫ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ বৈশাখ ১৪২২
০১ মে ২০১৫

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। তাঁদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৮৮৬ সালের এ দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা আত্মাহুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত- আমি শোষিতের পক্ষে"। তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মানের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আমরা বিএনপি-জামাত জোট আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা চালু করেছি। পোষাক শিল্পসহ ৩৮টি শিল্প খাতের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করেছি। জাতীয় শিশু শ্রমনীতি ২০১০ এবং জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্নমূখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। দেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে সরকারের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে আমরা 'কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর'কে অধিদপ্তরে উন্নীত করেছি। এর জনবল তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনবল বৃদ্ধি করাসহ শ্রম পরিদপ্তরকে আরও শক্তিশালী করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আমরা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

আমি আশা করি, মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক এবং মালিক পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও নিবেদিত হবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি মে দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমজীবী মানুষ অধিকার আদায়ের জন্য যে বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবদীপ্ত অধ্যায় রচনা করেছিল, আমরা তার ১২৯ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। ঐতিহাসিক এই দিনে আমি দেশের সকল মেহনতি মানুষকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম করে গেছেন, সেই ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল শ্রেণীর অবহেলিত, নিষ্পেষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করে ২০২১ সালের মধ্যে সুখী ও সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর।

পরিবর্তনশীল প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্ববাজারে গুণগত মানসম্পন্ন উন্নত পণ্য উৎপাদন ব্যতীত আপন সত্তাকে প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। দক্ষ শ্রমিক ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের পূর্বশর্ত। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্কের ভিত্তিতে সুষ্ঠু ও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা হলে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতির গতিও সচল থাকবে। একথা অনস্বীকার্য যে, শ্রমিক-মালিক পরস্পর প্রতিপক্ষ নয় বরং উৎপাদনের দু'টি অঙ্গ, যারা একে অন্যকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই শ্রমিক-মালিকের মধ্যকার ইতিবাচক সম্পর্ক সুরক্ষার মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রকে স্থিতিশীল রাখতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আসুন এবারের মে দিবসে আমরা সরকার-শ্রমিক-মালিক সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রমক্ষেত্রে নিরাপদ ও আন্তরিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে এক অনন্য দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার গ্রহণ করি।

(মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি)

সভাপতি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

বাণী

আজ থেকে ১২৯ বৎসর পূর্বে ১৮৮৬ সালে শ্রম ঘণ্টা নির্ধারণ, শ্রমিকের মর্যাদা ও শ্রমিকের ন্যায় সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা যে আত্মত্যাগ করেছিল তা স্মরণ করার অভিপ্রায়ে মহান মে দিবস ২০১৫ উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি সকল শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে মে দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবরের মত এবারও মে দিবস উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করায় মে দিবসের অনুপ্রেরণায় সকল মেহনতী মানুষ অনুপ্রাণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ দিবসের মহেন্দ্রক্ষণে আমি সেই সকল শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করছি যাদের রক্তে আজ শ্রমিকদের ন্যায় সংগত দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্বের যে কোন দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী তথা মেহনতী মানুষ। দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একজন শ্রমিক দরদী নেত্রী। তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও নির্দেশনায় বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রমিক আইনকে সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হয়েছে। অতীতের যে কোন সরকারের তুলনায় সরকারী বেসরকারী খাতে শ্রমিকদের কল্যাণে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমবান্ধব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়।

বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগকে অবারিত করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার সরকারী সুযোগকে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যেন কেবল মাত্র শ্রমিকের ও দেশের সার্বিক কল্যাণে কাজে লাগান সে জন্য আমি অনুরোধ জানাই।

শ্রমজীবী মানুষের দ্রুত কর্মসংস্থানের প্রয়াসে বর্তমান সরকার একদিকে যেমন নূতন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করছেন ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন তেমনি অন্যদিকে ইতোপূর্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া সকল শিল্প কারখানা চালু করার পদক্ষেপ নিচ্ছেন, যা দ্রুত আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীল করছে।

সর্বক্ষেত্রে আমাদের নির্লোভ ও সৎ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে আমরা যেন বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারি এটাই হোক এবারের মহান মে দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস-শ্রমজীবী মানুষের বীরত্বগাঁথা আত্মজাগরণের ইতিহাস। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গণপ্রজাতন্ত্রী বালাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালিত হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তরের সহযোগিতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান মে দিবস উদ্‌যাপন করছে। ১৮৮৬ সনের ১লা মে শিকাগো শহরে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ এক রক্তাক্ত অর্জন। এ মহান অর্জনকে সমুন্নত রেখে শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক কল্যাণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক এ দিনে দেশের সকল মেহনতি মানুষের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ, বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দু-ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আর এক দিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে"। বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক উক্তির অন্তর্নিহিত দর্শন নিঃসন্দেহে চিরদিন শ্রমজীবী মানুষের অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের সু-বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারে সম্পৃক্ত করতে ও দেশের শ্রমবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের অগ্রসরমান অর্থনীতিতে প্রধান দুই নিয়ামক-উদ্যোক্তা ও শ্রমিক। তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে শ্রম বান্ধব ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্ক রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ দেশের শিল্প পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখতে বদ্ধপরিকর। তারই লক্ষ্যে এবারের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি।"

শ্রমিক ও মালিকের সর্বাত্মক সহযোগিতায় শ্রম ক্ষেত্রের সকল সমস্যার ইতিবাচক সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আমরা সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করবো- মহান মে দিবসে এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।

(মিকাইল শিপার)
সচিব

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান 'মে দিবস' শ্রমজীবী মানুষের প্রেরণা ও আবেগের দিন। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশের দিন আজ। এ বিশেষ দিবসে ১৮৮৬ সালে ১ মে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ঐতিহাসিক আন্দোলন ও আত্মাহুতি-আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

শ্রমজীবী মানুষই মানব সভ্যতার স্রষ্টা। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত নিরাপত্তা, আইনগত অধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণ ও আইনানুগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। এ অধিদপ্তরে জনবল কাঠামো ৩১৪ থেকে ৯৯৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে এ অধিদপ্তরে ১৩১ জন নতুন পরিদর্শক যোগদান করেছেন। যোগ্য, প্রশিক্ষিত নব নিয়োগপ্রাপ্ত এ জনবল কলকারখানার পরিদর্শনে গুনগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে-আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সুস্থ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিল্পোন্নয়নে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক কল্যাণের ফলেই আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিধানাবলীর সাথে সংগতি রেখে সরকার শ্রমিক ও মালিকের সমন্বিত উদ্যোগে বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হোক।

মহান মে দিবস সফল হোক।

(সৈয়দ আহম্মদ)

শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস- শ্রমজীবী মানুষের বীরত্বগাঁথার ইতিহাস, আত্মজাগরণের ইতিহাস। এ দিনে বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিগত বছরগুলোর মত এবারও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তরের সহযোগিতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে মহান মে দিবস উদ্‌যাপন করছে।

উদ্যোক্তার পৃষ্ঠপোষকতা ও শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রম বিশ্ব সভ্যতাকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলার এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। আমাদের অগ্রসরমান অর্থনীতিতে প্রধান দুই নিয়ামক উদ্যোক্তা ও শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণের জন্য সরকার প্রতিনিয়ত সচেষ্ট। তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমবান্ধব ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্ক রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ দেশের শিল্প ক্ষেত্রকে স্থিতিশীল রাখতে বদ্ধপরিকর।

শ্রমিক ও মালিকের সর্বাত্মক সহযোগিতায় শ্রমক্ষেত্রের সকল সমস্যার ইতিবাচক সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আমরা সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করব- এই হোক মহান মে দিবসের শপথ।

সকলকে মহান মে দিবসের শুভেচ্ছা।

(এস. এম. আশরাফুজ্জামান)

Country Director
ILO Country Office for Bangladesh

Message

On behalf of the International Labour Organization (ILO) it is a great pleasure to celebrate May Day along with all Bangladeshis.

Every country's greatest assets are its people and the large number of young, economically-active Bangladeshis creates a "demographic dividend" for the nation. However, their true potential can only be unlocked through the creation of decent, productive work.

Over the past year Bangladesh has, with the support of ILO and other partners, continued to make progress towards ensuring better and safer working conditions. Much attention has been placed on the all-important ready-made garment (RMG) sector. Garment factories are becoming safer, following a significant effort to carry out structural, fire and electrical inspections. With so many lives and livelihoods are at stake, we must all ensure that this momentum does not falter.

Worker rights in the RMG sector continue to be strengthened through the establishment of new trade unions. Together we must forge an enabling environment for unions to function effectively while creating better understanding of the positive role organised labour can play in enhancing both workers' rights as well as industrial productivity.

Since the Rana Plaza collapse an unprecedented effort has taken place to provide compensation to survivors and families of the dead. However it is neither realistic nor beneficial to repeat such a complex exercise whenever accidents occur. A national employement injury insurance scheme should therefore be established for the RMG sector which would benefit workers and employers alike.

We furthermore, recognise government efforts to reform the national enabling environment for industry skills development so as to increase employability for men and women. A skilled workforce is a productive workforce and we will continue to help bridge the gap between skils supply and demand through closer collaboration with the private sector as well as by implementing reforms on a wider scale.

May Day is also a time to recognise the contribution of Bangladeshi men and women who are filling labour shortages of economies around the world. They too, deserve Decent Work free of exploitation. To this end the efforts made by the Bangladesh government towards bringing fairness in labour migration governance are laudable.

Finally, I would like to convey our heartfelt thanks to the Government, employers, workers and other stakeholders for their commitment to advancing the Decent Work agenda and for their whole- hearted support extended to ILO and its activities. I wish you all a happy May Day celebration.

Srinivas B. Reddy

সভাপতি
দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ
চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি

বাণী

মহান মে দিবস উপলক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শুভেনির প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। মহান মে দিবসে দেশের মেহনতি ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য।

আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন কাজকর্ম এগিয়ে নিতে শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠা করে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী কাজে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। মহান মে দিবসের তাৎপর্যকে সমুন্নত রেখে শিল্প শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সহায়ক পরিবেশ এবং শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

মহান মে দিবস উদ্‌যাপন স্মরণ ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে সমঝোতার সম্পর্ক এবং সর্বস্তরে সামাজিক ন্যায়বোধ ও প্রত্যয়ের উন্মেষ ঘটালে মে দিবসের চেতনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব হবে।

ঐতিহাসিক এ দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

(কাজী আকরাম উদ্দিন আহ্‌মদ)

BILS

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস্

বাণী

নির্ধারিত কর্মঘন্টার দাবীতে আঠারশত ষাটের দশকে প্রথমে ভারতবর্ষে এবং আঠারশত সত্তর দশকে অষ্ট্রেলিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সে আন্দোলন বেশিদুর অগ্রসর হতে পারেনি। একই দাবীতে ১৮৮৬ সনের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরে হে মার্কেটের রুটি কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরাও আন্দোলনে অংশ নেয়। শ্রমিকদের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন ঠেকানোর জন্য মালিকদের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমন ও ২, ৩ ও ৪ মে পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং অনেক শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে বিচারের নামে প্রহসন করে আগস্ট স্পাইজ, আরবাড্ পারশন, লুইস লিঙ্গে, জর্জ এ্যাঞ্জেল, এড্লফ ফিসারকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়।

হে মার্কেটের নিহত শ্রমিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ১৮৮৯ সনে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মে মাসের ১ম দিবসটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে বাংলাদেশ সহ সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ এই দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে উদ্যাপন করে আসছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার হে মার্কেটের নিহত শ্রমিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ১লা মে বাংলাদেশে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন।

মহান মে দিবস বিশ্বের মেহনতি মানুষের ঐক্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্দীপ্ত হওয়ার একটি দিন। সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে এ দিবসটি নিজ অধিকার আদায়ের প্রেরণার চিরন্তন উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষও নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালন করে। এই দিনে বাংলাদেশ সহ সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

মহান মে দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য "শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি"। অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারের জন্য শ্রমিক-মালিক ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিক মালিকের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের পাশাপাশি প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক এবং একে অন্যের প্রতি অবিচল আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।

মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কৌশলসম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা অত্যাবশক। একই সাথে শ্রমিকদের ন্যায়ানুগ মজুরী প্রদানসহ পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সরকার এ সকল অঙ্গীকার পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলেই প্রতীয়মান হয়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।

এবারের মহান মে দিবসে দেশের মালিক ও শ্রমজীবী মানুষকে নতুন করে উদ্যোগী হতে হবে। শ্রম, সততা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের নতুন ধারা সৃষ্টি করতে "শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি" স্লোগানটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত সময়োচিত প্রত্যয়। এটাই হোক আমাদের সমৃদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলার মেহনতি মানুষ এক হও-দুনিয়ার মজদুর এক হও

(হাবিবুর রহমান সিরাজ)

সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাণী

প্রতি বছর মহান মে দিবস আসে। পহেলা মে দিনটি গৌরবোজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বহন করে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমি সব মেহনতি মানুষের সাথে একাত্মতা ও সংহতি ঘোষণা করছি। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে সেই রক্তক্ষয়ী ও আত্মত্যাগের ঘটনা স্মরণ করে রাখার উদ্দেশ্য শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশের দিন হিসেবে মহান মে দিবস সৃষ্টি হয়েছে। এ মহান দিবস উপলক্ষে আমরা সব শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

১৮৮৬ সালের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকের সমস্যার স্বীকৃতি এসেছে, শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সংঘবদ্ধ হবার দাবী গৃহীত হয়েছে এবং শ্রমিক সমাজ পণ্য নহে বরং সমাজে সব শ্রেণীর মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য তাদের শ্রম ও সাধনা অগ্রণী ভূমিকা রেখে থাকে। অবস্থার প্রেক্ষাপটে মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যেমন শ্রমিকের সমস্যা উপলব্ধি করে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়াসী হয়ে থাকেন, তেমনি শ্রমিক সমাজ পূর্বের চেয়ে অনেক দায়িত্বশীল হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটাতে সক্রিয় হয়েছেন। ফলে সুসম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক ও সুদৃঢ় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন তথা সব মালিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, উৎপাদনের সাথে জড়িত সব পক্ষ মে-দিবসের শিক্ষা ও গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং নিজ নিজ কর্তব্যে ব্রতী হয়ে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জন্ম। সুতরাং একাগ্রতা, ঐক্য, উদ্যম, সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা আমরা রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবো। বেকারত্ব দূর করে দারিদ্র্য বিমোচন বাংলাদেশ গড়তে প্রত্যয়ী হবো। এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(তপন চৌধুরী)

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

মহান মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের এক গৌরবদীপ্ত উজ্জ্বল দিন। এ মহান দিনে ১৮৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোর হে মার্কেটে দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবী প্রতিষ্ঠা করার জন্য আত্ম-উৎসর্গকারী শ্রমিকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ-নির্যাতন আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মে দিবসের মূল চেতনায় বিশ্বাস করে। সে জন্য শিল্প উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে নতুনের বিজয় কেতন উড়াবার। যে মেহনতি মানুষ তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে নতুন পৃথিবী ও উন্নত দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে সেই শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সাধন এবং শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষিতের পক্ষে আজীবন কথা বলেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই দিনটিকে জাতীয় শ্রমিক দিবস এবং সরকারী ছুটি ঘোষণা করে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করেন। পরিশেষে মহান মে দিবসের উদ্দীপনা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত কর্মসূচী ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলার মেহনতি মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ।

বর্তমান মহাজোট সরকার শ্রমিক-মালিক সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রমক্ষেত্রে সকল সমস্যার ইতিবাচক সমাধানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে এক অনন্য দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করবে। আসুন এবারের মে দিবসে আমরা এই অঙ্গীকার গ্রহণ করি।

(আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ)

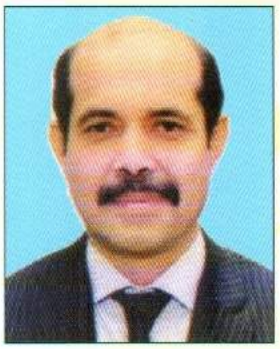

সভাপতি
বিজিএমইএ

বাণী

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১লা মে হচ্ছে একটি বিশেষ দিন। এদিনে আমি বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

মহান মে দিবসে পৃথিবী জুড়ে সকল শ্রমিক একাত্মতা প্রকাশ করে, সংহতি প্রকাশ করে – সেইসাথে প্রত্যাশা করে সুন্দর জীবনের যেখানে কাজের অধিকার, মর্যাদা আর মজুরি হবে নিশ্চিত। আমি শ্রমিক ভাই-বোনদের এই প্রত্যাশার সাথে শতভাগ একাত্মতা প্রকাশ করছি। এই মে দিবসে আমি সমগ্র পোশাক শিল্প পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের অর্থনীতি যারা সচল রেখেছেন, জাতীয় অর্থনীতির সেসব গর্বিত সেনা – পোশাক শিল্পে নিয়োজিত আমাদের প্রাণপ্রিয় সকল শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। একইসাথে তাজরিন ফ্যাশন্স লিঃ এর অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজা দূর্ঘটনাসহ বিভিন্ন দূর্ঘটনায় যেসব পোশাক শ্রমিক ভাই-বোন মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদেরকে বেদনার সাথে স্মরণ করছি এবং তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ঘটে যাওয়া রানা প্লাজা দূর্ঘটনা শুধুমাত্র পোশাক শিল্পই নয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক বিশাল ট্র্যাজেডী। এ দূর্ঘটনার পর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে শিল্পকে নিরাপদ, ঝুঁকিহীন ও কমপ্লায়েন্ট করার জন্য, সেইসাথে Sustainable Industry গড়ার জন্য আমরা গত ২টি বছর ধরে সরকার, ক্রেতা ও ILO-কে সাথে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টির পথে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এতে ইউরোপিয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। গত অক্টোবর ২০১৪ ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত Compact এর বৈঠকেও বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে আরও করণীয় বিষয়গুলো দ্রুততার সাথে সম্পাদনের জন্য এ বৈঠকে আমাদেরকে বলা হয়েছে। আমরা ILO-এর সহায়তায় পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়ন করছি।

পোশাক শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়ার জন্য বিজিএমইএ দফতরে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ সেলও খোলা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে পোশাক শিল্পের ৪৩৪টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নিবন্ধনকৃত হয়েছে। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, ট্রেড ইউনিয়ন করা শ্রমিকের মৌলিক অধিকার– তবে তা একান্তভাবে হতে হবে গঠনমূলক।

আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে সুশৃঙ্খল মানবসম্পদ, যাদেরকে তৈরি পোশাক শিল্পে সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে। ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে তৈরি পোশাক শিল্পে এই মানবসম্পদকে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই। এই রূপকল্প বাস্তবায়নে বিজিএমইএ ILO এর সহযোগিতায় গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান Center of Excellence for Bangladesh Apparel Industry (CEBAI) স্থাপন করেছে, যা Dhaka Apparel Summit 2014 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ২১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে Launching করেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ।

আমি পোশাক শিল্প পরিবারের পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, সরকার পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছেন যার সুফল ভোগ করছে শিল্প ও শ্রমিক ভাই-বোন।

পরিশেষে, শ্রমের যথাযোগ্য মর্যাদা নিশ্চিত করে এবং শ্রমিক-উদ্যোক্তার মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে অর্থনীতিকে আরও বেগবান ও শক্তিশালী করবো – মহান মে দিবসে এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।

(মোঃ আতিকুল ইসলাম)

সভাপতি

ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল ফর দি ওয়ার্কার্স এডুকেশন ও
বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

বাণী

মহান মে দিবস মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও রক্ত মূল্যে অধিকার আদায়ের স্মারক দিবস। বাংলাদেশের সকল শ্রমজীবী মেহনতি মানুষকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিবাদন। দিনটির প্রেক্ষাপট শুরু হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের হাজার বছরের বঞ্চনার ইতিহাস ও তা থেকে মুক্তি লাভের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, যা আজও চলমান শ্রমিক গোষ্ঠীকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার দিকে বরাবরই কুণ্ঠিত ছিল তথাকথিত আধুনিক সমাজ। নানা অজুহাতে খেটে খাওয়া মানুষের উপর নির্যাতন এবং তাদের রক্ত ঘামের বিনিময়ে অর্জিত ও উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশ কুক্ষিগত করার প্রবণতা ছিল স্বাভাবিক ও স্বীকৃত। শ্রমজীবী মানুষের নিয়তিই ছিল যেন শোষণ ও নির্যাতন। দৈনিক ১৮/২০ ঘণ্টা কাজ করতে হ'ত তাদের, ছিলনা ন্যায্য মজুরীর নিশ্চয়তা। এর প্রতিবাদে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে পথে নামে শ্রমিক শ্রেণী।

আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে প্রতিবাদরত শ্রমিকদের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ হয়। ১৮৮৬ সালের ১ মে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শ্রমজীবী মানুষ প্রতিষ্ঠা করে দৈনিক কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টা এবং সূচনা হয় মৌলিক অধিকারের লড়াই। এরপর আজ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র এ কর্ম ঘণ্টা মানা হয়নি। বাংলাদেশের শিল্প কারখানা ও কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র দৈনিক ৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা কার্যকর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বাস্তবায়িত হয়নি মৌলিক শ্রমমান। এন সি সি ডব্লিউ ই (NCCWE) এর পক্ষ থেকে সরকার ও মালিক পক্ষের কাছে সকল কর্মক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা ও মৌলিক শ্রমমান বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাচ্ছি, এবং আহ্বান জানাচ্ছি শিল্প কারখানা সহ সকল কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ শ্রমবান্ধব কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার। সেই সাথে সাধুবাদ জানাচ্ছি সেই সকল মালিক পক্ষকে যারা মৌলিক শ্রমমান তাদের প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করছেন। একই সাথে শ্রম কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মে দিবসের স্মরণিকা প্রকাশের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবারের মে দিবসের আহ্বান- "শ্রমিক, মালিক, সরকারের সৃজনশীল ঐক্য শিল্পের বিকাশের জন্য জাতীয় পুঁজি গঠনের পথকে করুক উন্মুক্ত"।

(এ. এ. মুকিত খান)

সভাপতি
বিকেএমইএ

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মহান মে দিবসের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে প্রতিবারের মত এবারও মে দিবস উদ্‌যাপন করছে এবং এ উপলক্ষে একটি সুভ্যেনিয়র প্রকাশ করছে।

কেননা মহান মে দিবস তার আপন মহিমায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে প্রতি বছরই ফিরে আসে আমাদের মাঝে নতুন করে নতুন কোন চেতনার বাণী নিয়ে। এই দিনটি যত না শ্রমিকদের শ্রম শৃঙ্খলা ও অধিকার ফিরে পাওয়ার, তার চেয়েও বেশি হচ্ছে সারা বিশ্বে শ্রমের মূল্য উপলব্ধির। এই কারণেই যুগ যুগ ধরে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি এই দিনে নিজেদেরকে নতুনভাবে এগিয়ে নেওয়ার শপথ নেয়। একইভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মহান মে দিবসের মূল নির্যাসকে আত্মপরিকল্পনায় নিয়ে নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। এই দিনটি নিয়ে কোটি কোটি শ্রমিক যেমন গর্ববোধ করে, ঠিক তেমনি এর নির্যাসকে পৃথিবীর সকলেই উপলব্ধি করে।

অধিকারবোধ মানুষকে আত্ম-উন্নয়নের পথে অগ্রসর করে দেয়। বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণিও তার অধিকারের পাশাপাশি আত্ম-উন্নয়নের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ফলে শ্রম এবং শিল্প উভয়ই লাভবান হচ্ছে। কেননা যে কোন শিল্পে পণ্য উৎপাদনে শ্রমিক ও শ্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া শ্রমিকের নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং সর্বোপরি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারই শিল্পের বিকাশ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এনে দেয় সমৃদ্ধি। আমরা জানি, আধুনিক শিল্প ব্যবস্থাপনায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি শিল্প উদ্যোক্তার দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং শ্রমিকের শ্রম ও অভিযোজন ক্ষমতাকে পরিকল্পনানুযায়ী কাজে লাগানোর মধ্যেই শিল্পের বিকাশ নিহিত। মহান মে দিবস শিল্পের সাথে শ্রমিকের শ্রম বিন্যাসের এই সম্পর্কের কথাকেই বারংবার আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

বিকেএমইএ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আধুনিক শিল্পের বিকাশ এবং তাতে উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে হলে কারখানায় শ্রমিকের শ্রম সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আধুনিকত্ব ও অভিনবত্ব আনয়ন জরুরী। তাই বিকেএমইএ-এর প্রচেষ্টা সবসময় একটা সুষম শিল্পবিন্যাস তৈরি করার; যেখানে উদ্যোক্তা ও শ্রমিকের মাঝে একটি হৃদ্যিক সম্পর্ক বিরাজ করবে। তবে প্রযুক্তিবিদ্যায় আধুনিক যন্ত্রকৌশলের উদ্ভাবনের কারণে শ্রমিক শ্রেণিরও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদেরকে আধুনিক করে নিজ নিজ শিল্প কারখানাকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য ইতিবাচক মানসিকতার বিকাশ ঘটানো জরুরী। আগামী দিনে আমাদের শ্রমিকসমাজ নিজেদেরকে আরও উৎপাদনশীল ও দক্ষ করে গড়ে তুলবে - এই আমাদের প্রত্যাশা।
মহান মে দিবস-২০১৫ সফল হোক।

(এ. কে. এম সেলিম ওসমান এম.পি)

যুগ্ম সমন্বয়ক
শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ

বাণী

পুঁজিবাদী শোষণের নিগড় থেকে মুক্তির জন্য শ্রমিকের দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠার রক্তাক্ত সংগ্রামের ঐতিহাসিক দিনের নাম হচ্ছে ১লা মে। ১৮৮৬ সালে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিজয়ের পথ ধরে আজও বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষ একদিকে যেমন বিজয়ের উচ্ছ্বাস করছে, অন্যদিকে শোষণ নির্যাতন বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচার জন্য লড়াইয়ের আঁকা-বাকা পথে এগিয়ে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে।

সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দায় বিপর্যস্ত অর্থনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যই পারে শ্রমিকদের আকাঙ্খা পূরণ করতে। মহান মে দিবসে আমাদের শপথ হোক "আসুক বাঁধা আসুক ভয়, লড়বে শ্রমিক আনবে জয়"।
দুনিয়ার মজদুর এক হও

(নইমুল আহসান জুয়েল)

মহান মে দিবস' ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত মে দিবস আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের পক্ষে Annual Performance Agreement স্বাক্ষর করছেন মাননীয় মন্ত্রীপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা এবং মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আলোচনারত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন এম.পি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এম.পি, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এম.পি, এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি.।

Bangladesh Framing the Future অনুষ্ঠানে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী ।

Bangladesh Framing the Future অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং উপস্থিত আছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী।

শ্রম বিধিমালা-২০১৫ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আলোচনারত মন্ত্রীপরিষদের সদস্যসহ শ্রম সচিব।

মহান মে দিবস-২০১৪ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী এবং মাননীয় শ্রম সচিব।

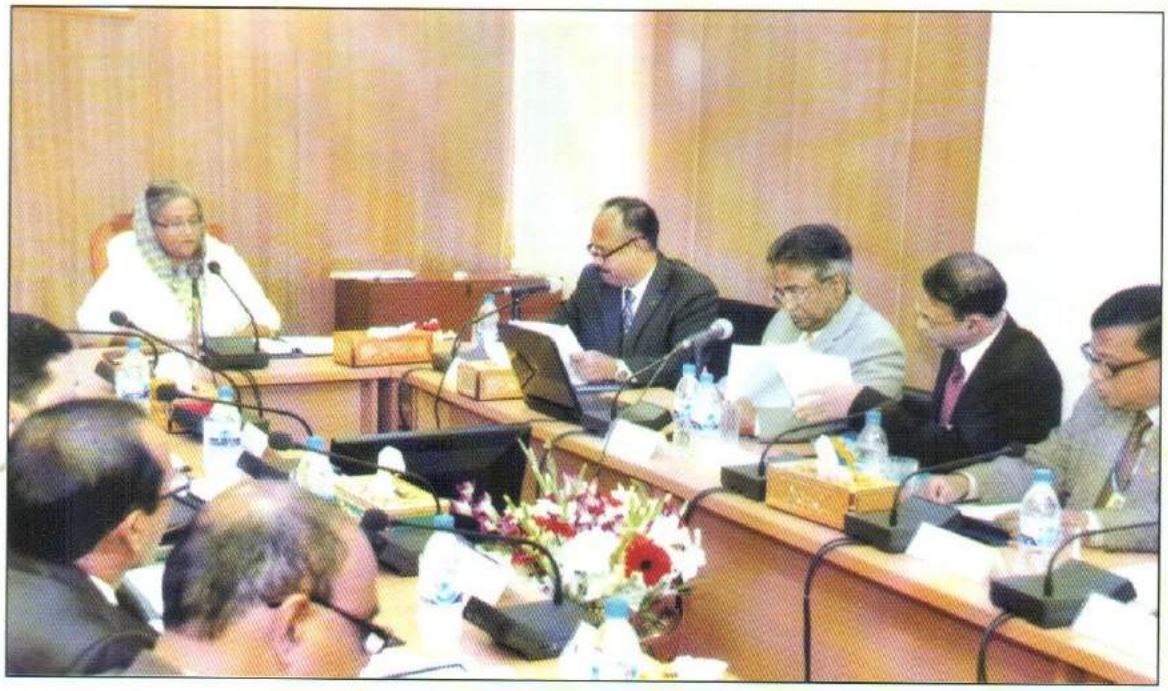

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে বক্তব্যরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

মহান মে দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত মে দিবস অনুষ্ঠানে দর্শক সারিতে বসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ।

তাজরীন গার্মেন্টস এ ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে চেক বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ডেনমার্ক সরকারের সঙ্গে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করছেন শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (ILC) এ বক্তব্যরত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (ILC)-এ মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী এবং মাননীয় শ্রম সচিব।

'National Tripartite Consultation on Strengthening Social Dialogue and Industrial Relations in Bangladesh" শীর্ষক Workshop এ বক্তব্যরত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

জার্মানীর হামবুর্গে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এর সাথে জার্মান শ্রম মন্ত্রীর সাক্ষাৎ।

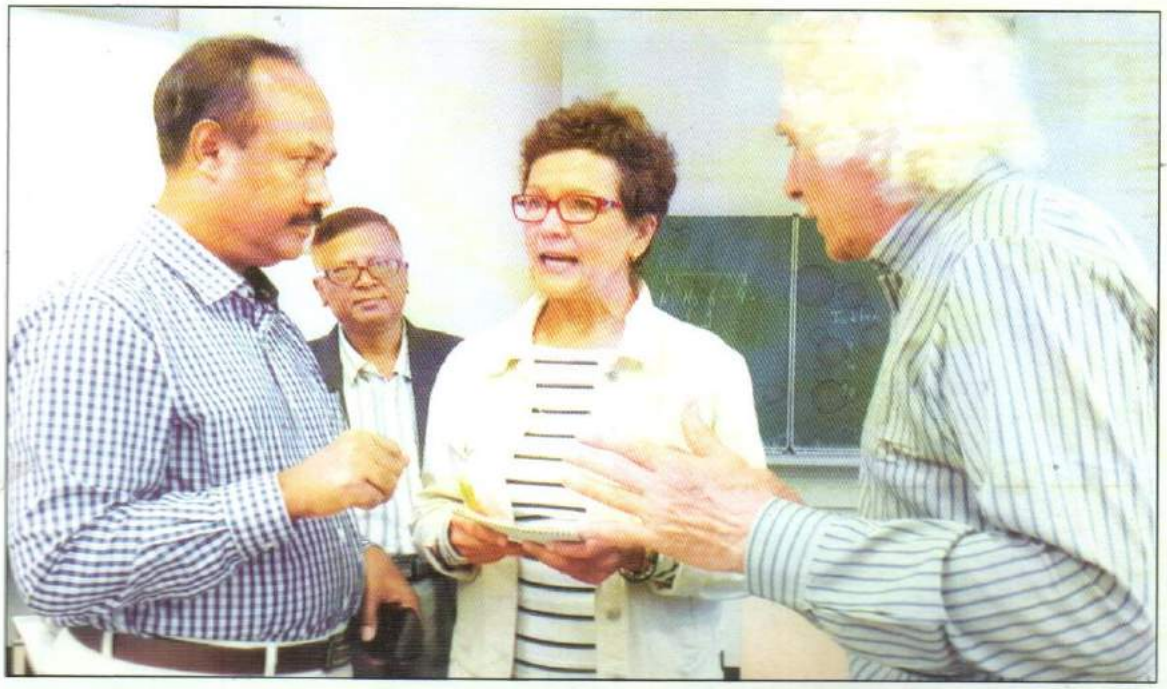

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি কর্তৃক জার্মানীর একটি কারিগরী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন।

প্রফিট শেয়ারিং এর চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং মাননীয় সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর সদর দপ্তরে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী এবং মাননীয় শ্রম সচিব।

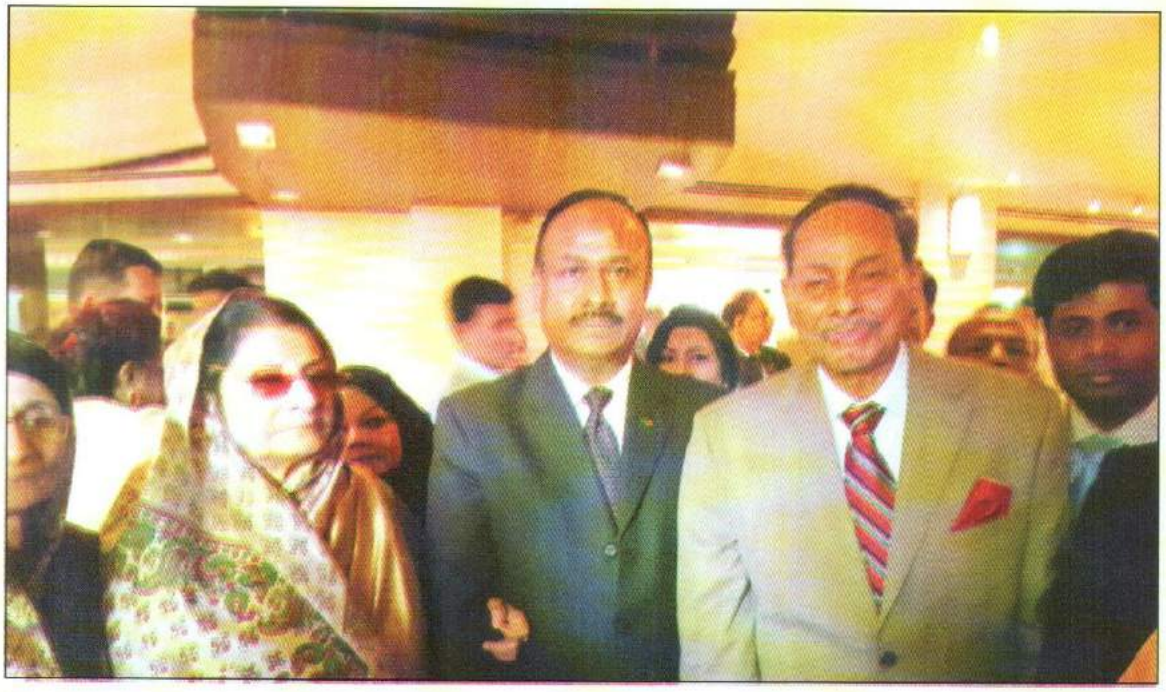

জাতীয় পার্টির সম্মানীত চেয়ারম্যানের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। পাশে রয়েছেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ এম.পি।

Ensuring Decent Work for Agriculture Workers' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ আইএলও সদর দপ্তরে আইএলও মহাপরিচালক Guy Ryder এর সাথে শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এর সাক্ষাৎ।

মহান মে দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত মে দিবস র‍্যালীতে অংশগ্রহণরত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং মাননীয় শ্রম সচিব।

"National Tripartite Consultation on Strengthening Social Dialogue and Industrial Relations in Bangladesh" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্যরত মাননীয় সচিব জনাব মিকাইল শিপার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বাটা সু কোম্পানী লিঃ কর্তৃক প্রদত্ত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেক গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

এশিয়ান কনজ্যুমার কেয়ার (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেক মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এর নিকট প্রদান করা হচ্ছে।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে যোগদানকৃত মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপারসহ অন্যান্য ডেলিগেটবৃন্দ।

এপিএম গ্লোবাল লজিস্টিক বিডি লিঃ কর্তৃক মাননীয় শ্রম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর নিকট শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেক হস্তান্তর করা হচ্ছে।

মহান মে দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে র‍্যালী উত্তর বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশস্থ বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিসহ কর্ণফুলি ইপিজেড (KEPZ) পরিদর্শন করছেন জনাব মিকাইল শিপার, মাননীয় সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ।

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মাননীয় শিল্প সচিব কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ এর প্রফিট শেয়ারিং এর চেক মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার এর নিকট হস্তান্তর করছেন।

শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রিফ্রেসার্স কোর্স ২০১৪-১৫ এর সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

মহান মে দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিটিভি টক-শোতে অংশগ্রহণরত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার ।

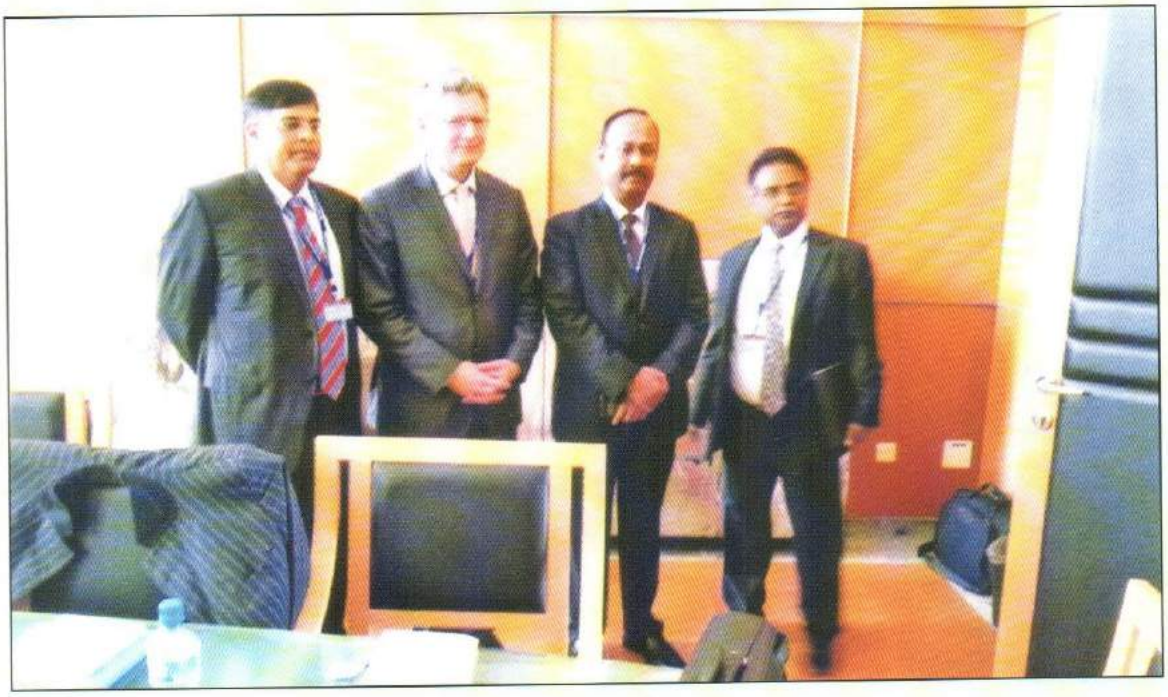

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ইউরোপীয় কমিশন (EC) প্রতিনিধিদের সাথে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে প্রাইমার্ক প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

জার্মানীর Air Bus কোম্পানী পরিদর্শনে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি এবং মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

মহান মে দিবস -২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিটিভি টক-শোতে আলোচনারত মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

১৬/৫/২০১৪ তারিখে ঢাকা জেলা মটরযান ওয়ার্কশপ মেকানিক ইউনিয়ন এর সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি। শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপারসহ অন্যান্য সদস্যবর্গ উপস্থিত রয়েছেন।

বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশস্থ পরিচালকের সাথে বৈঠক করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি, ।

নির্মাণ শ্রমিকদের গোষ্ঠী বীমা স্কিমের আওতায় বীমাকৃত অর্থের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি। তার পাশে উপবিষ্ট আছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মসিউর রহমান রাঙ্গা এম.পি এবং শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রিফ্রেসার্স কোর্স উদ্বোধন করেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি। পাশে উপবিষ্ট মহাপরিদর্শক জনাব সৈয়দ আহম্মদ এবং শ্রম পরিচালক জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরাধীন গাজীপুরের উপ মহাপরিদর্শকের কার্যালয় এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি ও মাননীয় শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার।

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
১	মহান মে দিবসের সংগ্রামের চেতনায় বাংলাদেশের শ্রমজীবী-পেশাজীবী মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ	ঃ শাজাহান খান, এম.পি	০১-০৫
২	মহান মে দিবস এবং আজকের বাংলাদেশ	ঃ মোঃ ইসরাফিল আলম, এম.পি	০৬-১২
৩	উন্নয়ন ভাবনা ও নীটওয়্যার শিল্প খাত	ঃ এ.কে.এম. সেলিম ওসমান, এম.পি	১৩-১৯
৪	রানা প্লাজা ও ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড	ঃ শিরীন আখতার, এম.পি	২০-২১
৫	অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ভূমিকা	ঃ তপন চৌধুরী	২২-২৩
৬	মহান মে দিবস ও পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা	ঃ মোঃ আতিকুল ইসলাম	২৪-২৬
৭	মহান মে দিবসের প্রেক্ষাপটে জাতীয় উন্নয়নে শ্রমিক কর্মচারীর ঐক্য	ঃ আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ	২৭-৩২
৮	"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি সোনার বাংলা গড়ে তুলি"	ঃ এস.এম.আশরাফুজ্জামান	৩৩-৩৫
৯	দাবী ও অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন	ঃ ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান	৩৬-৩৮
১০	কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ঃ চ্যালেঞ্জেস এন্ড অপরচুনিটিস	ঃ মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া	৩৯-৪৩
১১	কবিতা "মৃত্তিকা"	ঃ শফিক আলম মেহেদী	৪৪-৪৪
১২	কবিতা "শ্রমের উপাখ্যান"	ঃ নির্ঝর চৌধুরী	৪৫-৪৬
১৩	কবিতা "মে দিবসের চেতনা"	ঃ মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান	৪৭-৪৭
১৪	কবিতা "শ্রমিক আমার গর্ব"	ঃ এস.এস. আশরাফুল আহমেদ	৪৮-৪৮
১৫	কবিতা "জাগো দেশ জাগো জাতি"	ঃ উম্মে আছমা	৪৯-৫০
১৬	কবিতা "শ্রমজীবী শিশু"	ঃ তানিয়া ইয়াসমিন	৫১-৫১
১৭	কবিতা "অসহায় শ্রমিক"	ঃ নাফিজ ফাতেমা মিমিয়া	৫২-৫২

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
১৮	যৌথ দরকষাকষি	ঃ ড. মোহাম্মদ আলী খান	৫৩-৫৫
১৯	বাংলাদেশের উন্নয়নে শ্রমিক শ্রেণীর অবদান এবং বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ	ঃ মহিউদ্দিন আহমেদ খান	৫৬-৫৭
২০	মে দিবসের আহ্বান ও শেখ হাসিনার বাংলাদেশ	ঃ আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	৫৮-৫৯
২১	মুক্তির সংগ্রাম এবং মহান মে দিবস	ঃ আবদুল মতিন মাষ্টার	৬০-৬৫
২২	মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের মর্যাদার স্বীকৃতি দিবস	ঃ এ্যাড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান	৬৬-৬৬
২৩	২০১৫ সালের মে দিবসের প্রাসঙ্গিক ভাবনা	ঃ মোঃ মজিবুর রহমান ভূঞা	৬৭-৬৭
২৪	মে দিবসের চেতনা ও আমাদের অঙ্গীকার	ঃ ফজলুল হক মন্টু	৬৮-৬৯
২৫	মহান মে দিবসঃ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট	ঃ মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া	৭০-৭২
২৬	মে দিবসের চেতনা ও শিল্পোন্নয়ন	ঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী	৭৩-৭৪
২৭	মে দিবসের চেতনা ও বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ	ঃ রাজেকুজ্জামান রতন	৭৫-৭৭
২৮	নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং উপযুক্ত আইন প্রসঙ্গ	ঃ এ্যাড. মাহবুবুর রহমান ইসমাইল	৭৮-৭৯
২৯	মহান মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর করণীয়	ঃ চৌধুরী আশিকুল আলম	৮০-৮১
৩০	উৎপাদনশীলতায় দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক সংলাপের গুরুত্ব	ঃ কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ	৮২-৮৩
৩১	ট্রেড ইউনিয়নেরও প্রয়োজন বিশ্বায়নের	ঃ জেড, এম, কামরুল আনাম	৮৪-৮৬
৩২	মহান মে দিবস-লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা	ঃ আনোয়ার হোসেন খোকন	৮৭-৮৮
৩৩	মহান মে দিবস ও শিল্প বিরোধ উত্তরণ	ঃ মোঃ আব্দুর রশীদ	৮৯-৯১
৩৪	কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক বাংলাদেশ এবং মহান মে দিবস	ঃ মোঃ খোরশেদ আলম	৯২-৯৩
৩৫	শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে	ঃ খান আখতার হোসেন	৯৪-৯৭
৩৬	শ্রমিক অধিকার-স্বদেশ ও ভিনদেশ	ঃ মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ	৯৮-১০০

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
৩৭	শ্রম ও শিল্পের কল্যাণে শ্রমিক প্রশিক্ষণ	ঃ মোঃ বেল্লাল হোসেন শেখ	১০১-১০৪
৩৮	উৎপাদনশীলতা	ঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	১০৫-১০৮
৩৯	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিকদের সেফটি সম্পর্কে দু'টি কথা	ঃ এ্যাড. মোঃ বেলায়েত হোসেন	১০৯-১১০
৪০	মে দিবসের চেতনা ঃ শ্রম ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাবনা	ঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	১১১-১২০
৪১	মে দিবসের চেতনায় শ্রমিকের অধিকার	ঃ মোঃ শফিকুর রহমান	১২১-১২৪
৪২	Tips to prevent fire in the workplace	ঃ Md. Omar Faruq	১২৫-১২৬
৪৩	Steps taken by Government and Other Related Stakeholders after Rana Plaza Collapse at Savar on 24th April 2013	ঃ Mikail Shipar	১২৭-১৩৫

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

মহান মে' দিবসের সংগ্রামের চেতনায় বাংলাদেশের শ্রমজীবী-পেশাজীবী মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ

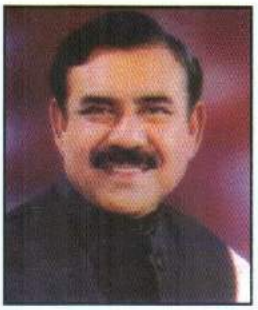

শাজাহান খান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

মহান মে' দিবসের সংগ্রামের ইতিহাস-শ্রমিকের শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের ইতিহাস। ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকদের অনুষ্ঠিত সমাবেশে মালিকদের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের গুলিতে অসংখ্য শ্রমিক নিহত হয়। সৃষ্টি হয় এক রক্তঝরা ইতিহাস। প্রতিষ্ঠিত হয় দুনিয়াব্যাপী শ্রমিকদের জন্য ৮ ঘণ্টা কাজের সময়।

১লা মে আজ শুধু শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দিনই নয়, বিশ্বের সকল শোষিত, নিপীড়িত জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচেতন ও সংগ্রামের দিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই মহান মে দিবসে শ্রমজীবী মানুষ অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়। মহান মে দিবসে শ্রমিকদের অবদান, আত্মত্যাগ, আত্মাহুতি ও অমরগাঁথা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে।

বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের বহু সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু ১ মে'র শ্রমিকের রক্তদানের ইতিহাস আজও মানুষকে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে। সংগ্রামের ইতিহাসের ধারায় যেখানে অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন, সন্ত্রাস এবং যেখানে মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব করে, সেখানেই মানুষ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে। বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের আন্দোলন ও সংগ্রাম ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯৬৬ সালে স্বাধীকার আন্দোলনে তেজগাঁও'এর শ্রমিক মনু মিয়ার রক্তদান, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক' লিখে সড়ক পরিবহন শ্রমিক নুর হোসেনের রক্তদান, ১৯৯৬ সালে গণআন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে আছে।

সরকার আসে সরকার যায়। প্রত্যেক সরকারের মতাদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক নয়। শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষের প্রতি দরদ এক নয়। আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের দলসমূহের সমন্বিত সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা, বিএনপি-জামাত ও স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলোর সমন্বিত সরকার প্রধান খালেদা জিয়ার শাসনামল বিশ্লেষণ করলে তা সুস্পষ্ট হবে।

১৯৯২ সালের জুন মাসে সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের ১১ দফা দাবীর ভিত্তিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আন্দোলনের ডাক দেয়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বিএনপি সরকার পুলিশ ও সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিয়ে চলমান ধর্মঘট নস্যাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী মির্জা আব্বাস ও প্রতিমন্ত্রী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ঢাকা শহরের বাস-ট্রাক টার্মিনাল, শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক সমিতি অফিস দখল করে। ঢাকা শহরব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। তারপরও সারাদেশের সড়ক পরিবহন শ্রমিকরা ১০ দিন ধর্মঘট অব্যাহত রেখে তাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করে। এসময় বহু শ্রমিক নেতাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঢাকা মহাখালীতে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন ও সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির নির্বাচিত কমিটিকে বিতাড়িত করে বিএনপি নেতা

অহিদকে দিয়ে ৫ বছর টার্মিনাল, মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়ন দখল করে। এসময় উক্ত ইউনিয়নের সভাপতি সাদিকুর রহমান হিরু, যুগ্ম সম্পাদক শাজাহান ও সাহা, প্রচার সম্পাদক মোবারক ও সদস্য খালেকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করে দীর্ঘদিন হয়রানি করে। একইভাবে গাবতলী, সায়েদাবাদ, ফুলবাড়িয়া, ট্রাক সমিতিসহ বিভিন্ন সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়ন দখল করে। গাবতলী টারমিনালের শ্রমিক নেতা ও ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মফিজুল হক বেবু, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আমানুল্লাহকে সন্ত্রাস দমন আইন মামলা দিয়ে হয়রানি করে। সায়েদাবাদ, ফুলবাড়িয়া শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক সমিতি দখল করে এবং শ্রমিক নেতাদের মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে।

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ওয়াজিউদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সহ-সভাপতি সাদিকুর রহমান হিরু ও কার্যকরী সভাপতি হিসেবে আমার বিরুদ্ধেও হত্যা মামলা দায়ের করে। কোর্টে হাজিরা দিতে গেলে ওয়াজিউদ্দিন খান, আ: রশিদ, ছাদিকুর রহমান হিরুকে জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠায়। শুধু মালিক সমিতি বা শ্রমিক ইউনিয়নই দখল করে নাই। তারা 'এনা পরিবহন' (মালিক, খন্দকার এনায়েতউল্লাহ) ও শামীম ওসমান এম.পি-কে চেয়ারম্যান করে প্রতিষ্ঠিত 'শীতল পরিবহন' দখল করে 'ঢাকা পরিবহন' নামে পরিচালনা করে।

১৯৯১ সালে পবিত্র রমজান মাসে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করলে খালেদা জিয়ার সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ১৭ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে। ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার গঠন করে। তারা পুনরায় দলীয়করণ নীতি অনুসরণ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, শ্রমিক ইউনিয়ন ও টার্মিনাল দখল করে। ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মফিজুল হক বেবুকে গ্রেফতার করে বেদম প্রহার করে জেলে পাঠায়। তারা নীলফামারী, নাটোর, লালমনিরহাটসহ কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক সমিতি দখল করে। দখলমুক্ত করার জন্য শ্রমিক ফেডারেশন আন্দোলন করে। সরকার চুক্তি করে তা বাস্তবায়ন করে নাই।

খালেদা জিয়ার সরকার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলীকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গ্রেফতার করে বেদম প্রহার করায় তার পা ভেঙ্গে যায়। এ অবস্থায় তাকে কারাগারে পাঠানো হয় এবং ৭৫ দিন পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। একই সাথে মহাখালি শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ ও সদস্য বাদলকে গ্রেফতার করা হয়। ২০০৫ সালে রংপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আবুল কলাম আজাদকে গ্রেফতার করে বেদমভাবে প্রহার করে। পরে কারাগারে পাঠায়। চার দিন পর কারাগার থেকে বের করে এনে পিটিয়ে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ২০০৫ সালের ৬ নভেম্বর দেশব্যাপী সড়ক পরিবহন ধর্মঘট পালিত হয়। দেশব্যাপী স্বত:স্ফুর্তভাবে ধর্মঘট পালিত হয় যা ছিল ইতিহাসের এক অনন্য ঘটনা। ঐ বছর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সহ-সভাপতি চট্টগ্রাম বিভাগীয় ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাজী ইয়াকুব আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করে বেদম প্রহার করে। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় কারাগারে পাঠানো হয়। প্রায় চার মাস পর সে মুক্তি পেলেও ১০ মাস পর সে মৃত্যুবরণ করে।

২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করলে খালেদা জিয়ার সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে পবিত্র রমজান মাসে ২ জন শ্রমিককে হত্যা করে। সরকারে থাকা অবস্থায় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত যেমন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে শ্রমিক শ্রেণিকে হত্যা করেছে, তেমনি ক্ষমতার বাইরে এসে ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৯২ জন ড্রাইভার ও হেলপারকে হত্যা করেছে। তারা গার্মেন্টস শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, বালুর ট্রাকের শ্রমিক, ব্যাংক কর্মচারী, হকার,

নারী-শিশুসহ অসংখ্য যাত্রীদের বোমা, পেট্রোল বোমা মেরে, পুড়িয়ে, পিটিয়ে, কুপিয়ে হত্যা করেছে। পেট্রোল বোমায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছে প্রায় ৪০০ শ্রমজীবী মানুষ। অনেক কর্মজীবী মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, কর্মহীন হয়ে পড়েছে। ২০১৩ সালে বিএনপি-জামাত-হেফাজতের তাণ্ডবে ৫৫ জন ড্রাইভার, হেলপার ছাড়াও ২ জন মুক্তিযোদ্ধা, ১৭ জন পুলিশ, ৩ জন বিজিবি জোয়ান, বহু আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের খুন করা হয়েছে।

৪ দলীয় জোট সরকারের আমলে জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আহসানুল্লাহ মাষ্টার এম.পি, সাবেক অর্থ মন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া এম.পি, নাটোরের সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ উদ্দিন, খুলনা আওয়ামী লীগ সভাপতি মঞ্জুরুল ইমামকেও পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।

পেট্রোল বোমা, গান পাউডার দিয়ে কয়েক হাজার গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, ভাংচুর করা হয়েছে অসংখ্য গাড়ি। রেললাইনের ফিসপ্লেট তুলে রেল দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। পেট্রোল বোমা মেরে রেলগাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষ্টীমার ও লঞ্চে আগুন দিয়েছে। ৬০ হাজার গাছ কেটে পরিবেশ নষ্ট করেছে। পবিত্র কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ, মসজিদের জায়নামাজ আগুনে পুড়িয়েছে। গরীব হকারদের মালামাল লুট করেছে, পুড়িয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মন্দির বাড়িঘর ভাংচুর করেছে। নারীদের সম্ভ্রমহানি করেছে। ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ৫২৩ টি প্রাইমারি স্কুল পুড়িয়েছে। প্রিজাইডিং অফিসার হত্যা করেছে। ভোটারদের পায়ের রগ কেটেছে। এসব ধ্বংসাত্মক, সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড করার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা খর্ব করা, যুদ্ধাপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের রক্ষা করা এবং বাংলাদেশকে অকার্যকর করে জঙ্গী রাষ্ট্রে পরিনত করা।

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ও জামায়াত শ্রমজীবী ও কর্মজীবী সাধারণ মানুষকে খুন করে তাদের রক্ত দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি তৈরি করতে চায়। কিন্তু শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষ কখনও তা মেনে নেয়নি, নেবেও না। খালেদা জিয়ার শাসনামলে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়া আরো প্রায় ৫ হাজার মাঝারি, ছোট, বড় কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বেকার হয়েছে কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। অসংখ্য শহীদ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আজীবন শ্রমিকদের কল্যাণে ও তাদের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। তিনি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে পাকিস্তানী ও তাদের দোসরদের পরিত্যক্ত কলকারখানা জাতীয়করণের মাধ্যমে চালু করে শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সমবায় সমিতি গঠন করে ১০০ টি ট্রাক সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের মালিকানায় দিয়ে তাদের আয় বর্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও বঙ্গবন্ধুর মত একজন শ্রমিক দরদী মানুষ। ১৯৯৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১১ টি টেক্সটাইল মিলের মালিকানা শ্রমিক-কর্মচারীদের দিয়েছিলেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান শ্রমিক বান্ধব সরকার বন্ধ হওয়া কলকারখানাগুলো একে একে চালু করার পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকার খুলনার 'পিপুলস জুট মিল' এবং সিরাজগঞ্জের 'কওমী জুট মিল' চালু করেছে। এর ফলে ৭ হাজার ২ শত শ্রমিক কর্মচারীর চাকুরীর সংস্থান হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো চারটি জুট মিল চালু করা হবে। এরই মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া বাবদ এক হাজার ২৫ কোটি টাকা দিয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে কলকারখানাগুলোর নেওয়া ঋণ বাবদ আরো তিন হাজার কোটি টাকা সরকার মওকুফ করেছে।

বিগত চার দলীয় জোট সরকারের সময়, শ্রম আইন ২০০৬ সংসদে পাশ হয়। সে আইনে শ্রমিক স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হয়নি। উক্ত আইনে আমি ৫৬ টি সংশোধনী উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু তৎকালীন সরকার সংসদে আমাকে এক মিনিটের জন্যও কথা বলতে দেয়নি। এমনকি তৎকালিন বিরোধী দলের নেত্রী আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকেও কথা বলতে না দেয়ায় আমরা উক্ত আইনের বিরোধীতা করে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছিলাম। চারদলীয় জোট সরকার আমার প্রস্তাবগুলোও গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের সকল শ্রমিক সংগঠন তা প্রত্যাখান করেছিলো। শ্রমিকদের স্বার্থে শেখ হাসিনার শাসনামলে গত মেয়াদে ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে। শ্রমিক দরদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার শ্রমিকদের চাকুরীর বয়স সীমা ৬০ বছর করেছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণে সংশোধিত শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল গঠন করেছে।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী যেখানে ২০০৬ সালে ছিল ১৬৬২ টাকা তা বৃদ্ধি করে ২০১৩ সালে ৫৩০০ টাকা পুন:নির্ধারণ করেছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের সমস্যা দূর করার জন্য নাম মাত্র সুদে মালিকদের ব্যাংক ঋণ দিয়ে ডরমেটরি করার সুযোগ দিয়েছে। সকল রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) নারী শ্রমিকদের জন্য সরকারীভাবে ডরমেটারি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এর মধ্যে দিয়েই প্রমানিত হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষকে ভালবাসেন এবং তার সরকার শ্রম বান্ধব সরকার। বিএনপি-জামায়াতের হরতাল-অবরোধে পরিবহন সেক্টরের শ্রমিক ও মালিকদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিক ও মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ অনুদান প্রদান করেছেন। আরো অনুদান প্রদানের জন্য প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে ভালবাসেন, জনগণকে ভালবাসেন এবং আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে কাজ করে চলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার তার বিগত মেয়াদ কালেই সকল সেক্টরের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত দান ও দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৯৬ তে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের কাজ শুরু করেন। আদালত বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফাঁসির রায় দেয়। ২০০১ সালে শেখ হাসিনা সরকারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পরবর্তী নির্বাচনে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলে তারা সে রায় কার্যকর করেনি। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফাঁসির রায় কার্যকর করে দেশকে কলঙ্কমুক্ত করেছেন। এরপর শুরু করেন যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের কাজ। এজন্য গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আদালত এ পর্যন্ত ১০ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড, ২ জনের আমৃত্যু কারাবাসের রায় ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে ২ জনের ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়।

শেখ হাসিনার বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের শাসনামলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বহু উন্নয়ন সাধিত হয়। ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চার দলীয় জোট সরকার শেখ হাসিনার সে সব অর্জন ধ্বংস করে দেয়। ২০০৮ সালে ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে জনগণ আবার শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাসীন করে। তিনি ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফাঁসির রায় কার্যকর করেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন, বেকারত্ব, দারিদ্রতা দূরীকরণ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পরিবহনসহ সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেন। তার বিগত ও বর্তমান ছয় বছরের শাসনামলে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচনের পর বাংলাদেশে ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এক বছরে দেশের স্থিতিশীল পরিবেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিল। এরই মধ্যে জনগণের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়েছে, রিজার্ভের

পরিমাণ রেকর্ড ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে ২০১৩ সালের ন্যায় ২০১৫ সালে সারাদেশে হরতাল-অবরোধের নামে নিরীহ মানুষ হত্যা, জ্বালাও-পোড়াও ভাংচুর করে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে, বিএনপি-জামায়াত জোট দেশকে একটি অকার্যকর ও জঙ্গী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে পেট্রোল বোমা মেরে জীবনযাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও তার পরামর্শে বাংলাদেশের শ্রমিক কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ গঠন করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠায় বিএনপি-জামাতের ২০ দলীয় জোটের সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং জানমাল রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের নিরবিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড ছিল প্রশংসনীয়।

খালেদা জিয়া ক্ষমতার বাইরে থেকে যেভাবে মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, নাশকতা ও সম্পদ ধ্বংস করেছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারী-পেশাজীবী-মুক্তিযোদ্ধারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমন্বয় পরিষদ গঠন করেছে। এ সমন্বয় পরিষদ সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করায় খালেদা জিয়ার তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আরেকবার প্রমাণিত হলো সন্ত্রাস কখনও বিজয় লাভ করে না। শ্রমজীবী, পেশাজীবী, মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বিজয় লাভ করবে; যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

বিএনপি-জামাত জোট গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে হত্যাকাণ্ড করেছে, সন্ত্রাস নাশকতা করেছে। গণতন্ত্র ও সন্ত্রাস একসাথে চলতে পারে না- এটা আজ তারা কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে তা প্রশ্ন হয়ে রয়েছে। তবে একথা সত্য ২০১৩ ও ২০১৪ সালে নির্বাচন বানচালের জন্য যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তার বিচার হয়নি বলে ২০১৫ সালেও তারা একইভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তাই আজ শ্রমজীবী মানুষের প্রাণের দাবী সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার করা হোক এবং হত্যাকারীদের ও তাদের হুকুম দাতাদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক।

মে' দিবসের চেতনা হলো- সত্য, ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী, কর্মজীবী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। আজ বাংলাদেশের শ্রমজীবী, কর্মজীবী সাধারণ মানুষ এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত ও ঘোষিত রায় কার্যকর করা, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করা, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করা, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য সংগ্রাম এবং আন্দোলনের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ এগিয়ে চলেছে। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে-ইনশাআল্লাহ্।

দুনিয়ার মজদুর এক হও,
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

মহান মে দিবস এবং আজকের বাংলাদেশ

মোঃ ইসরাফিল আলম এম.পি
সভাপতি
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন।

১মে ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরের হে-মার্কেটে মকরম্যাক্ রীপার ওয়ার্কস নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনরত শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল মহান মে দিবস। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শত শত বছর ধরে বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সমাজকে অনেক রক্ত ও প্রাণ দিতে হয়েছে, যা এখনো অব্যাহত আছে। তাদের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই নির্যাতন-নিপীড়ন ও ক্ষতির শিকার হয়েছে এর জ্বলন্ত প্রমাণ বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের ন্যায়সংগত দাবি আদায়ের পক্ষে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শাসক শ্রেণীর নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রত্ব হারিয়ে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়েন। ১৮৮৬ সালের মে মাসের ৪ তারিখে হে-মার্কেট স্কোয়ারে প্রতিবাদের জন্য আয়োজিত সমাবেশে শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী, শোষক শ্রেণীর কতিপয় সন্ত্রাসীবাহিনী বোমা নিক্ষেপ করলে শ্রমিক ও কয়েক জন পুলিশ মারা যায়। ১৮৮৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মেহনতী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে আমেরিকার ফেডারেশন অব লেবার নামক সংগঠন গড়ে উঠে। পরিশেষে ওয়াল্স্ হিভেল এ্যাক্ট এবং ফেয়ার লেবার ষ্ট্যান্ডার্ড এ্যাক্ট প্রণীত হয়-যার মাধ্যমে **৮ ঘণ্টা শ্রম, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম ও ৮ ঘণ্টা বিনোদন এর দাবী স্বীকৃতি পায়।**

পরবর্তীতে শ্রমের মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। জন্মলগ্ন থেকে ILO এ পর্যন্ত প্রায় ১৮৯টি সাধারণ কনভেনশন এবং ৮টি কোর কনভেনশন গ্রহণ করেছে-যার মধ্যে বাংলাদেশ সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে মোট ৩৪টি কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছে তার মধ্যে ২টি প্রশাসন (Governence), ২৬টি টেকনিক্যাল কনভেনশন এবং ৭টি মৌলিক কনভেনশন স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। তবে কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ সম্পর্কিত ১৩৮ নম্বর কোর কনভেনশন অনুসমর্থন না করলেও বাংলাদেশের শিশু শ্রমনীতি'২০১০ এবং শ্রম আইন'২০০৬ এর মধ্যে যেহেতু উক্ত কনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শ্রমিকের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে, সেহেতু অবশিষ্ট কোর কনভেনশনটি অনুসমর্থন করতে বাংলাদেশের ঝুঁকি বা সমস্যা নেই। তাই ১৩৮ নম্বর কোর কনভেনশনটি সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করতে পারে। অন্যদিকে গৃহশ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ সম্পর্কিত ILO কনভেনশন যখন ILC তে পাশ হয় তখন ঐ অধিবেশনে বাংলাদেশ সভাপতিত্ব করেছিল এবং বিপুল পরিমান গৃহশ্রমিক দেশে ও বিদেশে কর্মরত থাকায় তাদের স্বার্থে ও কল্যাণে এই কনভেনশন বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কি না তা গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখা দরকার। ILO সৃষ্টিলগ্ন হতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে বিশ্বব্যাপী খেটে খাওয়া মেহনতী শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য, আর্থসামাজিক মুক্তি ও তাদের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, জাতিংঘের জন্মের বহু পূর্বেই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) গঠিত হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ILO প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন সর্বপ্রথম সদস্যপদ দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল এবং আজতক এই সংগঠন বাংলাদেশ সরকারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে দেশে শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে শ্রমজীবী মানুষের প্রভাব ঃ

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই- ধৈর্য্য, সহনশীলতা, ঐক্য, শৃংঙ্খলা, প্রত্যয়, দেশপ্রেম, ঐকান্তিকতা, আত্মত্যাগ এবং বাঙ্গালী জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আপোষহীন ও দীর্ঘ

সংগ্রাম করার এক অনুকরণীয় ও অসাধারণ আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন। সমাজের খেটে খাওয়া দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ এত গভীর ছিল যে তিনি আমৃত্যু সমাজের এই ভাগ্যবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি ফোঁটাবার জন্য আপোষহীন ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। যে কারণে শ্রমিক সমাজ তার প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং সমর্থনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছে। তাঁর জীবনে ঐতিহাসিক ঘটনা বহুল ৬ দফা ঘোষণা করার পর- বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বিভ্রান্ত হলেও-এই ৬ দফা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মুনু মিয়াসহ প্রথম শ্রমিক সমাজের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল। ভাগ্যবঞ্চিত মেহনতী মানুষ বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদূত হিসেবে গভীরশ্রদ্ধা ও আস্থায় তাদের হৃদয়ের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় স্বদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে মহান মে দিবসে প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপন শুরু করেন এবং ঐদিনকে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন। শ্রমিক বান্ধব নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২২ মে ১৯৭২ সালে প্রথম ILO এর সদস্য পদ লাভ করে। তিনি স্বাধীনতার পর সমস্ত কলকারখানা জাতীয়করণ করেন এবং এর ফলে বাংলার শ্রমিক সমাজ সরকারী মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগের অবকাশ পায়-যা বঙ্গবন্ধুকে স্ব-পরিবারে হত্যার পর খুনিচক্ররা বেশি দিন স্থায়ী হতে দেয়নি। তবে আজও দেশের মোট জনগোষ্ঠীর যে বিশাল অংশ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সমর্থক হিসেবে কাজ করে তাদের মধ্যে খেটেখাওয়া গরীব-দুঃখী মানুষের সংখ্যা বেশী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাজের ভাগ্যবঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের জন্য সংবিধানে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী সন্নিবেশিত করেছিলেন। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখেই সমাজের খেঁটে খাওয়া গরীব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোঁটানোর জন্য শ্রমিকবান্ধব বহুমূখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে যার প্রত্যক্ষ সুফল শ্রমিক ভাই-বোনেরা ইতোমধ্যেই উপভোগ করছেন। ফলে তাদের মজুরী, কর্মসংস্থান ও মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব শুরু করার পরপরই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহীদের দ্বারা নিহত হন এবং তার কিছুদিন পর তৎকালীন সেনাপ্রধান এরশাদ সাহেব অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস ছাত্তার সাহেবের আমন্ত্রণে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। অতঃপর সামরিক ফরমানের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তৎকালীন প্রধান সামরিক শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান এরশাদ সাহেব রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম চালু করার জন্য দলগুলোর প্রতি সংলাপের আহ্বান জানালে, **বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভানেত্রী হিসেবে দেশরত্ন শেখ হাসিনা প্রতিউত্তরে বলেছিলেন -"শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ফিরিয়ে না দিলে তিনি সামরিক সরকারের সাথে কোন সংলাপে অংশ নেবেন না"**। তার এই বক্তব্যের পর ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হয় এবং জন্ম হয় শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের। স্কপ ৮০-এর দশকে এদেশের জাতীয় রাজনীতিতে যে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল ইতিহাস তা নিশ্চয় মূল্যায়ন করবে। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় যিনি প্রথম আত্মাহুতি দেন তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিক কনুমিয়া। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের তথা বাঙ্গালী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামের ধাপে ধাপে শ্রমজীবী মানুষের অগ্রণী ও সক্রিয় ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

দেশের বর্তমান শ্রমশক্তি, কর্মসংস্থান ও শ্রমপরিস্থিতি ঃ

বর্তমান বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির ৮০% অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। এসব শ্রমিকদের নির্দিষ্ট বেতনকাঠামো, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, চাকুরীর নিশ্চয়তা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বলতে কোন কিছুই নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতি বহুলাংশ কৃষিনির্ভর অথচ কৃষি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন তো দুরের কথা কোন সংগঠনই নেই। প্রতি বছর ৫ ভাগের ৪ ভাগ শ্রমশক্তি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান পায়। দেশের রাজধানী ঢাকা শহরেই কর্মরত মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৬০% শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে।

প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমশক্তি দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হয়- তাদের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে ২ লক্ষ থেকে ২.৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়, বে-সরকারী পর্যায়ে ৩ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ, আত্মকর্মসংস্থানে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার মানুষ এবং বর্তমানে প্রবাসে প্রতি বছর ৪ লক্ষ থেকে ৪.১৫ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে সেই হিসেবে। প্রতি বছর আমাদের প্রায় ৪-৫ লাখ শ্রমশক্তি কর্মসংস্থানের বাইরে রয়ে যাচ্ছে। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য বৈদেশিক শ্রমবাজারে এবং আমাদের অভ্যন্তরীন শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরী করাটাই এই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হতে পারে। উল্লেখ্য যে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান হয় সমাজের হতদরিদ্র, অদক্ষ, অসহায় ও নারী শ্রমশক্তির। সরকারী খাতে কর্মসংস্থান হয় সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত ও প্রভাবশালীদের। বে-সরকারী পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান হয় সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, পেশাদার ও দক্ষ শ্রম-শক্তির। স্বাধীনতার পর বর্তমান সরকারের সময় নগরায়ন ও নগরবাসীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বাংলাদেশের মোট শ্রম-শক্তির ৫% এর কম প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সংগঠিত হবার সুযোগ পায়। যে কারণে শ্রমিক সংগঠনগুলো দূর্বল এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবে বহুভাগে বিভক্ত। তাই বাংলাদেশে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বের দক্ষতা ও গুণগতমান এখন সবচেয়ে উদ্বেগজনক স্তরে উপনীত হয়েছে। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কর্মপরিবেশ ও মজুরী কাঠামো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা চরম অমানবিক পর্যায়ে নিমজ্জিত থাকলেও শ্রমিক আন্দোলনের সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের জন্য অর্থবহভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না। এ কারণে মালিক পক্ষের ন্যায় (এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ) সর্বস্তরের শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে দলমত নির্বিশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর মঞ্চে সমবেত হয়ে শোষিত ও অধিকার বঞ্চিত শ্রমিক সমাজকে দূর্দশামুক্ত করতে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার বিকল্প নাই। কিন্তু কেন, কার স্বার্থে এই মহৎ কাজটির প্রতি আশাব্যাঞ্জক সাড়া পাওয়া যায় না তা ভবিষ্যৎ এর ইতিহাস নিশ্চয় একদিন উন্মোচন করবে।

দেশের রপ্তানীমুখী জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে অনেক শ্রমিক কাজ করে । চিংড়িশিল্পসহ এ জাতীয় শিল্পে কর্মরত বিশাল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থা মানদণ্ডের বহুনীচে অবস্থান করছে। কারণ শ্রমিক সংগঠন এবং তাদের অনুকূলের শক্তি দুর্বল। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির আশীর্বাদ তৈরী পোষাক শিল্প। ৮০'র দশকে ৫০টি পোষাক কারখানা দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এই সেক্টরটি বর্তমানে আমাদের জাতীয় রপ্তানী আয়ের প্রায় ৮৩% অবদান রাখে এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তৈরী পোষাক রপ্তানীকারক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করছে। এই সেক্টরটি দ্রুত এমন উন্নয়শীল সেক্টর হিসেবে স্থান করে নিয়েছে, যে আগামী ১০ বছরে যদি অগ্রগতির চলমান ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে আরো ৩০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে। এই সেক্টরের বিশেষত্ব হলো নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী সমাজকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবকাঠামোকে মজবুত বুনিয়াদের উপর দাঁড়াতে সহযোগিতা করা। কারণ এই সেক্টরে কর্মরত প্রায় ৩৫ লাখ শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ মহিলা শ্রমিক। এ শিল্পের শ্রমিকদের অধিকাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুল্লেখযোগ্য। এছাড়া দেশের প্রায় অধিকাংশ মানুষ এই সেক্টরের অর্থনৈতিক লেনদেনের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত। রানাপ্লাজা ও তাজরীন গার্মেন্টসসহ কয়েকটি দুর্ঘটনা এই শিল্পকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও দক্ষ নেতৃত্বে জাতি তা কাটিয়ে উঠছে। ILO এর নেতৃত্বে ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান, এ্যাকর্ড, এলায়েন্সসহ দেশী বিদেশী সকল সংস্থা ও সম্প্রদায়ের ইতিবাচক মনোভাব এবং পদক্ষেপ এই সেক্টরের ভাবমূর্তি সংকট নিরসনে সহায়তা করছে। ইতোমধ্যে অনেক অযোগ্য ও মানহীন ফ্যাক্টরী বন্ধ হলেও চাহিদা, কার্যাদেশ ও রপ্তানী হ্রাস পায়নি। আশার খবর হলো ৩ বছরে প্রায় ২৭৫ টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধিত হয়েছে। তবে সম্প্রতি এ ক্ষেত্রে কিছু সু-শাসনের অভাব এই অগ্রগতির ধারাকে বাধাগস্থ ও প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করেছে- যা নিরসন হওয়া বাঞ্চনীয়। দেশের ৪২ টি শিল্প সেক্টরের প্রায় সবগুলোতে মজুরী কাঠামো পুন:র্গঠন করা হলেও এগুলোর মধ্যে একটি আত্ম:সমন্বয় সৃষ্টি করা দরকার অথবা একটি অভিন্ন জাতীয় নিম্নতম মজুরী কাঠামো গঠন করা দরকার। শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ও ৩৮ টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৭টি শ্রম আদালতকে কার্যকর ও গতিশীল করার আশু উদ্যোগ নেয়া দরকার।

শ্রমিক কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন'২০০৬ এর সংশোধন বা যুগোপযোগীকরণ।

২. ৩য় জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন ও অনুমোদন। উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে প্রয়াত শ্রমমন্ত্রী জহুর আহম্মদ চৌধুরী ১ম শ্রমনীতি ঘোষণা করেন এবং ১৯৭৫ সালে প্রয়াত শ্রমমন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুপ আলী সাহেব জাতির পিতার নির্দেশে ২য় শ্রমনীতির খসড়া চূড়ান্ত করেন। কিন্তু ৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট জাতির পিতাকে স্ব-পরিবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পটপরিবর্তনের কারণে তা আলোর মূখ দেখেনি। তবে ১৯৮০ সালে তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী রিয়াজউদ্দীন আহম্মদ সাহেব যে ২য় শ্রমনীতি ঘোষণা করেন- তা জাতির পিতার নেতৃত্বাধীন সরকারের সেই অঘোষিত শ্রমনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যে শ্রমনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে তা সময় উপযোগী ও উৎপাদনমূখী।

৩. জাতীয় গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা'২০১০ প্রণয়ন।

৪. জাতীয় শিশু শ্রমনীতি'২০১০ প্রণয়ন।

৫. সমাজের প্রতিবন্ধী, হরিজন, দলিত ও হিজরা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬. সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করা।

৭. চাকুরী থেকে শ্রমিকদের অবসরের বয়স ৫৭ বছর থেকে ৬০ বছর করা।

৮. কর্মজীবী নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাস করা।

৯. পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ১৬৬২ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা করা এবং সর্বশেষ ৫,৩০০ টাকায় উন্নীত করা।

১০. তৈরী পোষাকসহ অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১১. সীমিত আয়ের ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড এবং প্রতিটি উপজেলায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রেশনিং এর ব্যবস্থা করা।

১২. শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন ও শিল্পের নিরাপত্তার জন্য শিল্প পুলিশ গঠন করা।

১৩. শ্রমিক বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা ও বাস্তবায়ন করা।

১৪. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বহুমূখী পদক্ষেপ নেয়া।

১৫. বেকারত্ব দূরীকরণে জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম চালু করা।

১৬. জাতীয় শিক্ষানীতি পরিবর্তন এবং দক্ষ মানব শক্তি বিনির্মাণের লক্ষ্যে তিনস্তর বিশিষ্ট একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে কারিগরি তথা জীবন ও কর্মমূখী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া।

১৭. আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য একটি বাড়ি, একটি খামারসহ গ্রাম ভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবস্থা জোরদার করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থ সঞ্চালনের গতিবৃদ্ধি করা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সমবায় বিশেষত কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে নগদ সহায়তা সহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা।

১৮. সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সম্পদের সুষম বন্টনসহ দেশব্যাপী সুষম উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

১৯. শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন'২০০৬ বাস্তবায়নের বাধা দূর করতে আইন সংশোধন করা এবং এই ফান্ডে বর্তমান ৭০ কোটি টাকা আদায় ও শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে।

২০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ২% সার্ভিস চার্জে ডরমেটরী তৈরীর জন্য অর্থ সহায়তার ঘোষণা।

২১. সড়ক পরিবহন খাতে ব্যক্তি মালিকানাধীন শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল আইন কার্যকর করা।

২২. দেশের ৭টি শ্রম আদালতের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।

২৩. দেশের মৌসুমী ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অতি দরিদ্র মানুষের জন্য ৪০ দিনের কর্মসূচী গ্রহণ করা।

২৪ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে টিসিবি'কে সক্রিয় এবং প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে ওএমএস চালু, রেশনিংসহ বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাজার মনিটরিং জোরদার করা।

২৫ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে অস্বচ্ছল শ্রমিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রমকে গতিশীল করা।

২৬ প্রবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবার এবং পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সম্পর্কিত ১৯৯০ সালের জাতিসংঘের কনভেনশন স্বাক্ষর ও আত্মসমর্থন করে তার আলোকে অভিবাসী আইন পাশ ও কার্যকর করা।

২৭ ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিদেশে লোক প্রেরিত হয় ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিদেশে লোক প্রেরিত হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ। অতএব চার দলীয় জোট সরকারের পাঁচ বছরের শাসন আমলের চেয়ে মহাজোট সরকারের সময় ৩ গুণের বেশি জনশক্তি বিদেশে প্রেরিত হয়েছে। যদিও বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দাসহ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সমস্যা বিদ্যমান। বাংলাদেশের শ্রমবাজার প্রায় ৭০ টি দেশের স্থলে ১৬২ টি দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সৌদি, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কর্মরত কর্মীদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মীর বিদেশে নিরাপদ কর্মসংস্থান হয়েছে। তাদের সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

২৮ দেশে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য বীমা ও যৌথবীমা গ্রহণ করা হয়েছে।

২৯ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির ভুমিকা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩০ কারখানা ও দোকান পরিদর্শক বিভাগকে যুগোপযোগী করার জন্য এর মান ও জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শ্রমিক অধিকার ও কল্যাণের জন্য করণীয় কিছু সুপারিশ ঃ

১ আমাদের দেশে শ্রমিকদের কল্যাণে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তার অনেক কিছুই শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখে না। ফলে একদিকে সরকারের ভাবমূর্তি ও শ্রমিকদের স্বার্থক্ষুণ্ন হয় অন্যদিকে প্রতিপক্ষ শক্তি লাভবান হয়। তাই এ ধরণের কর্মকাণ্ড থেকে বের হয়ে আসতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তথা লাল ফিতার দৌরাত্ম হ্রাসের ব্যবস্থা করা। যে কারণে সংশোধিত শ্রম আইনের বিধি প্রায় ৩ বছরে তৈরী হয়নি। তৈরী পোশাক শ্রমিকদের ডাটাবেস তৈরীর কাজ অসমাপ্ত।

২ শ্রমিক কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মহাজোট সরকারের আমলে গৃহীত সকল পদক্ষেপগুলোকে দ্রুত সম্পন্ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

৩ সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান শূন্যপদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নকরণ।

৪ শ্রমপরিদপ্তর / লেবার ডিপার্টমেন্টকে আপডেট ও জনবল বৃদ্ধি করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া দরকার। কারণ দেশে প্রায় ২০ লাখ ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প কারখানা এবং দোকান-পাটগুলোর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শনসহ শ্রম প্রশাসনের কাজের ব্যাপ্তির অনুপাতে এই পরিদপ্তর এর বর্তমান কলেবর একেবারেই অপ্রতুল। শ্রম আইনের আওতাধীন লেবার কোর্ট দ্রুত জেলা আদালতের সহকারী বা সাব-জজ আদালতের এখতিয়ারাধীন করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে মোবাইল কোর্টের তফসিলভুক্ত বা আওতাধীন করতে না পারলে শ্রম আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সময়-সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল হবে।

৫. RMG সহ EPZ এর শ্রমিকদের শ্রম আইনের পূর্ণ সুরক্ষা ও সুবিধা দিতে না পারলেও চাকুরী জীবনের সমাপ্তির পর তারা যেন কিছু টাকা হাতে নিয়ে বাড়ী যেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. দেশের বেকার সমস্যা দূর করতে আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমই ঋণ ব্যবস্থাকে শহরমূখী লবিংবাজদের খপ্পর থেকে বের করে এনে সমাজের হতদরিদ্র, অদক্ষ, অসহায়, শিক্ষিত বেকার, কৃষক, শ্রমিক মেহনতী মানুষের জন্য উদারীকরণ করা।

৭. অপ্রাতিষ্ঠানিক তথা অসংগঠিত খাতের শ্রমশক্তির পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, বীমা, পেনশন প্রদানসহ শ্রমিক হিসেবে তাদের আইনগত প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা।

৮. যে ৫.৫ কোটি মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে- সেখানে শ্রমজীবী মানুষের বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা। কারণ দেশের জাতীয় শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ ও উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও সরকারের গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা মানবিক ও নারীবান্ধব হওয়ায় জাতীয় উন্নয়ন ও উৎপাদন এর মূলস্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে।

৯. বিদেশে এবং দেশে কর্মরত সর্বস্তরের শ্রমিকদের নিবন্ধনসহ একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য ভান্ডার (Database with registration) তৈরী করা অত্যাবশ্যকীয়।

১০. দেশে ও বিদেশে কর্মরত সকল শ্রমিকদের জন্য বীমা/ যৌথ বীমা বাধ্যতামুলক ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন করা।

১১. ২% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে গৃহীত অর্থে শ্রমিকদের ডরমেটরী বিনির্মানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বঙ্গবন্ধু বিশ্ব বিবেকের সর্বোচ্চ ফোরাম জাতি সংঘের সাধারণ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে **"বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত; আমি শোষিতের পক্ষে"** এই দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ উচ্চারণ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। মহান মে দিবসের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শোষণহীন ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করতে হলে, বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার স্বাধীনতার স্বপক্ষের-শক্তির নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ও রক্তের যোগ্য উত্তরসুরী দেশরত্ন শেখ হাসিনা তার কাণ্ডারী। সরকার প্রধান হিসেবে ইতোমধ্যেই তিনি শ্রমিক ও শিল্পবান্ধব এক দক্ষ রাষ্ট্রনেতা হিসেবে নিজের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন- যে কারণে তার শাসনামলে শিল্প ক্ষেত্রে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি শ্রমিক অসন্তোষ ও হ্রাস পেয়েছে এবং আইন শৃংঙ্খলাসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতি আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানী বাণিজ্যসহ জিডিপি, রেমিটেন্স ও অভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান, দক্ষমানব সম্পদ বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে কারণেই তাঁর গৃহীত শ্রমিক ও জন্যকল্যাণমূলক কার্যক্রমগুলো গতিশীল ও জনসম্পৃক্ত করার কর্মকৌশল সঠিক ভাবে গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করাটাই এখন সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের জাতীয় উৎপাদন পক্রিয়ার নিয়ামক শক্তি হিসেবে শ্রমিক সমাজকে সংগঠিত ও সঠিকভাবে পরিচালিত করতে তাদের কল্যাণ ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের পাশাপাশি দক্ষতাউন্নয়ন ও শিক্ষা প্রশিক্ষণের প্রসঙ্গকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনায় নিতে হবে। অবারিত করতে হবে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন ও দরকষাকষি করার মত মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের পথ। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবাখাতে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির কারণে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

অন্যদিকে যে ৮৫% শ্রমিক অসংগতি অবস্থায় অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে শ্রম দিয়েও দেশের শ্রম আইনের কোন সুবিধা (Coverage) পাচ্ছেনা। তাদেরকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

মহান মে দিবসের শিক্ষা শুধুমাত্র শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে শানিত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া নয়- উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জাতীয় আর্থসামাজিক মুক্তির পথকে ত্বরান্বিত করার বিষয়টিও এই দিনের অঙ্গীকারের অংশ হওয়া উচিত। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকতে কোন সমস্যা হবে না- তাই এখনই সে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব এই সময়োপযোগী ও মহতী কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক মেহনতী মানুষের।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

উন্নয়ন ভাবনা ও নীটওয়্যার শিল্পখাত

এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এম.পি
সভাপতি
বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স
এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)

উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিসংখ্যান, জ্ঞান নির্ভর ও গবেষণালব্ধ ব্যবসায়িক কৌশল---এই সবগুলোই আন্তর্জাতিক শিল্প ব্যবস্থাপনার এখন গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। কারিগরী কৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষতার কারণে বিশ্বের বাণিজ্যিক নীতিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এখন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞানের পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহার একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। শিল্প কৌশলের ক্ষেত্রে কারিগরী বিদ্যার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা মাধ্যমেও প্রযুক্তির ছোয়া লেগেছে। বিশেষ করে ব্যবসায়িক কৌশল বিশ্লেষণ এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে উপেক্ষা করার আর কোন সুযোগ নেই।

রপ্তানী প্রবাহের ধারা ঃ

তাই ব্যবসা পরিচালনা কাঠামো এখন পরিসংখ্যানভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী কর্মপরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আমরা সকলেই জানি যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীতে "ফিসক্যাল ক্লিফ" বিতর্ক বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুনভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এর সাথে উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলোর অর্থনীতিতে ঋণাত্মক ঋণের কু-প্রভাব এড়ানোর জন্য সংকোচনমূলক ও রক্ষণশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে এগিয়ে যাওয়া, কর্মসংস্থানের অভাব, ব্যাংকিং খাতে অস্থিরতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ইত্যাদি কারণে তাদের আমদানী চাহিদাতে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানী প্রবাহ ও স্বাভাবিকভাবে এতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার শংকায় রয়েছে।

বাংলাদেশের সম্ভাবনা ঃ

উল্লেখিত অবস্থার বিপরীতে চীনের গার্মেন্টস শিল্প থেকে বৃহৎ পুঁজির শিল্পে প্রবেশের চেষ্টা, তুরস্ক, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের পণ্যের গুনগত মান বেশী হওয়া, বাংলাদেশের শিল্প বিকাশে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব এবং বাংলাদেশের পশ্চাদপদ শিল্পের শক্তিশালী অবস্থানের কারণে বিশ্ব এ্যাপারেল বাজারে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্ব এ্যাপারেল রপ্তানীতে চীনের মোট রপ্তানীর ৫% থেকে ১০% যদি আমরা দখল করতে পারি, তবে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ থেকে বছরে প্রায় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমান পণ্য রপ্তানী করা সম্ভবপর হবে। এই বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আমাদের কারখানাগুলোর কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য কৌশলে আধুনিক ধারার প্রবর্তন, ফিনান্সিয়াল ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ এবং শিল্প ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ব্যবসা ব্যবস্থাপনার সংমিশ্রন ঘটানো অত্যাবশ্যকীয়। বিকেএমইএ একটি সৃষ্টিশীল এবং আধুনিক সংগঠন হিসেবে নীট শিল্প কারখানাগুলোর পরিচালনা প্রক্রিয়ায় উক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈশ্বিক নীতির সাথে সমন্বয় ঃ

তবে উন্নয়ন শুধুমাত্র অভ্যন্তরীন পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এরমধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিশ্ব বাজারে পণ্যের চাহিদা, চাহিদার ধরনের পরিবর্তন, বিভিন্ন দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য কৌশল ও নীতি ব্যবসা পরিচালনার

ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু উন্নত উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বেশকিছু বৈষম্যমূলক ট্যারিফ কাঠামো বিলোপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে Deregulation এর মাধ্যমে নিজেদের বাণিজ্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, ইপিবি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। তবে পোশাক শিল্পের মতো একটি শক্তিশালী শিল্পখাতের পরিপূর্ণ বিকাশ ধরে রাখার জন্য আরো দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। চীন এক্ষেত্রে খাতওয়ারী বিভাজন করে নির্দ্দিষ্ট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল এবং সহায়তা তহবিল গঠন করেছে। কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামও তাদের গার্মেন্টস শিল্পকে ইউরোপীয় বাজারে গ্রহণযোগ্য গড়ে তোলার জন্য বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রামের আওতায় ফ্যাক্টরী ও প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এতে করে ইউরোপীয়ান বাজারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে ভারত ও পাকিস্তান ইউরোপিয়ান বাজারে জিএসপি সুবিধা পেয়েছে। একইসাথে ভারত টেকনোলজী আপগ্রেডেশন ফাণ্ড (টিইউএফ) গঠন করে তাদের টেক্সটাইল শিল্পের বিকাশের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে ভারত থেকে পোশাক রপ্তানী প্রবৃদ্ধির হার দারুনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশেরও তাই আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ ধরণের সহযোগিতামূলক এবং দ্বি-পাক্ষিকভাবে লাভজনক FTA, PTA স্বাক্ষর করে পোশাক শিল্পের রপ্তানী বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার উদ্যোগ নেয়াটা জরুরী বলে আমরা মনে করি।

নতুন বাজার সম্প্রসারণ ঃ

এ কথা নিশ্চিত যে, বিশ্ব বাণিজ্যের এই পরিবর্তনশীল সময়ে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সমন্বয় করে এবং ডিউটি-ফ্রি-কোটা-ফ্রি বাজার ধারণা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের নীট শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে দারুনভাবে লাভবান হতে পারে। তাছাড়া অবিকশিত বাজারগুলোতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধির উর্দ্ধগতি এবং ক্রয় সামর্থ্যের বিকাশ বাংলাদেশের নীট শিল্প মালিকদের বিকল্প বাজারে রপ্তানী করতে দারুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারের পাশাপাশি আরো অনেক সম্ভাবনাময়, কিন্তু এখনোও নতুন বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানী সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো জরুরী হয়ে পড়েছে।

কারণ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভূক্ত ২৯টি দেশের মধ্যে ১১ টি দেশের অর্থনীতি নিম্ন গতির প্রবৃদ্ধির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এর মধ্যে ৭টি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই সংকটজনক পর্যায়ে রয়েছে। একইসাথে আমেরিকার অর্থনীতিতেও প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা ক্রমহ্রাসমান রয়েছে। ফলে আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের নীটপণ্য রপ্তানীর প্রধানতম এই দুটি অঞ্চলে মোট রপ্তানীর প্রায় ৭১ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে। যদি সত্যিকার অর্থেই ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক সংকোচন আসে, তবে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানীর পরিমান ৫ থেকে ১৫ শতাংশের মতো হ্রাস পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মোট ১২.০৫ বিলিয়ন ডলারের নীটপণ্য রপ্তানীর প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার রপ্তানী হয় ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে। এই রপ্তানীর পরিসংখ্যান থেকে ৫/১৫ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার অর্থ হচ্ছে চল্লিশ মিলিয়ন ডলার থেকে প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলারের মতো পণ্য কম রপ্তানী হওয়া। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে উক্ত পণ্য বিকল্প সম্ভাবনাময়, কিন্তু অবিকশিত বাজারগুলোতে রপ্তানী করার পরিকল্পনা গ্রহণ নীট শিল্পের বিকাশের স্বার্থেই জরুরী।

বিকেএমইএ কর্তৃক গ্লোবাল বায়ার্স ইনফরমেশন ডাইরেক্টরী প্রকাশ ঃ

ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে নীটপণ্য রপ্তানীর সম্ভাব্য পরিমান কমে যাওয়ার এই আশংকাকে দূর করার লক্ষ্যে বিকেএমইএ নিট ও তৈরী পোশাক শিল্পের শিল্প উদ্যোক্তাদের বিজনেস সংক্রান্ত তথ্যের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাজার সম্প্রসারণের আহবানে সাড়া দিয়ে পৃথিবীর ১৬০টি দেশের ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজারের) অধিক বায়ারের ঠিকানা এবং বিজনেস তথ্য সম্বলিত "Global Buyers' Information Directory" প্রকাশ করেছে। এটি একটি অসাধারণ বই। ২১০০ পৃষ্ঠার এই বইটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং বিজনেস তথ্য সংক্রান্ত একমাত্র প্রকাশনা। এই বইটি'র মাধ্যমে বাংলাদেশের RMG খাতের (নিটওয়্যার/ ওভেনওয়্যার/ চিলড্রেনওয়্যার/সোয়েটার অন্যান্য ক্লদিং) শিল্প উদ্যোক্তারা অথবা যারা নতুন ভাবে ফ্যাক্টরী/

বায়িংহাউস করতে চান, তারা খুব সহজে পছন্দসই দেশের বায়ারের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ পাবেন। এমনকি যারা RMG সেক্টর নিয়ে গবেষণা করতে চান তাদের জন্যও বইটি উপকারী।

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন ব্যাচকে ট্রেনিং প্রদান ঃ

BKMEA কর্তৃক পরিচালিত Institute of Apparel Research & Technology (IART) এর মাধ্যমে Productivity Campaign এর আওতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য গার্মেন্টস শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যেই খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাষানী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি ব্যাচ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর Industrial Engineering & Management (IEM) Department, ৪র্থ বর্ষ ২য় সেমিস্টার (শেষ বর্ষ) শিক্ষার্থীদের বস্ত্রখাতে উৎপাদন কৌশল ও অপচয় হ্রাসের কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে অন্যান্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদেরও বিকেএমইএ'র প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যাপারে আলোচনা চলছে।

বাংলাদেশের নীটওয়্যার শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত বিকাশ ঃ

পণ্য বহুমূখীকরণ বাজার সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গত ১৪ বছরের নীট পণ্য রপ্তানীর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বাংলাদেশ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নন-ফ্যাশি পণ্যগুলো (যেমন---- টি-শার্ট, পলো শার্ট, সোয়েটার ইত্যাদি) রপ্তানী বেশী করে আসছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের পছন্দ এবং ফ্যাশনে পরিবর্তন আসায় ফ্যাশি পণ্যগুলোর (ফ্যাশন প্রোডাক্টস্) চাহিদা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং নতুন উদীয়মান অর্থনীতির দেশসমূহে ফ্যাশন প্রোডাক্টস্‌ের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে হিসেবে বিকেএমইএ সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্বের বাজার চাহিদার ধরণ বিবেচনায় নিয়ে ট্র্যাডিশনাল পণ্যের পাশাপাশি ফ্যাশন আইটেম তাদের প্রোডাক্শন লাইনে সংযোজন করেছে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ফ্যাশন নীট পণ্য রপ্তানীতে একটি ব্যাপক বৈচিত্র্যতা আনতে সক্ষম হবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ নীট ফ্যাশন আইটেম প্রস্তুকরণ ও রপ্তানীতে শীর্ষস্থান দখল করবে বলে আমরা ধারণা করি।

উৎপাদন সমূহ	অর্থবছর ২০১৪-২০১৫	লক্ষ্য-২০২১	লক্ষ্য-২০৫০
নীট পণ্য রপ্তানী	$ ১৩.২৫ বিলিয়ন (লক্ষ্যমাত্রা)	$ ২১.০৮ বিলিয়ন	$ ৩২.৬২ বিলিয়ন
নীট পণ্যের রপ্তানী প্রবৃদ্ধি (%)	১৫.৬	২০.৯	৩২.১
তৈরি পোশাক রাপ্তানীতে অবদান (%)	৪৯.৭৫	৫২.৩	৬৯.৪
জাতীয় রাপ্তানীতে অবদান (%)	৩৯.৯৩	৪১.৭	৫৩.২
জিডিপিতে অবদান (%)	৬.৯	৭.২	১২.১২
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১.৬ মিলিয়ন	২.৮ মিলিয়ন	৪.৯ মিলিয়ন
নারীর ক্ষমতায়ন (%)	৪৫	৫২	৬৭
সঞ্চয় বৃদ্ধি (নারী) (%)	৮.৮	১৩.৬৯	২৯.২
দারিদ্র্যতা হ্রাস (%)	৬.৪	৭.৫	৯.১
ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্স খাত	৳ ১৭৫ বিলিয়ন	৳ ১৮৭ বিলিয়ন	৳ ২০১ বিলিয়ন
শিপিং এবং লজিস্টিক শিল্প	$ ৭৯ মিলিয়ন	$ ৮৪ মিলিয়ন	$ ৯১ মিলিয়ন
ফাওয়ার্ড এবং ব্যাংকওয়ার্ড লিংকেজ খাত	৳ ২১২ মিলিয়ন	৳ ২২১ মিলিয়ন	৳ ২৫৪ মিলিয়ন
ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর	$ ১০.১ মিলিয়ন	$ ১৪.১ মিলিয়ন	$ ১৯.৪ মিলিয়ন
ইকোনোমিট্রিক ফোরকাস্টিং মেথড; অটোরিগ্রোসিভ মুভিং এভারেজ মেথড (ARMAX), স্কিল ফোরকাস্ট (SS) এবং রিগ্রেসন এনালাইসিস			

সামাজিক খাতে নীট সেক্টরের অবদানঃ

দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে উন্নতি, সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি অর্থনীতির মূল নিয়ামক। আন্তর্জাতিক উৎপাদন চেইনে বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রমিক সম্পর্কিত সামাজিক বিষয়ের অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কর্মরত রয়েছে ৪১ লাখের ওপর শ্রমিক, এরমধ্যে ১৫ লাখ শ্রমিক রয়েছে নীটশিল্পে। ২০৫০ সালের মধ্যে নীট শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের পরিমান দাঁড়াবে ৪.৯ মিলিয়নে, অর্থাৎ ২০৫০ সালের নীট শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ৩.৪ মিলিয়ন।

পোশাক খাতের সামাজিক অবদান
কর্মসংস্থান : ৪১ লাখ লোকের কর্মসংস্থান
নারীর ক্ষমতায়ন : শতকরা ৯১ ভাগই হচ্ছে নারী
সঞ্চয়: ১৭.৬% নারীর তার অর্জিত আয় সঞ্চয় করে
নিজ ব্যাংক একাউন্ট: ৬৯% শ্রমিকের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে
শিশু শ্রম: নিষিদ্ধ করা হয়েছে
দারিদ্র্য দূরীকরণ: ১২.৫%
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যে (এমডিজি) ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ২৯ শতাংশে নামিয়ে আনার কথা। কিন্তু দুই বছর আগেই বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ২৬ শতাংশে নেমে গেছে। আর নীট শিল্পের সম্প্রসারণের কারণে দারিদ্র্য বিমোচনের বর্তমান হার ৬.৪ শতাংশ থেকে ৯.১ শতাংশ হবে।

"Go Green" --- নীট কারখানাগুলোকে সবুজায়ন করার প্রক্রিয়া ঃ

বিশ্বে সবুজায়ন প্রক্রিয়ার উপর ব্যাপক জোর দেয়া হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রীন ইকোনোমি, গ্রীন বিল্ডিং, গ্রীন ব্যাংকিং, গ্রীন টেকনোলজি, গ্রীন ইন্ডাষ্ট্রি ইত্যাদি বিষয়ের উপর ব্যাপকহারে আলোচনা হচ্ছে। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সাপ্লাই চেইন, প্রোডাকশন, পণ্য প্রস্তুতি এবং ক্যামিকেল ব্যবহারের সময় গ্রীন কনসেপ্টের সূচক এবং নীতিমালাগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে ব্যাপক জোর প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে "বিকেএমইএ গ্রীন ইন্ডাষ্ট্রি ডেভেলপমেন্ট সেল" নামে একটি ডিপার্টমেন্ট খুলে সদস্যপ্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্রীন ফ্যাক্টরী মেকানিজম চালু করার জন্য কাজ করছে। এই প্রকল্পের আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রীন করার প্রক্রিয়া, সাপ্লাই চেইন, প্রোডাকশন এবং পণ্য প্রস্তুতির সময় গ্রীন থিউরি প্রয়োগ এবং পুরো ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টে গ্রীন ফ্যাকাল্টিকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজ চলছে। বিশেষ করে কার্বন এমিশন কমানো, প্রস্তুতকৃত পণ্যে ক্যামিকেলের সঠিক ও হ্রাস মান ব্যবহার নিশ্চিত করা, পানির কনজাম্পশন কমিয়ে পানির ট্রিটমেন্ট ঠিক করা, জ্বালানির অপচয় রোধ করা এবং এর মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ কমানো "বিকেএমইএ গ্রীন ইন্ডাষ্ট্রি ডেভেলপমেন্ট" সেলের মূল কাজ। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার ইউএসজিবিসি'র মানদণ্ডকে মূল কাঠামো ধরে নিয়ে বিকেএমইএ কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে নীট সেক্টর থেকে কার্বন এমিশন/জিএইচজি কমবে ৯৫%, পানির অপচয় কমবে ৫০% এবং এনার্জি থেকে পরিবেশ দূষণ কমবে ৫০%। এভাবেই ২০৫০ সালে বাংলাদেশের নীট পণ্য রপ্তানীর পরিমান ৩২ বিলিয়নে পৌঁছাবে এবং একইসাথে সবুজায়নের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের নীট শিল্প দারুণ উন্নতি সাধন করবে।

বিকেএমইএ'র উৎপাদনশীলতা ক্যাম্পেইন ঃ

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে ক্রেতার অন্যতম লক্ষ্য থাকে পোশাকের দাম, মান এবং লীড টাইমের দিকে। কিন্তু পাশাপাশি বেড়ে যাচ্ছে পোশাকের উৎপাদন খরচ। কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধিসহ নানা কারণে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ দেশের পোশাক শিল্প। এই বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহতকরণ করতে

Productivity Improvement Program এর আওতায় Lean Manufacturing System প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে অপচয় হ্রাস করে উৎপাদন ব্যয় কমানো হয়। উল্লেখ্য Lean Manufacturing System বিশ্বব্যাপী পরীক্ষিত ও সমাদৃত আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা।

নীট শিল্প কারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে BKMEA "Productivity Improvement Cell (PIC)" গঠন করেছে। এই সেলের অন্যতম কার্যক্রম হল BKMEA এর সদস্য কারখানাগুলোতে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও কৌশলগত সেবা প্রদানের মাধ্যমে কারখানা গুলোকে বর্তমান প্রতিযোগিতাশীল বৈশ্বিক বাজারের জন্য অধিকতর উপযোগী করে গড়ে তোলা। বিকেএমইএ'র সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে লীন পদ্ধতি বাস্তবায়ন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট স্থাপন এবং উন্নয়ন, বিদ্যমান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের উন্নয়ন, কারখানার লে-আউট রিইঞ্জিনিয়ারিং, কারখানার নতুন লে-আউট করণ, অপচয় হ্রাসকরণ, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং সফলভাবে বাস্তবায়ন ইত্যাদি। কারণ বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শিল্প পরিচালনায় আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেকানিজমের প্রয়োগ ঘটাতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাফল্যের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পরে। ইতোমধ্যেই অনেকগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিকেএমইএ'র প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট কার্যক্রমের ফলে যে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে, সেগুলো হলো----

১. শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপচয়ের পরিমান গড়ে ৯ থেকে ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
৩. শ্রম ব্যবস্থাপনা কৌশলে পরিবর্তনের কারণে শিল্প পরিবেশ উন্নততর হয়েছে।
৪. কারখানার উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ও বিপণন কৌশলে একটি চমৎকার সমন্বয় গড়ে উঠেছে।
৫. লাইন ব্যালেন্সিং প্রক্রিয়া গড়ে ৫ শতাংশ উন্নততর হয়েছে।
৬. লীন ম্যানেজমেন্ট এর কারণে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সময় ব্যয় আনুপাতিকহারে হ্রাস পেয়েছে।

বিকেএমইএ'র উদ্যোগে শ্রমিকদের মৃত্যুজনিত বীমা দাবী জনপ্রতি ২,০০,০০০/- টাকায় উন্নীতকরণ ঃ

একথা ইতোমধ্যেই স্বীকৃত যে, মূলত বিকেএমইএ'র একক উদ্যোগের কারণেই গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের মৃত্যুজনিত বীমা দাবী জনপ্রতি একলক্ষ টাকা করে চালু করা হয়েছিলো। সেই একই ধারাবাহিকতায় বিকেএমইএ'র একক উদ্যোগে বাংলাদেশের একমাত্র সংগঠন হিসেবে নীট শিল্পের শ্রমিকদের মৃত্যুজনিত বীমা দাবী জনপ্রতি ১,০০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকায় শীতলক্ষ্যা হল (২য় তলা) নারায়ণগঞ্জ ক্লাব লিঃ, নারায়ণগঞ্জে বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে মৃত্যু হওয়া ৭৪ জন শ্রমিকের নমিনীর হাতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশে ১ম বারের মতো এবং বাংলাদেশের একমাত্র সংগঠন হিসেবে বিকেএমইএ জনপ্রতি ২,০০,০০০/- টাকা হিসেবে মোট ৭৪ টি বীমা চেক হস্তান্তর করে। উক্ত অনুষ্ঠানে "প্রধান অতিথি" হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু ।

বিকেএমইএ'র শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণে অনুদান প্রদানের ঘোষণা ঃ

অন্যদিকে গত ২৫ জানুয়ারী'২০১৫ রবিবার বেলা ১১.০০টায় বিকেএমইএ ঢাকা কার্যালয়ে নিটওয়্যার শিল্পের মৃত শ্রমিকদের পরিবারের মাঝে ৮১ মৃত্যুজনিত বীমা চেক হস্তান্তরের আরেকটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিকেএমইএ নারায়ণগঞ্জে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের বেদখলকৃত জায়গায় শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনের জন্য বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে ৩,০০,০০০,০০/- (তিন কোটি) টাকা অনুদান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে বিকেএমইএ'কে সাথে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেছেন।

শ্রমিক কল্যাণের জন্য বিকেএমইএ'র আরো কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং ইপিবি'র সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জের বিসিকে শ্রমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সদস্যভূক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের (মূলত হেলপার) ট্রেনিং প্রদান করে দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তর করার কাজ চলছে।
খ)	নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা বিসিকে "বিকেএমইএ হেলথ সেন্টারের" মাধ্যমে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ থেকে ৫০ জন শ্রমিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।
গ)	সদস্যভূক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজ নিজ শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিক উৎসব আয়োজন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
ঘ)	বড় কারখানাগুলোতে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
ঙ)	কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত শশ্রুষা প্রদানের জন্য মেডিক্যাল ডাক্তার নিয়োগ দেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
চ)	বিকেএমইএ বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ব্র্যাকের সহায়তায় "টি.বি প্রজেক্ট" এর মাধ্যমে কর্মরত নীট শ্রমিকদের যক্ষা প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরীর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
ছ)	বিকেএমইএ বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় "কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি" এর আওতায় ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নীট শিল্পে কর্মরত বিভিন্ন মহিলা শ্রমিককে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদান ও স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
জ)	নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লাস্থ বিসিকে "সানি সাইড ডে-কেয়ার" সেন্টারের মাধ্যমে বিকেএমইএ'র প্রতিদিন কর্মজীবী মায়েদের কমপক্ষে ৬০ জন শিশুকে বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া ও পড়ালেখার (কর্মকালীন সময়ে) ব্যবস্থা করা হয়েছে।
ঝ)	নীট শিল্পে কর্মরত মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিল্প ব্যবস্থাপনা ও শ্রম অসন্তোষ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "দ্বন্দ্ব নিরসন ও শৃঙ্খলা নীতি" শীর্ষক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে।
ঞ)	রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে বিজিএমইএকে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
ট)	২০১৩ সালে মোহাম্মদপুরের স্মার্ট ফ্যাশনের অগ্নি দূর্ঘটনায় নিহত ৮ শ্রমিকের প্রতিটি পরিবারকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করে সর্বমোট ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা বিকেএমইএ তহবিল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ঠ)	শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত যে কোন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য "লেবার এ্যাফেয়ার্স সেল" গঠন এবং এর আওতায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে শ্রম আইনানুসারে সমাধান এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
ড)	জিআইজেড এর সাথে সহযোগিতামূলক চুক্তির আওতায় প্রতিটি কারখানা "ওয়াকার্স ট্রেনিং" সেশন এর আয়োজন করা হয়েছে।

নীট শিল্পের বিকাশে শ্রমিকের অবদান ঃ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূল উপজীব্য হচ্ছে উৎপাদনকৃত পণ্য। আর উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে শ্রমিকদের শ্রম সংমিশ্রিত। তাই বলা যেতে পারে নীট শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ার পুরো কৃতিত্বই এই শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকদের। তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা আর পরিশ্রম--- এই দুয়ে মিলেই হয় শিল্পের উন্নয়ন। কোন সন্দেহ নেই যে, নিট শিল্পে বিরাজমান সুশৃঙ্খল শ্রম পরিবেশ এবং শ্রমিকদের শিল্পের বিকাশের জন্য আত্মনিবেদনের মানসিকতাই আমাদের এই শিল্পকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। মহান মে দিবসে শিল্পের বিকাশে শ্রমিকদের এই আত্মনিবেদন এবং অবদানকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তবে একইসাথে যুগোপযোগী প্রযুক্তি কৌশল ও যন্ত্র কৌশলে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের দেশের শ্রমিকরা শিল্প ব্যবস্থাপনার সাথে আরো ওতপ্রোতভাবে জড়িত হবে-- এই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা প্রত্যয়ের সাথে বলতে চাই নিট শিল্প উদ্যোক্তারা আগামী দিনগুলোতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা ও শ্রম শক্তির সুষম বিকাশে আধুনিক সব বিজ্ঞান কৌশল যুক্ত করে বালাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অগ্রগন্য ভূমিকা রাখবে।

সমাপ্তি বক্তব্য ঃ

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ব্যবসায়িক সাফল্য কতগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক সূচকের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সামাজিক সূচকের মধ্যে রয়েছে দক্ষ জনসম্পদ, ব্যবসা শুরুর উপাদানসমূহের সহজলভ্য প্রাপ্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, সামাজিক প্রতিযোগিতার মধ্যে সুষম ও নৈতিক অবস্থান তৈরী এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতামূলক মনোভাব। আর অন্যদিকে রাজনৈতিক সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, পলিসি নির্ধারনে রাজনীতির চেয়ে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোকে মূল্য বেশি দেয়া, ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা তৈরীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা পরিহার করা ইত্যাদি। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সূচকগুলোকে সঠিক অবস্থানে রেখে ব্যবসায়িক পলিসি এবং পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করা গেলে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের নীট শিল্প সারা বিশ্বের জন্য রোল মডেল হয়ে দাঁড়াবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

রানা প্লাজা ও ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড

শিরীন আখতার এম.পি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য

গত দুই বছর ধরে বাংলাদেশ রানা প্লাজার ক্ষত শুকানোর চেষ্টা করছে। আমরা তাজরীন-এর আগুন আতংক ভুলতে চেষ্টা করছি। এরকম দৃশ্য আর কেউ দেখতে চায় না। শুধু বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই এই অমানবিক দৃশ্য দেখতে চায় না। সেখানে বিভিন্ন উদ্যোগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। পোশাক ক্রেতারা বাংলাদেশের কারখানাগুলোকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে একর্ড ও এলায়েন্স নামে দুটো সংগঠন তৈরি করেছে। তারা বছরব্যাপী বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে তার মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ দালান কোঠা চিহ্নিতকরণ এবং সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন করা। অন্যদিকে কারখানা শ্রমিক ও মালিকদের দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করা, দুর্ঘটনা মোকাবেলা করতে সক্ষম করে তোলা, দুর্ঘটনা রোধে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চলছে। এইসব কিছুর মধ্যে জ্বলন্ত যে প্রশ্নটি তা হচ্ছে শ্রমিকের জীবনের মূল্য কত? একজন শ্রমিক যে কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে তার ক্ষতিপূরণ কি হবে? এই ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ এবং অর্থপ্রাপ্তির বিষয়ে এখনো মালিক-শ্রমিক-সরকার একমত হতে পারেনি। শ্রমিকের বন্ধু হিসেবে ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন। রানা প্লাজার শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বিষয়ে বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় অনেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের এই সহায়তার অর্থের সাথে শ্রমিকের আইনগত অধিকার 'ক্ষতিপূরণের অর্থের' বিষয়টি গুলিয়ে ফেলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সহায়তা ক্ষতিপূরণ আইনের মধ্যে পড়ে না, এই টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের টাকা।

মনে রাখতে হবে, অনুদান এবং ক্ষতিপূরণ এক কথা নয়। অনুদানের সঙ্গে সহৃদয় ইচ্ছা যুক্ত। ক্ষতিপূরণ হল আইনী বাধ্যবাধকতা। ইতোমধ্যে রানা প্লাজার ক্ষতিগস্থ শ্রমিকেরা ক্ষতিপূরণের ৪০ শতাংশ পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র নেতৃত্বে গঠিত সমন্বয় কমিটির হিসাবনুযায়ী ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার হলে সকল ক্ষতিপূরণ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এই টাকা এখনও যোগাড় হয়নি। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল সংস্থারই এই উদ্যোগের সাথে থাকার কথা। এই তো গেল রানাপ্লাজার চিত্র। কিন্তু সারাদেশে বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু হচ্ছে। এর মধ্যে নির্মাণশ্রমিক, চাতালশ্রমিক উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি মংলা শিল্প এলাকায় সিমেন্ট ফ্যাক্টরির ভবন ধ্বসে ৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হল। অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে। কিছুদিন আগে ঢাকা মিরপুর-২ এ এক প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু ও অনেক শ্রমিক আহত হয়েছে। গত কয়েক বছরে প্রায় একশ'রও অধিক চাতাল শ্রমিক বয়লার বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে এবং আহত হয়েছে। নির্মাণ কাজে প্রায়ই দেখা যায় অসাবধানতাবশতঃ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা। এছাড়া কৃষিকাজ, রাসায়নিক কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপগুলোতে বিভিন্ন শ্রমিকেরা আক্রান্ত হচ্ছে জটিল দুরারোগ্য ব্যাধিতে। এসকল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের হিসাব-নিকাশ নেই বললেই চলে। নামে মাত্র দয়ার বশবর্তী হয়ে কিছু টাকা শ্রমিকের হাতে তুলে দিলেই তা ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। অনেকে যুক্তি দেখাতে চান আইএলও কনভেনশন ১২১ এবং মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন ১৮৫৫ এর ভিত্তিতে যদি আমরা ক্ষতিপূরণের কথা বলি তাহলে কখনই মালিকেরা তা দিতে রাজি হবে না। আমাদের মত গরীব দেশে এ ধরনের আইন না হওয়া শ্রেয়। তাদের উদ্দেশে বলি, কারও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে আইন তৈরি হয় না। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে।

পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে সেই আইনের বাস্তবায়নে দরকষাকষি হতে পারে। তবে আইনটা থাকা চাই। আইন থাকলে তা মেনে চলার মানসিকতা গড়ে উঠবে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় সেগুলো বিবেচনায় আনবে। সুতরাং ক্ষতিপূরণ আইনটি জরুরি এবং সেই আইনের ভিত্তিতে অর্থের মানদণ্ড নির্ধারণ করা সরকার-শ্রমিক-মালিক সকলেরই প্রধান এবং প্রাথমিক দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। ক্ষতিপূরণ শুধু নয় একই সাথে আহত ক্ষতিগস্থ শ্রমিকদের প্রয়োজনে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন খুবই গুরত্বপূর্ণ। সেইসঙ্গে সকল শ্রমিককে বীমার আওতায় আনার কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। তাছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর যতক্ষণ কার্যকর ভূমিকা পালন না করবে ততক্ষণ সকল আইন বা উদ্যোগই অকার্যকর হয়ে থাকবে। সে কারণে শ্রম পরিদপ্তরেরও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জবাবদিহিতার কার্যকর পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজন।

মহান মে দিবসে আমরা যখন শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের কথা বলছি তখন বাংলাদেশ জ্বলে-পুড়ে ছারখার হচ্ছে পেট্রোল বোমার আগুনে। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে হরতাল-অবরোধ শুধু নাশকতাই সৃষ্টি করছে এবং এর কোনটিই সফল হয়নি। গত ৩ মাসে এই সহিংসতায় ১৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে ৩৭ জনই পরিবহনের শ্রমিক। তাছাড়া অসংখ্য নিরীহ মানুষ, শিশু এই আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এগুলোকে কেউ দুর্ঘটনা বলে পার পাবে না। এই শ্রমিকদের এবং নিরীহ মানুষকে সহযোগিতা করা বা তার পাশে দাঁড়ানোর উপায়টা কি? বার্ণ ইউনিটে পোড়া মানুষের কান্না, পুড়ে যাওয়া মাংসের গন্ধ, ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া বাস-ট্রাক, আগুনে অঙ্গার হয়ে যাওয়া গরু-মুরগি, রেললাইনে উল্টে পড়ে যাওয়া ট্রেনের বগি এসবই ভারি করে তোলে বাংলার আকাশ-বাতাস। এই ক্ষতিপূরণ কারা দিবে এবং এই ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড কি হবে?

বাঙ্গালি জাতি সৌভাগ্যবান। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ দেশ পরিচালনা করছেন। তাই এই অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি এবং আরও কিছু মানুষও এগিয়ে এসেছে যাদের মানবতাবোধ আছে। কিন্তু যাদের কারণে পুড়ছে মানুষ জ্বলছে দেশ তাদের কি কোন দায় নেই? তারা কি এই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নন। রাজনীতির নামে এই অপসংস্কৃতি আমরা রুখে দাঁড়াতে চাই। যেমন রুখে দাঁড়াতে চাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, মালিকের নির্যাতন, প্রশাসনের অবহেলা ও উদাসীনতা।

বাংলাদেশে সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা জরুরি। স্বাধীনতার ৪৪ বছরে আমরা এখনও এ সকল বিষয়ে ঐক্যমতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনি। সবকিছুর উর্ধ্বে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যা আমরা অর্জন করেছি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। সংবিধান আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল যে সংবিধানে সুস্পষ্ট লেখা আছে শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি ও অধিকারের কথা। যে অধিকার পেতে রাষ্ট্র তাকে কোন কিছু থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। সংবিধানের আলোকে শ্রমিক তার অধিকার প্রাপ্তির লক্ষ্যে যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে তখন সবই গুলিয়ে যায়, অস্বস্তিকর অপ-রাজনীতির সহিংসতার কারণে। একদিকে সুস্থ ধারার রাজনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধে লালিত স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ অন্যদিকে দেশকে নাশকতা-জঙ্গিবাদ-সাম্প্রদায়িকতার ছোবল থেকে রক্ষা করবার চ্যালেঞ্জ। এই দুইটি বিষয়ে শ্রমিককে সোচ্চার থাকতে হয়। সুতরাং চোখ বন্ধ করে এক চোখা নীতিতে শুধু শ্রমিকের দাবি পূরণের কথা তা শ্রমিককে রক্ষা করবে না। বরং পেট্রোল বোমার আঘাতে শ্রমিক পুড়ে অঙ্গার হয়ে থাকবে। এবারের মে দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক- দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও। দেশকে জঙ্গীবাদ, নাশকতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে শ্রমিকদের বেঁচে থাকার সকল শর্ত পূরণ করে দুর্ঘটনা ও নাশকতার মোকাবেলা কর। জয় হোক শ্রমজীবী মানুষের।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা

তপন চৌধুরী
সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

আমরা দেখতে পাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। অর্থনৈতিক প্রসার ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। সরকারের সকল ধরণের সহযোগিতা নিয়ে দেশে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরিচালিত হচ্ছে এবং উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও প্রসার পাচ্ছে। সম্পদ গতিময় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের সৃজনশীলতা এবং বাহ্যিক বৈরী পরিবেশকে উপযোগী কৌশল দ্বারা অভিযোজিত করার দক্ষতা তাদের সাহায্য করে থাকে। তবে এরূপ পরিস্থিতিতে সমস্যা থেকেই যায়। এসব শিল্পের অবকাঠামো যেহেতু ক্ষুদ্র, সেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এরূপ শিল্পের অবদান সীমাবদ্ধ। ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে মাঝারি শিল্প যুক্ত করা হলে সম্পদের উপযোগী এবং ফলদায়ক ব্যবহার নিশ্চিত হতে পারে। প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন নিশ্চিত করে এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে এতে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত ও রপ্তানি করা যায়। সাথে সাথে আন্তঃখাত সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার প্রয়াস পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সরকার অবশ্য নির্মাণ কাঠামোর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি খাতের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, যাতে এসব শিল্প খাত দৃঢ়তার সাথে অব্যাহত থাকতে পারে। লক্ষ করা যায় বাংলাদেশ শিল্পোদ্যোক্তাদের ৮০ শতাংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের। জিডিপিতে এরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠান উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখতে না পারলেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখে থাকে।

বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে এখনো একটি দরিদ্র দেশ, যদিও এখানে উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ভূমির স্বল্প পরিসর, জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি (১.৩৭%, ২০১১), বিপুল বেকার শ্রমিক অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি (৪৫% ২০১০), অথচ কর্মসংস্থানের অভাব, দারিদ্রসীমার নিচে জনসংখ্যার স্তর অনেক বড় (১৭.৬%, ২০১০), শিক্ষার নিম্নহার, রোগ, অপুষ্টি, দারিদ্র্য, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সংকট ইত্যাদি বিরাজমান। কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়ন এবং সেই সাথে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সার্বিক উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে। সরকার অবশ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থ সহযোগিতা ও উৎসাহ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও আর্থিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা রয়ে যাচ্ছে। যদিও সরকার দৃঢ়তার সাথে বলছে, ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে এর শতভাগ সত্যতা পাওয়া যায় না। এ কথা সত্য সরকারের উদ্যোগ ও উৎসাহের ঘাটতি নেই বলা যায়। দেশের জিডিপি যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কর্মসংস্থান সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বি বি এস জরিপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১১ থেকে ২০১৩ সালে দেশে ৪০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু এ কর্মসংস্থানের পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিচারে অপ্রতুল যদিও বাংলাদেশে ৬ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি রয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে বেকার জনমানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে অর্থাৎ শ্রম বাজারে বেকার মানুষের আধিক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ (২০১৩-২০১৪) ১৫৫.৮ মিলিয়ন এবং তথ্য অনুযায়ী ১৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সের কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৭ লাখ। অথচ ২০১০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৪১ লাখ। এ পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, দেশে কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কর্মসংস্থান সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

সত্য বলতে কী, দেশের ভূমির সীমাবদ্ধতার কারণে শিল্প খাতের উন্নয়ন অর্থাৎ পুঁজির সঠিক বিনিয়োগ এবং এ বিনিয়োগের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য কাঠামোগত সহযোগিতা, অর্থায়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বাজার সুবিধা, বন্দর সুবিধা, উদ্যোগী ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি একান্ত অপরিহার্য। এরূপ শিল্প কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ণই নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বিপুলভাবে পূরণ করে থাকে। গ্রাম বাংলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করে কৃষি ক্ষেত্রে আমূল উন্নয়ন সাধন করা যায়। বাংলাদেশ সরকার এরূপ শিল্পোন্নয়নে উৎসাহী বলে দেশে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বর্তমান সরকার এ খাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের অপর দেশগুলোর সঙ্গে টিকে থাকতে হবে। বিষয়টি উদ্যোক্তাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং পূর্বের গতিধারা, আচার-আচরণ, কর্মতৎপরতা পরিবর্তন করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যয় গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে।

উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ও উৎকর্ষের উপর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়ন বিপুলভাবে নির্ভরশীল। কারণ দেশে ও বিদেশের বাজারে পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নির্ভর করে পণ্যের গুণগত মান ও উৎপাদন ব্যয়ের ওপর। এটি স্থিতিশীল রাখার জন্য বিশেষভাবে শ্রমিকের দক্ষতা, নিপুণ কারিগর, মেধা প্রায়োগিক বা ফলিত জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের সদিচ্ছা, আগ্রহ ও নিরঙ্কুশ শ্রম আবশ্যক। সুতরাং শ্রমশক্তিকে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হবে কেননা গুণসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষতার বিকল্প নেই।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশে উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সঠিক মানসম্পন্ন পণ্য তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা অপরিহার্য। অবাধ বাণিজ্যের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমেই সমন্বিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সনাতন কর্মধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করে কর্ম প্রেরণা ও কর্মোদ্যোগে প্রয়াসী হওয়ার সময় এসেছে। বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে নিতে হবে, যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও উন্নততর জীবনব্যবস্থার বিধান স্থাপন করা যায়। এ জন্য প্রয়োজন কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার, অপচয় হ্রাস, দক্ষ ও নিপুণ কারিগর সৃষ্টি, শোভন কর্ম পরিবেশের সূচনা, কৌশলগত ব্যবস্থাপনার উন্মেষ ঘটানো, সুষ্ঠু মালিক-শ্রমিক কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিল্পের প্রতি অঙ্গীভূত অনুভব করা সর্বোপরি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী গণতন্ত্রভিত্তিক রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা বিশ্বাস করি অনাগত দিনগুলোতে বাংলাদেশ এমন সুন্দর পরিবেশ পাবে, যা আমেরিকা, জাপান, মালয়েশিয়া, ইতালি প্রভৃতির মতো একটি দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পাবে।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন দেশে শিল্পোন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য সকল মালিক ও শ্রমিক সমাজকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। দেশে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে এবং সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ উপযোগী হলে আপামর জনসাধারণ এর সুফল ভোগ করতে পারবে, শ্রমজীবী মানুষ কর্মসংস্থান পাবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ ও জাতি দারিদ্র্যের বিষফোঁড়া থেকে রক্ষা পাবে, শান্তি স্থাপিত হবে।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

মহান মে দিবস ও পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা

মোঃ আতিকুল ইসলাম
সভাপতি, বিজিএমইএ

১মে হচ্ছে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে এ দিনটি ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত। ১৮৮৬ সালের এ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেট চত্বরে শ্রমিকরা দৈনিক কর্মঘণ্টা নির্ধারণসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। তখন সেখানে কর্মঘণ্টা ছিল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য ছিল ব্যাপক। শ্রমিকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বঞ্চনার প্রতিবাদে তারা ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং শিকাগোর হে মার্কেটের চত্বরে মিলিত হয়ে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে। পুলিশ শ্রমিকদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। বহু শ্রমিক হতাহত হন। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার শ্রমিকদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে শিকাগোর রক্তঝরা দিনটিকে স্বীকৃতি দিয়ে ১মে "মে দিবস" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর দেশে দেশে মে দিবস পালিত হচ্ছে। সেদিনকার ধর্মঘট পালনরত শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল মহান মে দিবস – আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সমগ্র রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণ ছুটি থাকে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ র‍্যালী, আলোচনা সভাসহ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করে থাকে। মে দিবসে পৃথিবী জুড়ে সকল শ্রমিক একাত্মতা প্রকাশ করে, সংহতি প্রকাশ করে – সেই সাথে প্রত্যাশা করে সুন্দর জীবনের, যেখানে কাজের অধিকার, মর্যাদা আর মজুরি হবে নিশ্চিত। আমি শ্রমিক ভাই-বোনদের এ প্রত্যাশার সাথে শতভাগ একাত্মতা প্রকাশ করছি। এ মে দিবসে আমি সমগ্র পোশাক শিল্প পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের অর্থনীতি যারা সচল রেখেছেন, জাতীয় অর্থনীতির সেসব গর্বিত সেনা – পোশাক শিল্পে নিয়োজিত আমাদের প্রাণপ্রিয় সকল শ্রমিক ভাই-বোনদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আজ বলতে দ্বিধা নেই যে শ্রমিক-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে তৈরি পোশাক শিল্প আজ প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারের একটি সফল পরিণত শিল্প। বেসরকারীখাতে গড়ে উঠা এ শিল্প সরাসরিভাবে ৪৪ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে; জাতীয় রপ্তানি আয়ে ৮১ শতাংশ অবদান রাখছে এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করেছে। লক্ষ্যনীয় যে, পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে ৮০ ভাগই হচ্ছে সমাজের দরিদ্র-অবহেলিত নারী সমাজ, যাদের অধিকাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুল্লেখযোগ্য। এরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে এসে উৎপাদনের মূল ধারায় সংযুক্ত হয়ে আজ সমগ্র অর্থনীতির চেহারাই বদলে দিয়েছে। পোশাক শিল্পের এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২১ সালে এ শিল্পে আরও ৩০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে, রপ্তানী মাত্রা বেড়ে হবে ৫০ বিলিয়ন ডলারে, যা আমরা গভীরভাবে আশাবাদী।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৮০ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। এসব শ্রমিকের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, চাকরির নিশ্চয়তা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বলতে কিছুই নেই। প্রতি বছর ৫ ভাগের ৪ ভাগ শ্রমশক্তি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। দেশের রাজধানী ঢাকা শহরেই কর্মরত মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৬০ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ শ্রমশক্তি দেশের শ্রমবাজারে যুক্ত হয়। তাদের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে ২ লাখ থেকে ২.৫ লাখ মানুষের

কর্মসংস্থান হয়, বেসরকারী পর্যায়ে ৩ লাখ থেকে ৪ লাখ, আত্মকর্মসংস্থানে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার মানুষ এবং বর্তমানে প্রবাসে প্রতিবছর ৪ লাখ থেকে ৪.১৫ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। প্রতিবছর আমাদের প্রায় ৪-৫ লাখ শ্রমশক্তি কর্মসংস্থানের বাইরে থেকে যাচ্ছে। পোশাক শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী তাদেরকে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলে বেকার সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

আমি পোশাক শিল্প পরিবারের পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, সরকার পোশাক শিল্প ও এ শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণে অনেকগুলো ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, – চট্টগ্রামে ৩ হাজার এবং ঢাকার আশুলিয়ায় ১ হাজার নারী শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে; বহুল প্রতিক্ষীত 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন-২০১৩' জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে এবং সংশোধিত শ্রম আইনে পোশাক শিল্পের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রম আইনকে যুগোপযোগী বিশেষ করে পেশাগত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত ও মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে; শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধাও বৃদ্ধি করা হয়েছে; ইতোমধ্যে খসড়া বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৪ প্রস্তুত করা হয়েছে যা অচীরেই পাশ হবে বলে আশা করছি; মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া নামক স্থানে ৪১২ একর জমির উপর অগ্নি-নিরাপত্তার আধুনিক সকল ব্যবস্থা সম্বলিত গার্মেন্টস ইকোনোমিকাল জোন স্থাপনের প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। পোশাক শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান/ডরমিটরী নির্মানের জন্য সরকার স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করেছেন। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, বর্তমান সরকার শ্রমবান্ধব ও ব্যবসাবান্ধব সরকার। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, নতুন মেয়াদেও সরকার শিল্প ও শ্রমিকের কল্যাণে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরও অনেক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

আমরা বিশ্বাস করি আমাদের কর্মী ভাই-বোনেরা সুস্থ্য থাকলে উৎপাদন বেশী হবে। শ্রমিকরা উৎপাদনের অংশ। আর তাই, তাদের কল্যাণে আমরা বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য চট্টগ্রাম ও ঢাকায় হাসপাতাল নির্মান; ১২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীদেরকে বিশেষ চিকিৎসাসেবা প্রদান; শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে ৫টি স্কুল পরিচালনা; গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স বাধ্যতামূলক করণ, শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের জন্য বৃত্তি প্রদান ও দক্ষ কর্মীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ প্রভৃতি।

রানা প্লাজা দূর্ঘটনা থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা নিয়েছি এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সহকারে অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ে কাজ শুরু করেছি। ACCORD, ALLIANCE ও NAP এর আওতায় সমস্ত রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিল্ডিং, ফায়ার এবং ইলেকট্রিক্যাল সেইফটি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

বিজিএমইএ'র নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হচ্ছে ঃ-

- কারখানায় নিরাপত্তা পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তার মান পর্যবেক্ষণের জন্য বিজিএমইএ'র নিয়োজিত ১০ জন প্রকৌশলী কাজ করে যাচ্ছে।

- বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিজিএমইএ প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের ৩৫ জন সাবেক কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগ দিয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত অগ্নি-নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে পোশাক শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। অদ্যাবধি ২৪৩১ টি কারখানার ৮৫,৮৩০ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- কারখানার মধ্যম ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও সুপারভাইজারদেরকে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিজিএমইএ কর্তৃক ২০১২ সালের শেষার্ধে গৃহীত Crash Program অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুই হাজারেরও বেশি পোশাক কারখানাকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

• শ্রমিক-কর্মচারীসহ মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে শ্রম আইন ও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে বিজিএমইএ থেকে প্রতি মাসে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৯৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

• আইএলও'র সার্বিক তত্বাবধানে কর্মক্ষেত্রে "পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা" সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে। নয় মাস ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় আট লক্ষ শ্রমিককে "পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা" সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিক ভাই-বোনেরা যাতে মানসম্মত জীবন যাপন করতে পারেন, সে ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্রেতাদেরও সমান দ্বায়িত্ব রয়েছে। উদ্যোক্তা ও ক্রেতারা মিলে একটি নিরাপদ অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন, যেখানে আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনেরা ভালো থাকবে। এ ব্যাপারে ক্রেতাদের সুদৃষ্টি একান্তভাবে কামনা করছি।

পরিশেষে আশা করছি, মহান মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়ন করতে হলে শ্রমিক ভাই-বোনদের কল্যাণ ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের পাশাপাশি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। মহান মে দিবসের শিক্ষা শুধুমাত্র শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জাতীয় আর্থ-সামাজিক মুক্তির পথকে ত্বরান্বিত করার বিষয়টিও এদিনের অঙ্গীকারের অংশ হওয়া উচিত। তাহলেই আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছাতে সক্ষম হবো।

**"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"**

মহান মে দিবসের প্রেক্ষাপটে জাতীয় উন্নয়নে শ্রমিক কর্মচারীর ঐক্য

আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ
সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি

১৮৩৬ সালে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস এর একজন শ্রমিক তার সহকর্মীদের নিয়ে সভা করার সময় গ্রেফতার ও শাস্তি প্রাপ্ত হন। এর প্রতিবাদ জানায় লন্ডনের ওয়ার্কিং মেনস এসোসিয়েশন। এ সংগঠনের নেতা উইলিয়াম লোবেটি এর প্রতিবাদ ও শ্রমিক ঐক্যের আহ্বান করেন। পরবর্তীতে তিনিও গ্রেফতার হন। একই সময়কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট ম্যানুফেস্টোর প্রকাশ পায়; যার শেষ বাক্যটি ছিলো, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।'

কর্মঘণ্টা কমানোর দাবিতে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পরিণতি মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার 'হে মার্কেট স্কোয়ারে' আমেরিকান শ্রমিকদের রক্ত ঝরানোর আগেও আমেরিকান শ্রমিকগণ অনেকবার ধর্মঘটে অংশ নিয়েছে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ১৮২৭ সালে ফিলাডেলফিয়াতে ১৫টি শ্রমিক ইউনিয়ন মিলিত হয়ে গঠন করে। ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকস ইউনিয়ন। এটিই পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক ফেডারেশন।

মে দিবস উদযাপন বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের সংহতি প্রকাশের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৮৩৬ সালে জার্মান প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়ে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক অথচ গোপন সংগঠন স্থাপিত হয় 'সৎলীগ' নামে। পরবর্তীতে এর নাম পরিবর্তিত হয় 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে। ১৮৫২ সালে এ সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটে।

১৮৬৪ সালে পশ্চিম ইউরোপের প্রধান দেশসমূহের শ্রমিক নেতাগণ মিলিত হন লন্ডনের সেন্টমার্টিন হলে। এর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস। সভায় শ্রমিকদের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যা পরে পরিচিতি লাভ করে First International নামে। এ সংগঠনটিই শ্রমিকদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং এর বিস্তৃতি ঘটে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকায়।

১৮৭০ সালের ১৮ মার্চ শ্রমিক শ্রেণী প্যারিসের ক্ষমতা দখল করে যা ইতিহাসে 'প্যারির কমিউন' নামে পরিচিত। এ ক্ষমতার মেয়াদ ছিলো মাত্র ৭১ দিন। হাজারো শ্রমিকের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে এ ক্ষমতার রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। এ ব্যর্থতা ও নানামুখী অসুবিধার কারণে ১৮৭২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের সদর দফতর লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে স্থানান্তারিত করা হয়, তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি এবং ১৮৭৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

১৮৮৯ সালে প্যারিসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক নেতাগণ মিলিত হন। প্যারিস কংগ্রেসেই গঠিত হয় 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (Second International)। এরপর থেকে প্রতি বছর বার্ষিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় যা ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চলে। ১৯১০ সালের কোপেন হেগেন সম্মেলনে বাম ডান দ্বন্দ্ব, ১৯১১ সালে ইতালি তুরস্ক যুদ্ধ, ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধ ও ১৯১৪ সালে প্রথম মহা সমরের ফলে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯১৮ সালে পুনরায় সংগঠনটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার চেষ্টা হয় কিন্তু যুদ্ধের কারণে তা আর সম্ভব হয়নি।

১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী 'লীগ অব নেশন' এর সঙ্গে আইএলও'র সৃষ্টি হয়। 'লীগ অব নেশন' বিলুপ্ত হলেও আইএলও টিকে থাকে।

আইএলও একটি দ্বিপক্ষীয় সংগঠন সেখানে মালিক ও সরকার পক্ষের সাথে আসে শ্রমিক প্রতিনিধি। এখানে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক নেতাদের পরিচয় ও কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ ঘটে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অবদান রাখে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে একত্রিত করার লক্ষ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন বা বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (WFTU) এর সাথে জড়িত।

জাতীয় শ্রমিক লীগ 'ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন' এর সাথে বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অব লেবার এর সাথে সংযুক্ত হয়। শ্রমজীবীদের এই সুদীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের যুগান্তকারী প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ধারাবাহিক আন্দোলনে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রনীতি প্রবর্তনের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রম কল্যাণ ও শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক শ্রমনীতি, সর্বোচ্চ পরিচালনা বোর্ড, শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিষদ, মজুরি ও শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, আন্দোলন/ধর্মঘট এবং উৎপাদন নিশ্চিত করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবার দিক নির্দেশনা দেন।

১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভার শ্রমমন্ত্রী জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। এ শ্রমনীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো ছিলো: (ক) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সর্বোচ্চ বোর্ড যা শ্রমিকদের ২ জন, কর্তৃপক্ষের ২ জন ও ঋণদান সংস্থার ১ জন মোট ৫ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়। শ্রমিকদের মজুরি ও অর্থনৈতিক সুবিধাদি সংক্রান্ত বিষয়গুলো ন্যস্ত রাখা হয় সরকারের কাছে। এছাড়াও যাবতীয় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বোর্ডকে সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়।

অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্য শ্রমিক কর্মচারী ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি জাতীয় মজুরি বোর্ড গঠনের বিধান রাখা হয়। শিল্প কারখানায় মালিক-শ্রমিক বিরোধ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মেটাতে ব্যর্থ হলে শ্রম দপ্তর, শ্রম আদালত এবং শেষতক শ্রম আপীল আদালতের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করার বিধান রাখা হয়।

সরকারী বেসরকারি শিল্প ও শ্রমিকগণের ধর্মঘট/আন্দোলন করার অধিকারও এই শ্রমনীতিতে স্বীকৃতি দেয়া হয়। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত নয়। কারণ এ শিল্পের ব্যবস্থাপনায় থাকবেন শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ। তারা যেকোন বিরোধ নিজেরাই আপস আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করবেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পাঁচ বছরের সাফল্য ঃ

বিগত মহাজোট সরকারের প্রধান দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী Vision-2021 এর আলোকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পেক্ষাপটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, MDG এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম আইনের যুগোপযোগীকরণ, জাতীয় শ্রম নীতি পুনর্মূল্যায়ণ, ন্যূনতম মজুরী পুনঃনির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন ঃ

১। শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনঃ শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সম্পর্কের আইনগতভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬" সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা, মেরিটাইম আইন শিপিং অর্ডিন্যান্স পরিবর্তন সহ ২০১৩ সালে জুলাই মাসে মহান জাতীয় সংসদে এ আইন সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে।

২। শ্রমিকদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সাথে বেসরকারী সেক্টরের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সামঞ্জস্য বিধান ও তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য শ্রমজীবী মানুষের দাবীর প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় ঘোষণা অনুযায়ী বেসরকারী সেক্টরের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও কার্যকর করা হয়েছে।

৩। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন ঃ দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং এ আইনের বিধান স্পষ্টীকরণ ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে এবং ১৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৪। জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন ঃ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সরকারের একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী জাতীয় শ্রমনীতি থাকা আবশ্যক। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের এক বছরের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বাধীন সরকার শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেছিল। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে একটি আধুনিক শ্রমনীতি প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ায় বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৫। শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন ঃ ১৯৯০ সনে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং ২০০১ সনে আইএলও কনভেনশন-১৮২ (নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসন কনভেনশন, ১৯৯৯) বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন-২০১৩) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স পূর্ণ হয়নি এমন শিশুকে শ্রমে নিয়োগ এবং অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের কিশোরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন ঃ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়ন ঃ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দেশের মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে ৩৭ (সাইত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ National Skills Development Council (NSDC) গঠন করা হয়েছে।

৮। **ব্যক্তিমালিকাধীন বেসরকারী সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন ঃ** বেসরকারী সড়ক পরিবহন খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০০৫ প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা না থাকায় এ আইনের সুফল শ্রমিকেরা পাচ্ছিল না। ফলে শ্রমিক কল্যাণধর্মী আইনটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারী সড়ক শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার মালিক-শ্রমিকদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নিয়োগপত্র প্রদানের সিদ্ধান্তটি আজো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি।

৯। **শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন ঃ** ২০০১ সনে বাংলাদেশ নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৮২ অনুসমর্থন করেছে। উক্ত কনভেনশনের বিধান (দফা ৪) অনুসারে অনুসমর্থনকারী দেশ সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে শিশুদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পক্ষে হানিকর কাজের তালিকা প্রণয়ন ও সময় পুনঃনির্ধারণ করবে। সে প্রেক্ষিতে সরকার এ সংশ্লিষ্ট সিভিল সোসাইটি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে আলোচনা করে ইতিহাসে ১ম বারের মত ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নির্ধারণপূর্বক ০৫/০৩/২০১৩ তারিখে সরকার কর্তৃক গেজেট প্রকাশ করা হয়।

১০। **গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি প্রণয়ন ঃ** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খসড়া গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি প্রণয়ন করেছে যা বর্তমানে আন্তঃমন্ত্রণালয় মতামত গ্রহণ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১১। **"শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতিমালা" প্রণয়নের উদ্যোগ ঃ** 'শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতি' প্রণয়নের লক্ষ্যে সেভ দ্য চিলড্রেন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গত ১৭/০৭/২০১৩ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১২। **নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ ঃ**

(ক) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ ঃ বিগত মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১০ গঠন করে। কমিশনের সুপারিশের আলোকে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৬ (ষোল)টি ধাপে সর্বনিম্ন ২,৪৫০/-(দুই হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা হতে ৪,১৫০/-(চার হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩,৫০০/-(তিন হাজার পাঁচশত) টাকা হতে ৫,৬০০/-(পাঁচ হাজার ছয়শত) টাকায় মজুরি স্কেল ও ভাতা/প্রান্তিক সুবিধাদি নির্ধারণ করে পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলী) আইন, ২০১২ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।

(খ) বেসরকারী শিল্প সেক্টরে নিম্নতম মজুরী ঘোষণা ঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর আওতায় ঘোষিত মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ)টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৮ (আটত্রিশ)টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ/ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫ (পাঁচ)টি সেক্টরের কার্যক্রম চলমান।

(গ) গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরী ঘোষণা ঃ ২০০৯ সনে সরকার ক্ষমতায় এসে ২০১০ সনে দেশের শ্রমঘন ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী RMG সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ১৬৬২ টাকা হতে ৮২% বৃদ্ধি করে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা পুনঃনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করেছে। পরবর্তীতে পুনরায় ২০১৩ সনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা হতে ৭৭% বৃদ্ধি করে ৫,৩০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

১৩। দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

(১) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২৬টি জেলায় ৩২৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত ২৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯ টি কর্মোপযোগী ট্রেডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বছর টিটিসিসমূহ হতে ২৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। যার ফলে দেশে বিদেশে তারা চাকুরী করে একদিকে বেকারত্ব দূর করছে অন্যদিকে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

(২) বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ ঃ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে দুই পর্যায়ে ০২ (দুই)টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৩য় পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাজ জুলাই, ২০১০ থেকে শুরু হয়ে জুন ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়েছে। ৩য় পর্যায়ে ৬৮৬৪.০০ লক্ষ (আটষট্টি কোটি চৌষট্টি লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) শিশু শ্রমিককে ০২(দুই) বছরের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ০৯ (নয়)টি ট্রেডে ০৬(ছয়) মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪। গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন ঃ গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল পরিবেশ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ জন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৫। কারখানা পরিদর্শন ঃ গার্মেন্টস কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকায় ২০টি এবং চট্টগ্রামে ০৩ টি সর্বমোট ২৩টি পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়েছে।

১৬। Better Work Programme ঃ ILO এর সহায়তায় তৈরী পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম আধুনিকায়ন, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং তৈরী পোশাক শিল্পের প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিককে কারখানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৭। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ঃ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫নং আইন) সংশোধন পূর্বক গত ১৭-০২-২০১৩ তারিখ 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩' বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়। ক. শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠী বীমা কার্যক্রম চালুকরণ ঃ নির্মাণ ও মটরযান মেরামত সেক্টরে বেশ কয়েক লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ কাজ করে। এসব শ্রমজীবী মানুষকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউণ্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহায়তায় বর্ণিত দু'টি সেক্টরের জন্য প্রায় ১৬৫০ জন শ্রমিকের জন্য ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী দু'টি আলাদা আলাদা গোষ্ঠী বীমা স্কীম চালু করা হয়েছে।

১৮। ডিজিটাল কার্যক্রম ঃ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে অন্যদিকে কাজের গতিশীলতা বাড়বে এবং সময়ের অপচয় কমবে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের শ্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যক্রম ঃ

(ক) শিল্প পুলিশ ও নৌ-পুলিশ গঠন ঃ বাংলাদেশ শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে। তাই শিল্প ঘন এলাকা ও নৌ-পথসমূহে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে।

(খ) গার্মেন্টস শিল্প পল্লী স্থাপন ঃ মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ৫৩০ একর জমিতে একটি 'গার্মেন্টস শিল্প পল্লী' স্থাপন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে। এছাড়া নদীমাতৃক বাংলাদেশে ৩৬ হাজার নৌ-পথের নাব্যতা হারিয়ে বর্তমানে বর্ষা মৌসুমে সর্বোচ্চ সাড়ে ৩ হাজার নৌযান চলাচলের উপযোগী নদী রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নৌ পথ উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করেছেন। নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও মাদারীপুর নতুন মেরিন একাডেমি, ঢাকা শহরের বৃত্তাকার ওয়ার্কওয়ে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। জাহাজী শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন রুটে নতুন নতুন যাত্রী বাহন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পে-স্কেল বাস্তবায়নের পূর্বে জাহাজী শ্রমিকদের ২০% বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে- যা পে-স্কেল বাস্তবায়নের সময় সমন্বয় করা হবে। নৌ-রুটসমূহকে গতিশীল করার জন্য ড্রেজিং কার্যক্রম এগিয়ে চলছে এবং নতুন নতুন যাত্রীবাহি, মালবাহি ফেরি সার্ভিস নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে।

মহান মে দিবসে বিশ্বের মেহনতী মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল এবং ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত কর্মসূচী ও ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য বাংলার মেহনতী মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। পরিশেষে যাদের রক্তের বিনিময়ে শ্রমজীবী মানুষ মহান মে দিবস উদযাপন করছে তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

দুনিয়ার মজদুর
এক হও
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

এস. এম. আশরাফুজ্জামান
শ্রম পরিচালক,
শ্রম পরিদপ্তর, ঢাকা।

প্রতি বছর "মে দিবস" ফিরে আসে। আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের "মকরপ্যাক রিপার ওয়ার্কস" নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটি শ্রমিকদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে জন্ম হয়েছিল মহান মে দিবসের। সেই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহান মে দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।

বিশ্বায়ন ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বেসরকারী খাতে বিপুল পরিমান দেশী বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটেছে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে, পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির গুরুত্ব বেড়েছে, স্বল্প খরচে সুন্দর ও গুনগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। চাহিদার ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে শিল্প টিকে থাকবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের সনাতন ধারণার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার তিনটি পক্ষ; শ্রমিক-মালিক-সরকার এর সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের সার্বিক উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হয়। দেশের শিল্প সেক্টরে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখতে সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক, শ্রমিক কল্যাণ, শিল্প স্বার্থ সর্বোপরি উৎপাদন কর্মকাণ্ডকে অব্যাহতভাবে সচল রাখতে ২০০৬ সালের ১১ অক্টোবর প্রণীত হয় "বাংলাদেশ শ্রম আইন- ২০০৬" । সরকার শুধুমাত্র আইন করেনি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় শ্রম আইন যুগোপযোগীকরণ, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন, ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড গঠন, শ্রম আদালত পূনর্গঠন ও সার্কিট কোর্ট স্থাপন, শিশু শ্রম নিরসন নীতি , জাতীয় শ্রমনীতি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন এবং শ্রমিকদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছরে উন্নীতকরণ সহ শ্রমিকদের কল্যাণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বেসরকারী খাতে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করা হয়েছে।

রহিত করা শ্রম আইনের তুলনায় ২০০৬ সালে প্রণীত "বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬" অধিকতর শ্রমবান্ধব, পরিবেশবান্ধব, পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সহায়ক এবং সামাজিক সুরক্ষাবান্ধব। নিশ্চিত করেই বলা যায় আমাদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় আমাদের প্রণীত শ্রম আইন সমৃদ্ধ ও উন্নত ।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের মাটিতে ১৯৭২ সালে প্রথম মে দিবসের এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০১ মে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন এবং সরকারিভাবে মে দিবস উদযাপনের নির্দেশ প্রদান করেন। ঐ বছরের ২২ মে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইএলও (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা) এর সদস্যপদ লাভ করে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ শ্রম আইনকে যুগোপযোগী ও কার্যকরী করতে ২০১৩ সালে সংশোধনী আনেন। বর্তমানে যা "বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত ২০১৩)" নামে বিদ্যমান রয়েছে।

শ্রম এবং উন্নয়ন শব্দ দুটি এখন আর আলাদা নয় বরং একে অন্যের পরিপূরক । শ্রম ছাড়া উন্নয়ন একেবারেই অসম্ভব। অন্যদিকে যেখানে শ্রম, সেখানে উন্নয়ন অবস্থান করে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি দেশভিত্তিক কোনো বিষয় নয়, এটি বিশ্বব্যাপী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইএলও শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয় নিয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করছে, আইএলও এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তার অধীনস্ত দুটি দপ্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তর এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে শ্রম আইন, শ্রম অর্থনীতি, শ্রম প্রশাসন, শিল্প সম্পর্ক সর্বোপরি শ্রমিক মালিক স্বার্থ রক্ষার্থে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিকের মৌলিক অধিকার সম্বলিত আইএলও এর আটটি কোর কনভেনশনের মধ্যে আমরা সাতটি ইতোমধ্যে অনুসমর্থন করেছি। যার মধ্যে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা বিষয়ক কনভেনশন-৮৭ এবং শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যৌথ দরকষাকষির অধিকার বিষয়ক কনভেনশন-৯৮ অন্যতম । শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ-১৯৬৯ এবং নতুন প্রণীত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে কনভেনশনদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সৃষ্ট মত পার্থক্য কিংবা বিরোধকেই শিল্প বিরোধ বলা হয়ে থাকে। আমাদের আইনে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পর্যাপ্ত বিধান রয়েছে। তবে শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধির মাঝে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে আলাপ আলোচনা করে বিরোধ নিষ্পত্তিকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তিকে উৎসাহ প্রদান করি।

শিল্পবিরোধ যদি দ্বি-পাক্ষিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হয়, তবে বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ সালিশের মাধ্যমে বিরোধটি মীমাংসার ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু শ্রম পরিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের জন্য সালিশ হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। যেহেতু শিল্পে শান্তি ও সু-সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নতিই আমাদের কাম্য সেহেতু যে কোন প্রতিষ্ঠানে উদ্ভূত কোন শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংঘাতের পথ পরিহার করে সালিশীর মাধ্যমে উভয় পক্ষের মত পার্থক্য কমিয়ে এনে সমঝোতা ও চুক্তিতে উপনীত হতে আমরা সহায়তা করে থাকি। সালিশ দক্ষতার সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফলতার স্বাক্ষর রাখেন। শিল্পে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে বর্তমান সরকারের বড় সহযোগিতা হচ্ছে আইনের সরলীকরণ । সরকার আইনের আরও সরলীকরণ ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ত্রিপক্ষীয় একটি কমিটি গঠন করেছেন এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে, শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থে বাস্তবসম্মত আইনের সংশোধনী উপহার দিয়েছেন, যা শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক মালিকের মধ্যে সু-সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এরপরও যদি আইনে কোনো অস্পষ্টতা , অসংগতি থেকে থাকে প্রয়োজনবোধে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে আবারো সংশোধনী আনা হবে-মর্মে সরকার আশ্বাস প্রদান করেছেন।

শ্রমিক ও মালিকের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও যুক্তিসংগত মনোভাবের উপর আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নির্ভর করে। উভয়ের লক্ষ্য হতে হবে শিল্পে লাভজনক উন্নয়ন। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, মজুরীসহ শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়, মালিকের উদ্বৃত্তের পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং সর্বোপরি সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিক মালিক উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব সমগুরুত্বপূর্ণ । আর এজন্যই সরকার-শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতির উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সরকারের শ্রম ও শ্রম প্রশাসন বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম আইন বাস্তবায়নে কাজ করে থাকে। শ্রম পরিদপ্তর শান্তিপূর্ণ পন্থায় শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা, সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের উন্নয়ন এবং দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান, কার্যক্রম তদারকি, শ্রমিকদের নানাবিধ কল্যাণ, সহযোগিতা, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং জীবনমান উন্নয়নে নানামুখী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে।

শ্রম পরিদপ্তর এর অধীন ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI), ১ টি জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ইউনিট ৪ টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১ টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর এবং ৩০ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র (LWC) রয়েছে। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহ মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে দেশের প্রচলিত শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শ্রম অর্থনীতি, শিল্প সম্পর্ক, শ্রমিক শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ ট্রেড ইউনিয়নের কর্মতৎপরতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করছে এবং অব্যাহত উন্নয়ন তৎপরতায় দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণে চিকিৎসাসেবা প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ, শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা, পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠদান সহ সর্বোপরি শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ও বিনোদনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণ মূলক কর্মশালা বা প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। শতকরা ৭৬ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প হচ্ছে তৈরী পোশাক শিল্প । তৈরী পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের কল্যাণ, জীবনমান উন্নয়ন ও উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সোস্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরামের অধীন "টাস্কফোর্স অন লেবার ওয়েলফেয়ার"এবং "টাস্ক ফোর্স অন অক্যুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি" কাজ করছে। তাৎক্ষণিকভাবে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করছে। শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরী প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ও শিল্প ভিত্তিক শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিক, মালিক সর্বোপরি শিল্পের নিরাপত্তা বিধানের জন্য শিল্প পুলিশ গঠন করা হয়েছে-যা শ্রমবান্ধব বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ।

তাই পরিশেষে বলা যায়, শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমিক অসন্তোষ দূর করার জন্য পারস্পরিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে শ্রমিক মালিক সরকার প্রত্যেকে যার যার অবস্থানে থেকে শিল্পের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। তবেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। তাইতো এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

মেহনতি মানুষের আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর মহান মে দিবসের চেতনা, দেশ ও জনগনের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রয়াসকে বেগবান করবে- এই হোক আমাদের সবার প্রত্যাশা।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

দাবী ও অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

মহান মে দিবস সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বিজয় ও সংহতির দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে সেই ১২৯ বছর পূর্ব থেকে। ১৮৮৬ সালের এই দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা শ্রম, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম ও ৮ ঘণ্টা বিনোদন এই দাবীতে আন্দোলনে নেমে পড়লে পুলিশী হামলায় সে দিন অনেকেই আহত ও গ্রেফতার হন। গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দদেরকে প্রহসনমূলক বিচারে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। সেই দিন থেকে রচিত হয়েছিল নতুন অধ্যায়ের, ন্যায্য দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠার নতুন সংগ্রামের এবং নতুন প্রত্যয় ও প্রত্যাশার। মে দিবস সূচনার ১২৯ বছর আর মহান স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষকে আজও তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে হয়, যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিক কর্মচারীরা উন্নত জীবন ও অধিকতর অধিকার এবং শোভন কাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত।

কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের দেশের শ্রমিক কর্মচারীরা এখনো বাঁচার মত মজুরী, আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ অন্যান্য ন্যায় সংগত অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। মুক্ত বাজার অর্থনীতির দাপটে নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্যের কারণে স্বল্প ও সীমিত আয়ের মানুষদের পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। ভাত, কাপড়, মাথা গোঁজার ঠাঁই, শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও আমাদের দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রয়োজনীয় ক্যালরী ও পুষ্টির অভাবে ন্যূনতম মান সম্মত খাবার খেতে না পারায় শ্রমিক কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। আক্রান্ত হচ্ছে নানা রোগ ব্যাধিতে। শহর উপশহর গুলোতে বাড়িভাড়া দফায় দফায় বাড়ানোর ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের আয়ের বড় অংশ চলে যায় বাড়িভাড়া দিতেই। বাড়িভাড়া মিটিয়ে খাদ্য সহ জীবন ধারণের অন্যসব প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনার জন্য হাতে টাকা থাকে খুব কমই।

তারা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু স্বপ্ন পূরনের পথ খুজে পায়না। ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নানাবাবে বাধাগ্রস্থ করা হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যাই বেশি। নির্মাণ, চাতাল, পরিবহন, সেবা খাতসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শত করা প্রাই ৯০ ভাগ শ্রমিকই মূলত অসংগঠিত। এসব অসংগঠিত খাতের শ্রমিকদের নামমাত্র মজুরী দিয়ে কাজ করানো হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কোন নিয়োগ পত্র দেয়া হয় না। চাকুরীর সময়সীমা কিংবা ছুটির বিধান অনেক ক্ষেত্রে নেই। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের সাথে সংগঠিত না হওয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে কোন ধরণের দরকষাকষির ও কোন সুযোগ পায়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শ্রমিকদের মজুরী নির্ভর করে মালিকদের মর্জির উপর। এদের মূলত চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। ওভার টাইম ভাতা না দিয়ে এসব শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তাদের কার্যত কোন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার না থাকায় দরকষাকষির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নামমাত্র মজুরীতেই তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

নতুন নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির তুলনায় শ্রম বাজারে প্রতিনিয়ত দক্ষ- অদক্ষ শ্রম শক্তির আগমন বেশি হওয়ায় শ্রমিকরা নিয়োগ কর্তার কথায় কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নারী শ্রমিকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তৈরি পোষাক শিল্প ছাড়াও শ্রম বাজারে প্রতিনিয়তই নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। পরিবার তথা সংসারের আর্থিক প্রয়োজন মেটানো এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার তাগিদে নারীরা নানা পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যে আমাদের দেশের নারী শ্রমিকদের সমান কাজে সমান মজুরী কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও দেয়া হয় না। কৃষিকাজে নারীর বিপুল অংশগ্রহণ স্বত্বেও তাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়না। গৃহস্থালী কাজে নারী শ্রমিক অংশ গ্রহণে জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবস্থানের স্বীকৃতি নেই। মজুরী বৈষম্য ছাড়াও নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নানা ধরণের হয়রানী ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। যাতায়তের জন্য পরিবহন সমস্যা ও নিরাপত্তার অভাব নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। শ্রমিকরা কাজ করতে গিয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসতে পারেন কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। ভবন ধ্বংস কিংবা অগ্নিকাণ্ডের কারণে হতাহতের ঘটনা অহরহই ঘটছে। অথচ এর প্রতিকারের এবং নিরাপত্তার কার্যকর উদ্যোগ অতীতে লক্ষ্য করা না গেলেও বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা শুভ লক্ষণ হিসেবেই বিবেচনার দাবি রাখে।

আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্পে ৩০ লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করছে। এদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক। কিন্তু এই সেক্টরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারখানার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নসহ অনেক ন্যায় সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ৫,৩০০ নির্ধারণ করা হলেও বর্তমানে ৪ সদস্যের একটি ছোট পরিবারে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য তা যথেষ্ট নয়। ৩-৪ বছর পূর্বের পুঁজির ভিত্তিতে ৪ সদস্যের একটি পরিবারের জন্য খরচ পরে ১৬,০০০-১৭০০০/- হাজার টাকা। সেক্ষেত্রে ২ জন্য চাকুরী করলেও তার ন্যূনতম মজুরী ৮০০০ হাজার হওয়া উচিৎ। অথচ সেক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক গার্মেন্টস ফ্যক্টরীতে এই ন্যূনতম মজুরীও কার্যকর হয়নি এখনো। আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি লোক অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে বিদেশে কর্মরত। এই খাতটি সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান করে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থের পরিমান হচ্ছে ১৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বিদেশে কর্মরত শ্রমিকরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনিয়া খেটে, অত্যাচার-নির্যাতন সয়ে একদিকে যেমন বিশাল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে তেমনি বিপুল সংখ্যক মানুষ বিদেশে অবস্থান করায় খাদ্যসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর চাপ কম পড়ছে। অথচ বিদেশে আমাদের কিছু সংখ্যক শ্রমিক বেঘোড়ে প্রাণ হারায়, নির্যাতনের শিকার হয়।

আদম ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হয়। এক্ষেত্রে সরকার বা বিদেশে অবস্থানরত আমাদের দেশের দুতাবাসগুলো সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করে না। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী এসকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকলেও কার্যত এখানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেয়া হয় না। মালিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের যে কোন উদ্যোগকে চাকুরীচ্যুতি, গুন্ডা, মাস্তান সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে আইনী বে-আইনী পন্থায় দমন করে দয়ে। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা মাঝে মধ্যে অসংগঠিত বিক্ষোভ আন্দোলন করছে। অসহনীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঁচার মত মজুরীর দাবীতে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে পড়ছে। কিন্তু মালিকদের অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটছে না। পুলিশ, প্রশাসন ও মাস্তান বাহিনী দিয়ে জোর জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে এ সমস্ত আন্দোলন দমন করা হয়। কিন্তু শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরী ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের আইনানুগভাবে সংগঠিত হওয়ার অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছেনা, কারণ তারা সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ নয়।

তবে এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে শাসক, শোষক ও মালিকপক্ষ পরাজয় মানতে বাধ্য হয়। শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ হাতের চেয়ে শক্তি কিছুই নেই। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হলে সবকিছুরই অর্জন করতে পারে। শ্রমিকদের দুই বাহু কাজ না করলে চাকা ঘুরে না। একটি ইটের উপর আরেকটি

ইটের গাঁথুনী দিয়ে মজবুত ইমারত গড়াও সম্ভব হয় না। কাজেই মানুষের শ্রম শক্তিকে দুর্বল ভাবার কোন কারণ নেই। আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম কারণ হলো শ্রমিক সংগঠন গুলোর রাজনৈতিক দলের লেজুড়ভিত্তি। সেজন্য ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের স্লোগান রাজনৈতিক স্বার্থ যার যার শ্রমিক স্বার্থে এক কাতার। আমাদের শ্লোগানের অর্থ এটা নয় যে শ্রমিকরা রাজনীতি বিবর্জিত থাকবে এবং এটা বলতে চাই যে, শ্রমিক শ্রেণী তার শ্রেণীগত অবস্থানে থেকে মালিকদের চরিত্র বিশ্লেষণ করবে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে এবং সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কারিগর হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

একই সাথে নিজেদের দাবী দাওয়া আদায়ের প্রশ্নে ক্ষুদ্র দলবাজী ও সংকীর্ণতা পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করবে। কারণ শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী বা অধিকার আদায়ের জন্য শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই। উক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে গত ২৮-২৯ নভেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নবম জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান ছিল 'শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়-সংগঠন গড়ে তোল'। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পিছুটান পরিহার করে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারী ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সততা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর চেতনার মান উন্নত করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করার পাশাপাশি দাবী দাওয়া, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কেও তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদসহ অন্যান পশ্চাদপদ চিন্তা চেতনা থেকে শ্রমিক আন্দোলনেকে মুক্ত রেখে সবাইকে সাংগঠনিক ভাবে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর: চ্যালেঞ্জেস এণ্ড অপরচুনিটিস

মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া
(অতিরিক্ত সচিব)
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মালিক কর্তৃক শ্রমিক নির্যাতন ও শোষণ আদিকাল থেকেই চলে আসছে। শ্রমিক ঠকানো ও শ্রমিকের রক্ত শোষণ ব্যতিত মালিক কখনো বড়লোক হতে পারে না। পিছু হটতে হটতে বা সহ্য করতে করতে পিঠ দেয়ালে ঠেকলে বা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে দুর্বলেরও চোয়াল শক্ত হতে থাকে, প্রতিবাদী হয়ে উঠে। ১৮৮৬ সালে তেমনটিই হয়েছিলো। কর্মঘন্টার কোনো সীমা-পরিসীমা না থাকায় শ্রমিকরা বিশ্রামের কোনো সুযোগ পাচ্ছিলো না। রক্ত-মাংশের শরীর কত আর চাপ সহ্য করতে পারে! তাই নির্যাতিত শ্রমিকগণ দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে জমায়েত হয়। তখন শ্রমিকদের ঘিরে থাকা পুলিশের উপর এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের দরুন পুলিশ শ্রমিকদের উপর এলোপাথারি গুলি করতে থাকে। এতে ১০ থেকে ১২ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর দৈনিক আট ঘন্টা কর্মঘন্টা নির্ধারিত হয়। ১৮৮৬ সালের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ স্মরণীয় করে রাখার জন্যই প্রতি বছর ১ মে তারিখে মে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তা অদ্যাবধি পালিত হয়ে আসছে।

তখন ভারত উপমহাদেশে বৃটিশের ঔপনিবেশিক শাসন চলছিলো। সেকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলেও ভারত উপমহাদেশে তেমন কলকারখানা না থাকায় শ্রমিক অসন্তোষ ছিলো না এবং সেকারণে শ্রমিকের কল্যাণ নিয়ে ভাবতো না। শোষণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই উন্নয়নের কাজ করতো বৃটিশ শাসক। চলাচলের পথ সহজ ও সুগম করার জন্য রেললাইন স্থাপন করেছে, ব্রিজ নির্মাণ করেছে, রাস্তা বানিয়েছে, চা-পানে আয়েশ করার জন্য সিলেট অঞ্চলে চা-বাগান বানিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয় হলেও অধিকৃত ঔপনিবেশিক এলাকাগুলোয় শাসন ধরে রাখা বৃটিশ শাসকের পক্ষে কঠিন হয়ে? উঠছিলো; তাই পর্যায়ক্রমে কলোনিগুলোতে স্বাধীনতা প্রদান করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। মাঝখানে ভারত রেখে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নাম দিয়ে দুটো দেশকে একত্রিত করে পাকিস্তান নামের এক অদ্ভূত দেশ সৃষ্টি করা হয়। তৎকালিন পাকিস্তানি শাসক শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে অসাম্যের শাসন শুরু করে। তখন বাংলাদেশ সোনালি আঁশের দেশ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করায় কিছু পাটকল স্থাপিত হয়। কলকারখানা মানেই শ্রমিক আর শোষণ। বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিকদের স্বার্থ দেখভাল করার জন্য পাকিস্তানি শাসনামলে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রনয়ন হতে থাকে। ঐ সকল আইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৬৯ সালের শ্রমনীতি ও শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কিত ৮১ নং আই.এল.ও. কনভেনশন অনুযায়ী ১৯৭০ সালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় প্রধান অফিস সহ চারটি বিভাগীয় অফিসের মাধ্যমে পরিদপ্তর পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এই পরিদপ্তরে জনবল ছিলো ৩১৪ জন। পরিদপ্তর এই জনবল দিয়ে সারাদেশে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংরক্ষণের চেষ্টা করে আসছিলো।

এরপর সত্তরের নির্বাচনে ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন সত্ত্বেও তদানিন্তন পাকিস্তানি সরকার ক্ষমতা দিতে গড়িমসি করে ও আলোচনা/সংলাপের নামে কালক্ষেপণ করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী সরকারের মতলব বুঝতে পেরে ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং মার্চের সাত তারিখে ঐতিহাসিক

ভাষণ প্রদান করেন, যে ভাষণে প্রকারান্তারে স্বাধীনতার ঘোষণাসহ যার যা আছে তা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদানিন্তন কুচক্রি পাকিস্তানী শাসক মার্চের ২৫ তারিখ গভীর রাতে ঘুমন্ত বাঙালি নিধনে ঢাকার পিলখানা ইপিআর ক্যাম্পে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোয় ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। ঐরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজারবাগ পুলিশলাইনে ও পিলখানা ইপিআর ক্যাম্পের বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা পাল্টা আক্রমন চালায়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ঐ মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারি-কৃষক-মেহনতি মানুষ-প্রেমিক-প্রেমিকা, আবালবৃদ্ধবণিতা কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যতীত সর্বশ্রেণীর ও পেশার মানুষ যার যার অবস্থানে থেকে একরকম খালি হাতেই যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত শরণার্থী আশ্রয় প্রদান সহ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, দেশে-বিদেশে কুটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে। চলে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে প্রিয় দেশ বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্থান লাভ করে।

স্বাধীনতার পর অনিবার্যভাবে দেশের সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করা হয়। আস্তে আস্তে দেশে ব্যক্তিমালিকানায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে এবং পাশাপাশি জাতীয়করণকৃত কলকারখানাগুলো বেসরকারীকরণ করা হতে থাকে। এ পর্যন্ত সারাদেশে অসংখ্য কলকারাখান ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং আরো গড়ে উঠছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প ও বাণিজ্য সেক্টরের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এসব শিল্পকারখানায় কাজ করছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারি। ৪৫ বছরে দেশে হাজার হাজার কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশেষ করে তৈরি পোষাক শিল্পে যুগান্তকারী বিস্তার লাভ করেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নম্বর সেক্টরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক, গুণগত মানের পরিবর্তন হয়নি। অত্যন্ত সীমিত জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট নিয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলতে থাকে। তুলনামূলকভাবে সকল ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মকর্তা ও যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় পরিদর্শন পরিদপ্তরে পরিদর্শকগণ প্রকৃত কাজ না করে অলস হয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ার অভিযোগ শোনা যায়। এই সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর মালিকরা আবাসিক এলাকাসহ যত্রতত্র ঝুকিপূর্ণ ভবনে কলকারখানা গড়ে তুলতে থাকে মানের কোনো তোয়াক্কা না করেই। সে কারণে পুরাণ ঢাকায় ক্যামিকেল কারখানা ও মিরপুরের রাবার কারখানায় আগুন ধরে যায় এবং তাজরিন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ও রানা প্লাজা ধ্বসে যায়। বিশেষ করে অধিক মুনাফা লাভে নেশায় তৈরি পোষাক শিল্পে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা দিকটা বিবেচনায় না নিয়ে যেনতেন প্রকারে নির্মিত ভবনে পোষাক শিল্প গড়ে উঠতে থাকে।

২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর বিশ্বের বড় বড় তৈরি পোষাক ক্রেতাদের দৃষ্টি বাংলাদেশের আরএমজি সেক্টরে নিবদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়; ফলে তৈরি পোষাক রপ্তানিতে ধ্বস নামে। তখন সরকারের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে আরএমজি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ২০০ পরিদর্শক নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

বাংলাদেশ সরকার আরএমজি সেক্টরে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি প্রধান কার্যালয় ও ২৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপনসহ জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩-এ বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর সহকারি মহা-পরিদর্শক সহ দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমপরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ইতোমধ্যে আরএমজি সেক্টরকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে

একটি রিভিউ প্যানেল গঠন করা হয়। রিভিউ প্যানেল এ পযন্ত ৮৪টি কারখানা পরিদর্শন করেছে এবং ২৩৩৪টি কারখানার এসেসমেন্ট সম্পন্ন করেছে। সেফটি ইস্যুতে ৩২টি কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ ও সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ও GIZ শ্রম পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় অফিস যন্ত্রপাতি প্রদান করে সহযোগিতা প্রদান করছে। বাংলাদেশ কর্মকমিশন সচিবালয় এ যাবৎ ১৮৯ জন সহকারি মহাপরিদর্শক ও শ্রম পরিদর্শকের নিয়োগের সুপারিশ করেছে। তন্মধ্যে পুলিশ ভেরিফিকেশন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রাপ্তির পর ১০২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও অধিদপ্তরের অর্থে পরিদর্শকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুনিয়াদি, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, পরিদর্শন পদ্ধতি, পেশাগত ব্যাধি, শ্রমিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ চলমান প্রক্রিয়া এবং যথাযথই প্রশিক্ষণই একজন ব্যক্তিকে অধিক দক্ষ ও কর্মতৎপর করে তোলে।

এদিকে অধিদপ্তরের মহাপরির্শক কর্তৃক পাঁচটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিগুলো স্ট্যাণ্ডার্ড অপারেটিং ম্যানুয়াল, পরিদর্শন চেকলিস্ট, পরিদর্শন নীতিমালা, অধিদপ্তরের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ইতোমধ্যে ইটালির তুরিনে ILO-র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ITC-তে এক ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ২০১৫ সালের একটি পরিদর্শন পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এই খসড়া পরিকল্পনাকে চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ সালে অধিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রম চলবে এবং প্রতিবছর এরই আদলে পরিদর্শন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

অধিদপ্তরের সামনে অনেক কাজ অনেক চ্যালেঞ্জ। পুরনো যারা পরিদর্শনের কাজে নিয়োজিত আছেন তাদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। কঠিন কাজ। তাড়াতাড়ি হবে না। অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তাকে দৃঢ় হাতে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

দেশে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বহু সংগঠন থাকলেও মালিকের বজ্রমুষ্ঠি থেকে শ্রমিকের ন্যায্য স্বার্থ আদায় করা খুবই কঠিন কাজ। বিশেষ করে বাংলাদেশে শিল্পমালিকদের কিছু অংশের মন ও মানসিকতা জোঁকের মতোই-শুধু শ্রমিকের রক্ত চুষে নিতে পারেলেই খুশি। এই জোঁকসদৃশ্য মানসিকতা তৈরি হয়েছে বৃটিশ শাসনামল পাঠ করে। সহসা এই মানসিকতার পরিবর্তন আসবে না। সেজন্যই আইনের বাধ্যবাধকতা প্রয়োজন। আর আইন প্রয়োগের একমাত্র ক্ষমতা সরকারের।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ শ্রমিকের সকল ধরনের প্রাপ্য সুযোগসুবিধার সংজ্ঞা ও আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। শিল্প-মালিকগণ ন্যায়নিষ্ঠ হলে আইন প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন কিছু সংখ্যক মালিকের মানসিকতা এরকম যে, শ্রমিক না ঠকালে শ্রমিকের মজুরি না মারলে বড়লোক হওয়া যায় না! কাজ করতে গিয়ে বা মালিকের উদাসিনতার জন্য দুর্ঘটনায় শ্রমিক মারা গেলো মালিকের চোখের পাতা ভিজে না। এক শ্রমিক মারা গেলে হাজার শ্রমিক গেটের সামনে লাইন ধরে থাকে চাকরির জন্য। বাংলাদেশে যে কোনো চাকরি সোনার হরিণের চেয়েও দুস্প্রাপ্র। একজন বেকার যুবক/যুবতি ও তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মা-বাবা যে কোনো মূল্যে চাকরি চায়। সেজন্য কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে অবৈধভাবে বিদেশ যাবার জন্য দালালদের খপ্পরে পড়ে সমদ্র পাড়ি দেয় এবং ডুবে মারা যায় অথবা বিদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকে।

আদমের দালালরা আমাদের দেশের। কাকের মাংশ কাকে না খেলেও আমাদের দেশের লোভীরা খায় এবং মজা করেই নিজের গায়ের মাংশ খায়। অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এ থেকে সহসা পরিত্রাণ আশা করা যায় না। তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সচেতন করতে হবে সবাইকে। সচেতন করতে হলে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ; যেমন-কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ইত্যাদি।

দেশের শিল্প-কারখানাগুলোয় কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি-ছুটিসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয় তো দেখতে হবে এবং মালিকদের সাথে আলোচনা করে, আলোচনায় না হলে শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করে নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। আরো এ নিরাপত্তার সাথে তিনটি বিষয় জড়িত।

ক) ভবনের সুরক্ষা: বাংলাদেশ বিল্ডিং কোড মেনে ফ্যাক্টরি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে কর্মক্ষেত্রের অর্ধেক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে যাবে। এটা পুরোপুরি নির্ভর করে মালিকের উপর। কোনো কারখানা-ব্যবসা একদিন বা একমাসের জন্য শুরু করা হয় না। যদি ঐ ব্যবসা মালিকের রুটি-রুজির উপায় হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই ফ্যাক্টরি ভবন বিল্ডিং কোড মেনেই নির্মাণ কর হবে। তাতে সুপরিসর সিড়ি থাকবে, একাধিক ফায়ার এক্সিট থাকবে, ভারি যন্ত্রপাতি-জেনারেটর ইত্যাদি গ্রাউণ্ড ফ্লোর বা বেসমেন্টে থাকবে-কোনমতেই গ্রাউণ্ড ফ্লোরের উপরে কোনো তলায় রাখা হবে না। অধিদপ্তরের কোনো পরিদর্শক পরিদর্শনকালে অবশ্যই এগুলো দেখবেন। ছোটখাটো কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে একটা স্বল্প সময়ের মধ্যে সংস্কারের জন্য বলতে হবে। বড় কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানাতে হবে। ঢাকায় রাজউক এবং ঢাকার বাইরের সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসের অনুমতি নিয়েই ভবন নির্মাণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্ল্যান-ডিজাইনের অনুমতি প্রদান করে।

খ) অগ্নি সুরক্ষা: অধিকাংশ শিল্প কারখানায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে, দাহ্য পদার্থ যত্রতত্র রাখার কারণে, নিম্নমানের বয়লার ব্যবহারে বিস্ফোরণ, ইত্যাদি কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটছে। বৈদ্যুতিক ওয়ারিং ভবন নির্মাণের সাথে জড়িত-ভবন মালিক/শিল্প মালিক উন্নত মানের তার দিয়ে যথাযথভাবে ওয়ারিং করেছে কিনা অথবা লুজ তার আছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব ভবন নির্মাণ অনুমোদন ও তদারিক করে যে সংস্থা তার। আর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের দায়িত্ব হলো ভবনে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে রাখা হয়েছে কিনা। পুরোনো বা নতুন যে কোনো ভবনে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা আদর্শ না থাকলে মোটিভেটে কাজ না হলে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে হলেও তা নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মিত মহড়া করতে হবে। আমরা চাইনা তাজরিন ফ্যাশন্সের মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটুক। তবু ঘটছে। যত্রতত্রত গড়ে উঠা ক্যামিকেল ফ্যাক্টরি ও রাবার ফ্যাক্টরিতে সিলিণ্ডার ফেটে, বয়লার বিস্ফোরিত হয়ে, রাসায়নিক পদার্থ/রাবারে আগুন লেগে শ্রমিক মারা যাচ্ছে। লক্ষনীয় যে, শিল্প কারখানার ভবন ধ্বসে বা অগ্নিকাণ্ডে কখনো মালিক বা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কেউ আহত হয় না বা মারা যায় না।

গ) স্বাস্থ্য সুরক্ষা: স্বাস্থ্য নিরাপত্তার সাথে পেশাগত ব্যাধি জড়িত। কর্মস্থলে মেশিন সংশ্লিষ্ট কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের অসর্তকায় বা কারিগরি কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। তাছাড়া এদুটো কারণে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য শ্রমিকদের সর্তকতা করা প্রয়োজন। আর পেশাগত ব্যাধি হয়ে থাকে শিল্প-কারখানার কাজের ধরনের কারণে। পাট ও বস্ত্রকল, স' মিল ও কাঠের কারখানা, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, ট্যানারি, ইত্যাদিতে কাজ করলে ডাস্টের কারণে শ্বাসনালি সংক্রান্ত রোগ হয়ে থাকে। মোবাইল ফোন বা কল সেন্টারে কাজ করলে বধির হবার সম্ভাবনা থাকে।

মিল মালিকদের অবশ্য কর্তব্য কোনো কারখানায় কী ধরনের পেশাগত ব্যাধি হবার সম্ভাবনা আছে তা কারখানা চত্বরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা এবং সাথে সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা। শিল্প-কারখানাগুলোয় কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ব্যাপারটি দেখভাল ও নিশ্চিত করা সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

উপরের পর্যালোচনা থেকে জানতে পারছি যে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রধান তিনটি দিকে নিরপত্তা প্রদানের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে সরকারের তিনটি বিভাগের দায়িত্ব থেকে থাকলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কাজ কী? কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মজুরি ও অন্যান্য আইনে বর্ণিত প্রাপ্য বিষয়াদি নিশ্চিত করণ সহ

নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের সকল প্রকার সুরক্ষার বিষয়গুলো সনাক্ত করে তা সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে কর্মপরিবেশকে শতভাগ আশঙ্কামুক্ত রাখা মূলত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনগত দায়িত্ব।

পরিদর্শকদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই এগিয়ে যেতে হবে সামনে। চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ পুরোপুরিভাবে জানা;
২. দেশের সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা;
৩. সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের আওতায় আনা;
৪. অন লাইনে লাইসেন্স প্রদান সহ সকল কার্যক্রম কার্যকরি করে তোলা;
৫. তৈরি পোষাক শিল্প সেক্টরে ১০০% কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা;
৬. প্রতিটি কলকারাখানা ও প্রতিষ্ঠান খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে অনন্তপক্ষে একবার পরিদর্শন করে সুরক্ষা সম্পর্কিত ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৭. মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো চিহ্নিত করে মালিককে জানানো এবং তা প্রতিকারের জন্য সময় বেঁধে দেয়া;
৮. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ঝুকিমুক্ত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা;
৯. মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা;
১০. ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
১১. নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, ইত্যাদি।

যেদিন দেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও অবস্থা পরিদর্শকদের নখদর্পণে থাকবে এবং শ্রমিকদের আইনে বর্ণিত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে মালিকের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হবে না এবং শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে না, সেদিন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ভিশন অর্জিত হয়ে যাবে। পরিদর্শনের মাধ্যমে কলকারখানায় সুরক্ষার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা যাবে, কলকারখানাগুলোয় তত উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

মৃত্তিকা

শফিক আলম মেহেদী
সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

তোমাকে নিয়ে কোথায় পালাবো মৃত্তিকা
যত কৃষ্ণ হোক এ তো আমার দেশ
এখানে জীবন বাঁচে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে
এখানে বাতাসে লাশের গন্ধ ভেসে বেড়ায়
এখানে সূর্যকে ঘিরে থাকে মেঘের কুটিল চোখ
এখানে জোৎস্নাকে ধাওয়া করে অমাবস্যা-রাত্রি
এখন এখানে দিনের আলো নেই
কেবলি সাঁঝবেলা আলো-আঁধারির খেলা
আমাদের ভালোবাসা তবু জীবনের দিকে
আমাদের অভিসার তবু আলোর দিকে
তোমাকে নিয়ে কোথায় পালাবো মৃত্তিকা
যত কৃষ্ণ হোক এ তো আমার দেশ
আমারই মা মাতৃভূমি!

শ্রমের উপাখ্যান

নির্ঝর চৌধুরী,
ফলিত পরিসংখ্যান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এই তো মাত্র দুটি হাত। হাতুড়ি নয়তো
বর্ধিত হস্তের আলিঙনে মমতার গন্ধ ছিল হয়তো ;
ছিল ভালোবাসার প্রসারিত আহ্বান
কিংবা প্রণয়সিক্ত আদরের আশ্বাস অনির্বাণ,
এই তো দুটি হাত, বিটপীর আশ্রয়ই তো ।

মরণ তো সেই ক্ষুধা। ক্ষুধা জীবিকার --
চিরচেনা দুটি হাত তুলে নেয় কোদাল,
কাস্তে,হাতুড়ি,স্কুলের ঘন্টা,রিকশার হ্যান্ডেল ;
মোটা মোটা বস্তার ওজন, করা যায় না প্রতিকার ।

মমতাময়ী মা প্রমাদ গুণে ।
রূপকথার গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো হয় না কোলের শিশু মানিক কে,
সকাল না হতেই যেতে হবে কলে, গার্মেন্টসে কিংবা রেলে --
কাঁধে বাঁধা মানিক পৈশাচিক জীবন যন্ত্রণা শুনে ।
হাজার খাটুনি ঘামে নেয়েও ঘরে এসে চুলোর গোড়ায়,
উনুনের চাল ফোটা আগুন অন্তরে জ্বালা ধরায়
লেখা হয়না দুঃসাহসিক জীবন সংগ্রামের গল্প
শুধু ক্ষুধায় ক্ষুধা বাড়ায় ।

আরেক ক্ষুধা ওপর তলাদের । সেটা মানুষকে যন্ত্র বানানোর
শরীর চিমসে শুষে নেয় শেষ ঘর্মবিন্দুটুকুও,
মহাজন মহান ভূমিকায় রূপ নেয় দো-পেয়ে দৈত্য'র ।

সারা অঙ্গে প্রমাণ সাইজের জোঁক নিয়ে বেলা শেষে
ঘামসিক্ত হাত বাড়িয়ে দেয় মজুরির আশে ।
সেখানেও হিসাব সময়ের । ঘন্টার,মিনিটের,সেকেন্ডের ;
শোক,ক্রোধ,গ্লানি,আর্তনাদ আর ক্ষোভ প্রতিভাত হয় --
শরীরে ঘাম জুড়ায় না নিমেষে ।।

তলপেট পৃষ্ঠদেশে এসে জোড়া লাগে । দেওয়ালে ঠেকে পিঠ
তাই শিকাগোর 'হে মার্কেট'-এ অনেকগুলো হাত মুষ্টিবদ্ধ হয় ।
অন্যায্য নয় সেই প্রতিবাদ । শুধু আট ঘন্টা কাজের দাবী ,
তবু প্রসারিত অকুতোভয় বুকের এত রক্তক্ষয়,
বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধ তাজা ঘামের গন্ধকে প্রশমিত করে
হাতে বন্দুক থাকলে রক্তের প্রয়োজন হয় ।।

পুঁজিবাদী সমাজের লোলুপ দৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই ওদের,
সবখানে ওদের ঘামের, রক্তের দুর্বিসহ গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে
এই অস্বস্তি পরাজয়ের,বেদনার আর ক্ষোভের ।

কেন কোমলমতি শিশুরা বই রেখে ওয়ার্কশপ,ট্যানারি কিংবা মিলে ?
সমাজ, অর্থনীতি এক একটি ক্ষুধার্ত হায়না যেন ।
এই তো দুটি হাত। সাক্ষী শ্রমের,মমতার, প্রতিবাদের,অত্যাচারের ;
অদৃশ্য হাতকড়ায় এই জর্জরিত হাতগুলো বন্দী,
অনেকদিনের চাপা আর্তনাদ মুক্তির ফরিয়াদ করে
সুতীব্র চিৎকারে ---
ওরা হতে চায়না নিষ্ঠুর পৃথিবীর প্রতিদ্বন্দ্বী ।।

**"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"**

মে দিবসের চেতনা

মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান
সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আবার বছর ঘুরে এলো
মহান মে দিবস-উচ্ছ্বাস ।
প্রতিপাদ্যে সীমিত থাকবে না
বর্তমান সরকার দিয়েছে-আশ্বাস ।
দেশে থাকবে না কোন
শ্রমিক মালিক বিরোধ-দ্বন্দ্ব।
প্রতিটি কর্ম পরিবেশে
ফিরে আসবে গতিময়-ছন্দ।
চাই না তাজরীন , চাই না রানা
প্লাজা ধ্বস-অদৃষ্ট।
প্রতিটি কারখানায় ঘুরবে চাকা
থাকবে না শ্রমিকের-কষ্ট।
শ্রমিক মালিক সরকার
ত্রি-পক্ষীয়-প্রচেষ্টায়।
প্রতিটি কর্মসেক্টর হবে
শ্রম বান্ধব-আন্তরিকতায়।
চাই, শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতি
নিশ্চিত, এগিয়ে যাবে দেশের-অর্থনীতি।

শ্রমিক আমার গর্ব

এস. এস. আশরাফুল আহমেদ

আমি গর্ব বোধ করি
কারণ আমি একজন শ্রমিক।
আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান
কারণ আমি শ্রমজীবী হতে পেরেছি।
আমি সু প্রতিষ্ঠিত
কারণ আমি উৎপাদনের হাতিয়ার ।
আমি সভ্যতার রূপকার
কারণ আমি উৎপাদনের চালিকা শক্তি।
আমি ঐক্যবদ্ধ হই
কারণ আমি পরিচিত দুনিয়া জোড়া
আমি নতুন আমি সৃষ্টি
কারণ আমি পুরাতন ভেঙ্গে নতুন গড়ি।

জাগো দেশ জাগো জাতি

উম্মে আছমা
সহ অধ্যক্ষ, সানফ্লাওয়ার স্কুল, খালিশপুর, খুলনা।

চারিদিকে অগ্নিদগ্ধদের আর্তনাদ
নিরপরাধ মানুষের বাঁচার আকুতি
সকাল সন্ধ্যা রাতে ফুটছে ককটেল
ফুটছে বোমা, ফুটছে গ্রেনেড, উড়ছে ধোয়া
পথে ঘাটে বাহনে আতঙ্কিত সবাই
ট্রেনে, বাসে পড়ছে পেট্রোল বোমা
মুহূর্তেই প্রজ্জ্বলিত টার্গেট স্থান
জীবন দ্বগ্ধ হচ্ছে অসহায় মানুষ
খালি হয়ে যাচ্ছে মায়ের বুক
ভরে যাচ্ছে কিনিক হাসপাতাল
হিমসিম খাচ্ছে ডাক্তার নার্স ওয়ার্ড বয়
আহতদের চিৎকারে কাঁদছে, বার্ণ ইউনিট
বাতাস ভারি হচ্ছে স্বজনদের ক্রন্দনে.....
ওরা সন্তান হারিয়েছে
ওরা স্বামীকে হারিয়েছে
ওরা বাবাকে হারিয়েছে
ওরা মাকে হারিয়েছে
ওদের আহাজারিতে স্তব্ধ পরিবেশ
আর কত লাশ চাই ওদের?
হিংস্র পাষন্ডদের আক্রমণে বিপর্যস্ত জীবন
সারাদেশে চলছে পেট্রোল বোমার বহ্নউৎসব
রাজনৈতিক দুর্বৃত্তের ছোড়া পেট্রোল বোমায়
জ্বলছে দেশ, জ্বলছে জাতি, জ্বলছে প্রাণ
পুড়ছে হৃদয়
পুড়ছে সংসার
পুড়ছে স্বপ্ন

পুড়ছে ভবিষ্যৎ ...
পুড়ছে অবলম্বন...
জীবিকার সন্ধানে ছুটে আসা মানুষগুলো
মুহূর্তেই হয়ে পড়ছে অগ্নিদগ্ধ
নিমিষেই হচ্ছে অঙ্গার, হচ্ছে ছাই
ছড়িয়ে পড়ছে পোড়া মানুষের আর্তনাদ
বাতাস ভারী হচ্ছে চামড়াপোড়া গন্ধে।
কি দোষ করেছিল শিশু রিফাত ?
দি দোষ করেছিল স্বামী হারিস ?
কি দোষ করেছিল পিতা শরীফ ?
কি দোষ করেছিল নীরিহ জনতা ?
কি দোষ করেছিল শত শত মানুষ?
কেন এদেরকে পোড়ানো হলো?
কেন এদেরকে অগ্নিদগ্ধ করা হলো?
কেন এদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো?
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
স্বস্তি নেই কারও মনে
অপশক্তি ভর করেছে সর্বত্র
জীবন নিয়ে খেলছে পাষন্ডের দল
ওরা মতা চায়
ওরা মসনদ চায়
ওরা সাধারণকে নিয়ে খেলতে চায়
এরা মানবতার শত্রু
এরা জনগণের শত্রু
এরা দেমের শত্রু
প্রশ্রয় দেবেন না এদের
গর্জে উঠুন সবাই
প্রতিবাদ করুণ ঘৃণিত কাজের
প্রতিরোধ করুণ এদেরকে
জাগো জাতি জাগো
জাগো দেশ জাগো।

"শ্রমজীবী শিশু"

তানিয়া ইয়াসমিন

শিশুরা মোদের পরিকল্পিত এক
অপূর্ব আলপনা,
যখন তখন ওদের কোন অমানুষিক
নির্যাতন আমরা মানবোনা।
দারিদ্রতার অসীম সুযোগ নিয়ে
শিশুকে আত্মঘাতী বলি হতে দেব না
জীবিকার সন্ধানে অপরিণতে বয়সে-
ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশ নেয় শিশু,
নিরক্ষর ও দরিদ্র মাতা-পিতা,
বোঝেনা তো কিছু।
অশিক্ষিত লোকের বুলি টাকা-পয়সা নেই,
গরীবের লেখা-পড়ার দরকারও নেই।
উক্ত কথাটি যাও ভুলে,
গরীবের বন্ধু বর্তমান সরকার ডিগ্রি পর্যন্ত,
পড়া-লেখার ভার নিয়েছে কাধেঁ তুলে।
নিম্নতম বয়স আঠার এর নিচে,
শ্রমিক হিসেবে চাকুরীতে এসে
জীবনটা হয় মিছে।
শূন্য থেকে আঠার এর নিচে সবাই শিশু
সে কারণে কাজে অপারগতা এবং
পুরোপুরি কর্ম সর্ম্পকে বোঝেনা সে কিছু।
ভবিষ্যতের সোনালী সোপান গড়তে হলে,
বাবা-মাকে প্রতি ক্ষেত্রে, ধরতে হবে জীবন বাজি
শিশুশ্রম বন্ধ করতে আমরা সবাই রাজি,
সবে মিলে করি পণ
সকল শিশু লেখা-পড়া করে
হবে সাতরাজার ধন।
ভালভাবে কর্মদক্ষতা অর্জন করতে হলে
স্ব-শিক্ষায় সুশিক্ষিত হও
শিশুশ্রম ছেড়ে দিয়ে সরকারি খরচে
লেখা-পড়ায় মেতে রও।
পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে সরকার,
পড়া-লেখার খরচ নিয়ে ভাবনা নেই আর।

অসহায় শ্রমিক

নাফিজ ফাতেমা মিমিয়া

কোথায় গেলে পাই সুখ
যে দিকে তাকাই দু'চোখে ভাসে শুধু
অসহায় শ্রমিকের মুখ।
কত না কষ্ট–বেদনা সহ্য করে তারা
দু'বেলা মেটায় অন্ন,
সমাজের উচ্চাভিলাষী লোকেরা কি পারেনা
সাহায্যের হাত বাড়াতে ঐ শ্রমিকদের জন্য ?
তাদের জন্য কি নেই
সুবিধা ভোগের অধিকার,
এভাবেই কি বঞ্চিত করবে তাদের
সুবিধা ভোগীদের দরবার।
সবাই মিলে আমরা যদি হই
একটু সচেতন,
ঐ অসহায় শ্রমিকরাও যে পারবে করতে
সুন্দর জীবন যাপন।

"শ্রমিক–মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

যৌথ দরকষাকষি

ড. মোহাম্মদ আলী খান
অতিরিক্ত সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

যিশু খ্রিস্টের জন্ম সময়কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এক. খ্রিস্টপূর্ব, দুই. খ্রিস্টাব্দ। শিল্প বিপ্লব তেমনি মানব সভ্যতাকে দু'টি ভাগে বিভাজন করিয়েছে। শিল্প বিপ্লব-পূর্ব এক ধরণের সমাজ আর শিল্প বিপ্লব-উত্তর আর একধরণের জীবনপ্রণালী। শিল্প বিপ্লবের ফলে শক্তি, যন্ত্র, মূলধন, উৎপাদনের বিপুল আয়োজনে এসেছে দু'টি নতুন শ্রেণি--শ্রমিক ও মালিক। এসেছে নতুন দু'টি শব্দগুচ্ছ-শিল্প সম্পর্ক (Industrial Relations)। চার ধরণের সম্পর্কের নির্যাস শিল্প সম্পর্ককে ঘিরে। আছে শ্রমিকের সাথে মেশিনের সম্পর্ক, শ্রমিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক, মালিকের সাথে মালিকের সম্পর্ক এবং শ্রমিকের সাথে মালিকের সম্পর্ক। এই শিল্প সম্পর্কের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক হলো বহুল আলোচিত যৌথ দরকষাকষি (Collective Bargaining)।

যৌথ দরকাষাকষি হলো শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে আলোচনা বা বিতর্ক যা একটি চুক্তিতে পৌঁছে দেয় বা

উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে ব্যহত করছে, এমন যে কোন বিরোধের সমাধান এনে দেয়। এটি একদিনের অর্জন নয়, দীর্ঘ সংগ্রামের ফল। বহুদিনের আগের কথা নয় যখন মালিকপক্ষ ছিল একচেটিয়া, শ্রমিকদের কথা বলার সুযোগ ছিল না, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিল ঘাম ঝরানো শ্রমঘণ্টা। শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারের শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের রক্তক্ষরণ (১৮৮৬), আইএলও'র জন্ম (১৯১৯), ফিলাডেলফিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণা (১৯৪৪): শ্রম পণ্য নয় (Labour is not a commodity) সুদীর্ঘকালের শ্রম আন্দোলনের ফসল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যত বিকাশ ঘটেছে, যৌথ দরকষাকষি ততই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরি হয়েছে।

যৌথ দরকষাকষির জন্মভূমি এবং বিকাশ যুক্তরাজ্যে। সময়টা ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ। সেখান থেকে প্রসার ঘটে ইউরোপ ও আমেরিকায়। এখন এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় যৌথ দরকষাকষির প্রয়োগ সর্বজনবিদিত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও যৌথ দরকষাকষি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতীয় উপমহাদেশে আহমেদাবাদের একটি বস্ত্র কারখানায় সর্বপ্রথম যৌথ দরকষাকষির পরিচয় পাওয়া যায়, সময় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ। সিডনি ওয়েব (Sidney Web) এবং বিয়াট্রিস ওয়েব (Beatrice Web), Collective Bargaining শব্দ দু'টি ব্যবহার করে সাড়া জাগান। আই.এল.ও'র ওয়ার্কাস ম্যানুয়াল অনুযায়ী যৌথ দরকষাকষি হল একপক্ষে মালিক বা মালিকগণ কিংবা এক বা একাধিক মালিকের সংগঠন এবং অন্যপক্ষে শ্রমিকদের সংগঠনের এক বা একাধিক প্রতিনিধির মাঝে, কাজের পরিবেশ ও নিয়োগের শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করা, যাতে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া যায়। Bradley R. Schiller – এর বিশ্লেষণ যথার্থ ঃ Collective Bargaining begins with a set of union demands and management offers. The outcome depends on the relative strength and tactics of the two parties। যৌথ দরকষাকষি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, একই সাথে জটিল প্রক্রিয়া। এটি একটি কলা, মানবীয় সম্পর্কের অগ্রগতির ফসল। কী রাজনীতি, কী মনোবিজ্ঞান, কী ক্ষমতা সব জায়গায় আছে যৌথ দরকষাকষি। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের কোন প্রবেশাধিকার নেই। যৌথ দরকষাকষি একান্তই দ্বিপাক্ষিক বিষয়, আলোচনা বা দরকষাকষি মালিক ও শ্রমিকের মাঝে। এর সফল সমাপ্তি হবে চুক্তির মাধ্যমে। আর এর সাফল্যগাঁথার নিয়ামক সেই চুক্তির বাস্তবায়ন।
যেখানে শিল্প আছে, শ্রম আছে, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক আছে, সেখানে বিরোধ থাকবেই। Matter of Right বা

দরকষাকষি। হতে পারে তা distributive bargaining কিংবা cooperative বা productivity অথবা composite। তিনটি পর্যায়ে তা ঘনীভূত হতে পারে ঃ প্লান্ট লেবেল কিংবা ইন্ডাষ্ট্রি লেবেল অথবা জাতীয় পর্যায়ে। হতে পারে তা একটি কোম্পানি ও একটি ইউনিয়নের মাঝে। কিন্তু সবসময় তার পরিচয় মেলে না। একাধিক কোম্পানি ও একটি ইউনিয়নের সাথে বা একাধিক ইউনিয়ন ও একটি কোম্পানির সাথে অথবা বহু কোম্পানি ও বহু ইউনিয়নের সাথে যৌথ দরকষাকষি হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ নিশ্চয়ই Negotiation, কিন্তু তার পূর্বে ও পরে আরো ধাপ আছে। নেগোশিয়েশন-পূর্ব স্টেজ ও আলোচনার প্রতিনিধি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর দরকষাকষির কৌশল ও দরকষাকষির ট্যাকটিক্স এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সকল ধাপ অতিক্রম করে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গেলে কেবল একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া যায়, যার ফলে মালিক ও শ্রমিকের মাঝে বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। এই নিষ্পত্তি মানে শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তি, একই সাথে দেশে শান্তি ও আরো উৎপাদন, আরো উন্নতি, আরো সম্ভাবনা। ধর্মঘট বা লক আউট থেকে দূরে থাকা যায় সফল যৌথ দরকষাকষির অনুশীলনের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের দেশে এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গবেষণা এবং পেশাগত চর্চা ব্যাপক নয়। সীমিত আয়োজন ও উদ্যোগ, জটিল ও বহুমূখী শিল্প সম্পর্কের সহজাত বা কৃত্রিম শিল্পবিরোধকে, আয়ত্বে এনে সুস্থ শিল্প সম্পর্ক ও উর্ধগামী উৎপাদনের দিকে ধাবিত করে না।

বাংলাদেশের শ্রমের জগতে গুরুত্বপূর্ণ আইন বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬; যা বিলুপ্তি ঘটিয়েছে ২৫টি পুরাতন আইন বা অধ্যাদেশ। এ আইনের কয়েকটি সংশোধনীও এসেছে, সর্বশেষ সংশোধনী হয়েছে ২০১৩ সালে। এই আইনের ২ নং ধারায় অনেক বিষয়ের সংজ্ঞা আছে। যৌথ দরকাষাকষি (Collective Bargaining)-এর সংজ্ঞা না থাকলেও আছে CBA বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির সংজ্ঞা। সংজ্ঞায় বর্ণিত আছে [২(৫২)] : যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি অর্থ কোন প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের এমন কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন উক্ত প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে যৌথ দরকষাকষির ব্যাপারে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি। এই আইনের ২০২ নং ধারায় যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত আছে : যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান একটিমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন থাকে সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য তা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বলে গণ্য হবে (উপধারা-২)। উপধারা ১৪ (ঙ) অনুযায়ী যে ট্রেড ইউনিয়ন সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হবে, তাকে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করা হয়। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ট্রেড ইউনিয়নকে উক্তরূপ যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি ঘোষণা করা যাবে না, যদি না তার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সকল শ্রমিকের মোট সংখ্যার অনূন্য এক-তৃতীয়াংশ হয়। যৌথ দরকষাকষির মেয়াদ দুই বছর, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে তা তিন বছর। সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ হলে এই যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (CBA) নির্বাচন ও তার অনুশীলন অত্যন্ত ইতিবাচক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যেখানে দুর্বল, সেখানে বহিরাগত বা তৃতীয় দলের অনুপ্রবেশ ঘটে, এক তৃতীয়াংশের সমর্থন না পেয়েও ট্রেড ইউনিয়নের নামফলক নজর কাড়ে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর একাধিক কনভেনশন রয়েছে যৌথ দরকষাকষি সম্পর্কিত। এর ভিতর বহুল আলোচিত ও প্রশংসিত হল Right to Organize and Collective Bargaining Convention, ১৯৪৯ (No. ৯৮)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কনভেনশনসমূহ হল : Labour Relations (Public Service) Convention, ১৯৭৮ (No. 151) এবং Collective Bargaining Convention ১৯৮১ (No. 154)। বাংলাদেশ তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন-৯৮ : সংগঠন করার ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার কনভেনশন, ১৯৪৯ অনুসমর্থন করেছে।

এই কনভেনশনে মোট ১৬টি অনুচ্ছেদ রয়েছে, কনভেনশনটি কার্যকরি হবার তারিখ ১৮ জুলাই ১৯৫১। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২-এর ১৩.০০ নং ক্রমিকে বর্ণিত আছে শিল্প সম্পর্ক ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি। ১৫.০০ নং ক্রমিকে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। ১৪.০০ নং ক্রমিকে বলা হয়েছে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও সংলাপের কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক চর্চা উৎসাহিত করা সরকারের কাম্য।

এক কবি লিখেছিলেন, কোন একদিন এই পৃথিবী একটি বিন্দুতে মিলিত হবে। কিন্তু অশান্ত পৃথিবী আরো অশান্ত হয়েছে। সকল মতবিরোধের মাঝে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শ্রমঘন কারখানায় যৌথ দরকষাকষিকে কেন্দ্র করে শান্তি ও সমৃদ্ধি কেন্দ্রিভূত হতে পারে, ঘনীভূত হতে পারে সমৃদ্ধির বলয়।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

বাংলাদেশের উন্নয়নে শ্রমিক শ্রেণীর অবদান : এবং বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

মহিউদ্দিন আহমেদ খান
উপ-সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সভ্যতার ক্রমবিকাশে এবং বিশ্বের উন্নয়নে সবচেয়ে যে শ্রেণী পেশার মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে তারা হলো "শ্রমিক"। কৃষি শ্রমিক খাদ্য উৎপাদন ও কৃষিকাজ, শিল্প শ্রমিক শিল্পায়নে, নির্মাণ শ্রমিক দালান কোঠা ও আধুনিক স্থাপত্য নির্মাণে অবদান রাখছে। শ্রমিকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটি রাষ্ট্রকে উন্নতির চরম শিখর পৌছে দিচ্ছে।

প্রাগৈতিহাসিকভাবে উৎপাদন প্রণালীতে শ্রমিকে মালিক সম্পর্ক একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। সভ্যতার প্রাথমিক যুগে সমাজের সমস্ত শ্রেণী শ্রমিকের "শ্রমদাস" হিসেবে ব্যবহার করে উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রেখেছিল। এ ব্যবস্থায় শ্রমদাসদের প্রতি তাদের মালিক শ্রেণী চরম নিষ্ঠুর আচর করতো। শ্রমদাসদের কোন মানবিক অধিকার ছিল না।

সামন্ত প্রথা বিলোপের পর সূচনা হয় বৃটিশ শাসন এবং জমিদারী প্রথার। তৎকালীন পূর্ব বাংলায় বৃটিশদের উপনিবেসিক শাসন আমলে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে জমিদার এবং বণিক শ্রেণীর সৃষ্টি করে। বৃটিশ শাসকরা নীল চাষের জন্য এদেশী শ্রমিকদের উপর নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণ করে। জমিদার এবং বণিক শ্রেনীও শ্রমিদের স্বার্থ উপেক্ষা করে তাদের "শ্রমদাস" হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে ফলশ্রুতিতে, পূর্ব বাংলা পরিণত হয় একটি পশ্চাদপদ অনগ্রসর এলাকায়।

১৭ শতকে বৃটেনে কৃষি বিপ্লব এবং ১৮ শতকে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক তৈরীর চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। কিন্তু শ্রমিক শোষণ বন্ধ হয়নি। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্রও চলতে থাকে অবাধে আফ্রিকা অঞ্চল থেকে শ্রমদাস আমদানি। হাঁস-মুরগীর মতো গাদাগাদি করে পালতোলা নৌযানে সমুদ্রপথে ইউরোপ ও আমেরিকায়, আফ্রিকা হতে কালো মানুষদের শ্রমদাস হিসেবে মানব পাচার শুরু হয়। বহু মানুষ নৌযান সমুদ্রপাড়ি দেয়ার সময় মৃত্যুবরণ করে। জীবিত মানুষদের বাধ্যতামূলক শ্রমদাস হিসেবে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে ব্যবহার করে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে। আজকের আধুনিক ইউরোপ আমেরিকার উন্নয়ন ও পুঁজির বিকাশ ঘটেছে আফ্রিকা হতে জোরপূর্বক নিয়ে আসা "শ্রমদাসদের" শ্রম ও ঘামে। ইউরোপ আমেরিকায় শ্রমিক শোষণের মাধ্যমে সৃষ্ট চরম আগ্রাসী পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর বিরুদ্ধে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন ৮ ঘণ্টা কাজ, ন্যায্য মজুরী ও নিরাপত্তার দাবীতে আন্দোলন শুরু করলে পুলিশের গুলিতে শিকাগো শহরে একটি কোম্পানীর ৬ জন শ্রমিক নিহত ও অসংখ্য শ্রমিক আহত হন। তাদের স্মরণে মহান মে দিবসে সূচনা হয়েছে সারা পৃথিবীতে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রমিক অধিকার। ১৮৮৬ সালের মে মাসে আমেরিকার শিকাগোতে যে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সূচিত হয় তারই ধারাবাহিকতায়, ১৮৬২ সালের মে মাসে তৎকালীন বঙ্গ দেশের হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে ১২০০ শ্রমিক ধর্মঘট ডেকে তাদের দাবী আদায় করেছিল বৃটিশ শাসকদের কাছ থেকে।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের অবসান হলেও পরবর্তী ২৪ বছর ধরে এ দেশে শ্রমিক শোষণ চলতে থাকে তৎকালীন নব্য পুঁজিপতি ধনিক বণিক ও শাসক শ্রেণী এবং কোটিপতি ২২ পারিবারের নেতৃতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চনা হতে মুক্তি করে এদেশের মেহনতী মানুষের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক "ছয় দফা" ঘোষণা করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে তিনি শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শিল্প কলকারখানা জাতীয়করণ করেন। রাষ্ট্রীয় চার মূল নীতিতে "সমাজতন্ত্র"র ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করেন। সর্বগ্রাসী পুঁজির থাবা থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের ধারণার সমন্বয়ে ঘটিয়ে একটি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতের বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক মালিকের মধ্যে একটি ভারসাম্য পূর্ণ ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করে সুষম অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলে শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে। শ্রমিকের কল্যাণ সাধনে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধি, অপচয় রোধ, সেবা উৎপাদনের গুনগতমান বৃদ্ধি, সরকারী ও বেসরকারী খাতে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন করে, শ্রমিক বান্ধব শ্রম ও শিল্পনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে।

১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১লা মে সরকারী ছুটি ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে মে দিবস পালন শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু তার দূরদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। বাংলাদশের শ্রমজীবি মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ারয় সম্পৃক্ত করতে প্রচলন করেন অবাধ শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থ (আইএলও) এর তৎকালীন সকল কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছিলেন।

বাংলাদেশে শ্রম আইনে শ্রমিক কল্যাণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতে সুস্থ প্রতিযোগিতার, শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে সরকার, শ্রমিক ও মালিক ও ত্রিপক্ষীয়তা, উৎপাদনশীলতা ও উৎসাহ, মজুরী, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, শিল্প সম্পর্ক, ট্রেড ইউনয়ন গঠন, শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতায় অংশগ্রহন শ্রমিকের প্রতি মালিকের অন্যায় আচরণ বন্ধ, কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক সংগঠন, সিবিএ প্রতিনিধির নেতৃত্বে, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী, শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা, ফলপ্রসূ কর্ম সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের বিষয়ে সচেতনতাবৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বহু যুগান্তকারী পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার সুফল বাংলাদেশের মেহনতী শ্রমিক শ্রেণী আজ ভোগ করছে।

শ্রমিকের কল্যাণে বর্তমান শ্রম বান্ধব সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য রূপকল্প - ২০২১ ঘোষনা করেছে। তিনি মেহনতী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে ন্যায়সংগত মজুরী নির্ধারণ, পেশাগত স্বাস্থ্য সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ নিরাপদ ও উন্নত কর্মপরিবেশ রক্ষা, শ্রমিকের চাকুরীর বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীতকরণ, কর্মজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে বৃদ্ধি, হোস্টেল নির্মাণ, মাতৃত্ব ভাতা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, শিশু শ্রম নিরসনে জাতীয় শিশু শ্রম নীতি ২০১০ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণে যুগোপযোগী আইন, বাংলাদেশ শ্রম আই ২০০৬ কে ২০১৩ সালে সংশোধন করেছে। এছাড়াও অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে দক্ষ শ্রম শক্তি ও মানব সম্পদ সৃজনের লক্ষ্যে Natioanal Skills Development Council গঠন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি অগণিত মানুষের অফুরন্ত শ্রম। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশ স্বাধীনের পর রাষ্ট্রীয়খাতকে বেসকারী খাতের পাশাপাশি শক্তিশালী করার জন্য তৎকালীন সরকার রাষ্ট্রীয় খাতে অনেক কলকারখানা, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করেন। বর্তমান শ্রম বান্ধব সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে স্বীয়দর্শন বাস্তবায়নের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তরে কার্যক্রমে আরো গতিশীল করেছে।

মে দিবসের আহ্বান ও শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ সম্পাদক,
জাতীয় শ্রমিক লীগ।

চলমান বিশ্বে মে দিবসের আহ্বান আর শ্রমিক শ্রেণীর জীবন-মান উন্নয়নের গতিধারা একই সূত্রে গাঁথা। কারণ মে দিবস শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৮৮৬ সালে এ দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য আর দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে যে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেখানে পুলিশের নির্বিচার গুলিতে প্রাণহানি ঘটে, হতাহত হয় অনেকে। ফলে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকরা তাদের দাবি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হলেন। সময়ের ব্যবধানে দিনটি সারা বিশ্বের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের স্বর্ণজ্জ্বল দিন হিসেবে পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে সরকারী-বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন বঞ্চিত মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। তিনি বলতেন, 'বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত' একদিকে শোষক, অপরদিকে শোষিত-আমি শোষিতের পক্ষে'। আর তার প্রমানও তিনি রেখেছেন। তার প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশে মে দিবসকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে, যা পাকিস্তান আমলে ছিল না। ৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সূর্য উঠল আর ১৯৭২ সালের ২২ জুন বাংলাদেশ আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-র সদস্য পদ লাভ করলো। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে (আইএলও) এর মৌলিক ৭ টি কনভেনশন সহ ৩৩ টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। ১৯৭৩ সালে আইএলও ঢাকা অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু এ বছরই শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম মজুরী ও বেতন কমিশন গঠন করে মজুরী ও পে-স্কেল বাস্তবায়ন করেন। ইতিহাসের নির্মম গতিধারা আর শ্রমিক-কর্মচারী শোষণের মানসিকতায় বাংলাদেশের শ্রমিকরা বার বার আশাহত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর শ্রমিক-কর্মচারী প্রীতি পরবর্তী সরকার গুলোর মাঝে তেমন প্রতিভাত হয়নি। নিয়মের বেড়াজালে মজুরী ও পে কমিশন ঘোষিত হলেও সেখানে শ্রমিকদের চাইতে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে বেশি। হতভাগ্য শ্রমিক শ্রেণী যে দিকে তাকায় সাগর শুকিয়ে যাওয়ার মতোই বার বার তারা ন্যায্য মূল্য পেতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে ১৯৯৬ সালে সব ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে। বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের হাল ধরেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাবার মতোই শ্রমিকবান্ধব হয়ে ওঠেন। গঠন করেন মজুরী ও পে-কমিশন। যা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা গেল অন্যান্য সরকার প্রদত্ত মজুরী ও পে-স্কেল থেকে তা উন্নত। আর অবিস্মরণীয় ঘটনা হলো ১১টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো শ্রমিক-কর্মচারীদের। অথচ বাস্তবতা ছিল বিগত সরকার গুলো শ্রমিক শ্রেণীর চাকুরীর নিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধার দিকে তাকায়নি। তারা রাষ্ট্রীয় কলকারখানা বেসরকারিকরণ করে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীকে নাম মাত্র মূল্যে তুলে দিয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়েছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা আবার ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেই নতুন পে-কমিশন গঠন করেন এবং ২০০৯ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর করেন। তাছাড়া শ্রমিকদের চাকুরীর বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছর, মুক্তিযোদ্ধা শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছর করে তাদের ভাতা বৃদ্ধি করেছেন এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরীর বয়স ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে উন্নীত করা হয়। বৃদ্ধি করা হয় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন গঠন করে বাজারদরের সাথে সংগতি রেখে প্রায় দ্বিগুন মজুরী নির্ধারণ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী বোর্ড গঠন এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে দুই তিনগুন ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

শ্রমজীবী মানুষ তাদের স্বপ্নের পথে হাটতে গিয়ে বার বার হোচট খেয়েছে। পতিত হয়েছে নানা দূর্ঘটনায়। জীবন সংহারী ঘটনা ঘটেছে অপ্রত্যাশিতভাবে। বিএনপি -জামাত চক্রের অকার্যকরী অবরোধ-হরতালে ত্রাস-আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পেট্রোল বোমার আঘাতে পরিবহন শ্রমিকরা বার বার আক্রান্ত হচ্ছে। গাড়ির মাঝে ঘুমিয়ে স্বপ্নেও যা ভাবেনি, বাস্তবে তা ঘটছে আগুনে পুঁড়ে। দেশের বার্ন ইউনিটগুলো আজ কান্না আর আহাজারীর জীবন-মৃত্যুর দোলাচলের মহাযুদ্ধ। যা দেখে কেউ স্বাভাবিক থাকতে পারেন না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কেঁদেছেন। ঘোষণা করেছেন পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ কারীকে ধরিয়ে দিলেই পুরস্কার। আর এর বিচার করা হবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারকে দিয়েছেন বিশেষ আর্থিক সাহায্য। এর আগে রানা প্লাজা, স্মার্ট ফ্যাশন, তাজরীন ফ্যাশনে ভয়াবহ দূর্ঘটনার পরও তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে জনগণের সহযোগিতায় উদ্ধার কাজ শেষ করেন। সবগুলো প্রতিষ্ঠানেরই মৃত্যু ব্যক্তিদের পরিবারের হাতে তুলেদেন আর্থিক সাহায্য। আহতদেরও সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। দূর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামীতে যাতে এ জাতীয় দূর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য সবাইকে তৎপর হতে বলেছেন। তিনি গার্মেন্টস্ শ্রমিক ও মালিকদের সাথে আলোচনা করে ন্যূনতম মজুরী ৫,৩০০/- টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার কর্তৃক নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঘোষিত তার নির্বাচনী ইশতেহার ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম। দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্যে তার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে এবং বর্তমানে তা অব্যাহত রয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে অল্প সময়ে দারিদ্রবিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম আইন যুগ-উপযোগিকরণ, জাতীয় শ্রমনীতি পূনঃমূল্যায়ন, ন্যূনতম মজুরী পুনঃনির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে অধিক সমন্বয় ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের কর্মকৌশলে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়। বিষধ আলোচনায় না গিয়ে আমরা লক্ষ করি জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিক বান্ধব কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করেছেন। বাড়িয়েছেন শ্রমিকদের অবসরের বয়সসীমা। সংশোধন করেছেন চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন। প্রণয়ন করেছেন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬, জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২, শিশু শ্রমনীতি ২০১০, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১২, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১, ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারী সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২, শিশুদের জন্য ঝুকিপূর্ণ কাজের তালিকা, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি এবং শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতি মালা। তাছাড়াও শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করেছেন। শুধু ন্যূনতম মজুরী নির্ধারনই নয়-দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নেও জোর দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি) সচিবালয় গঠন করেছেন। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনায় স্থাপিত হয়েছে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই) ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। উদ্যোগ নিয়েছেন নারী শ্রমিকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমের। এখানেই শেষ নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিশু শ্রমিক ইউনিট, যানজট নিরসন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গৃহীত কার্যক্রম, গার্মেন্টস্ শিল্প বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি, ক্রাইসিস ম্যানেজম্যান্ট কোর কমিটি, আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছেন। এছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। এতভালো উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের জন্য শুধুমাত্র সরকার আন্তরিক হলেই চলবে না, এগিয়ে আসতে হবে শিল্প কারখানার মালিকদেরও। কারণ শ্রমিক-মালিক একে অপরের পরিপূরক। এ দু'য়ের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক না থাকলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি শ্রমিক। বিএনপি-জামাতের অকার্যকর অবরোধ হরতালের মাঝে শ্রমিকরা কাজ করে অর্থনীতির যে প্রভূত উন্নয়ন করেছেন-তা সত্যিই বিস্ময়কর। সংগত কারণে বলা যায়, সরকারের শ্রমবান্ধব শিল্পনীতি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অভিযাত্রাকে সুনিশ্চিত করে তুলবে। গড়ে উঠবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। এই হোক মে দিবসের অঙ্গীকার।

মুক্তির সংগ্রাম এবং মহান মে দিবস

- আবদুল মতিন মাষ্টার
সাবেক সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি,
সদস্য, শ্রম আদালত -১, ঢাকা
উপদেষ্টা- BILS :

মুক্তির সাথে মে দিবসের সম্পর্কটা নিঃসন্দেহে গভীর, যেমন স্বাধীনতার সাথে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে মুক্তি। তাই মে দিবসের কথা মনে এলেই বাঙ্গালীর অবিসংবাদিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় ৭ই মার্চের সেই সুমহান পংক্তীমালা – 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা, কিন্তু মুক্তির সেই স্বপ্ন আজো অধরা রয়ে গেল । ঘাতকের গুলিতে ঝাঝরা হয়ে যাওয়া পিতার মৃতদেহ নয়, যেন সেই সাথে বিবর্ণ হয়ে গেল মুক্তির আকাংখা। তাই স্বাধীনতা চার দশক পার হলেও অসহায়, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত বাংগালীর মুক্তি আজো আসেনি, আজো থামেনি শ্রমিকের ঘাম নিংড়ানো শ্রমের কান্না। দেশ স্বাধীন হবার প্রথম বছরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ মে' কে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। পাকিস্তানী জান্তা মে দিবসের ছুটিকে আমলে নেয়নি। বাংলাদেশ ২২ শে জুন ১৯৭২ সালে International Labour Organisation (ILO) র সক্রিয় সদস্য পদ লাভ করে। সে সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে ILO 'র মৌলিক সাতটি কনভেনশনসহ মোট ৩৩ টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। ১৯৭৩ সালের ২৫ জুন ILO তার ঢাকা অফিসের কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ মোট ৩৫ টি ILO Recommendation অনুসমর্থন করেছে। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে কোন প্রকার দাবিনামা পেশ করার পূর্বেই শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মজুরি কমিশন ও বেতন কমিশন গঠন করে তাদের মজুরি ও বেতনভাতাদি পরিশোধ করে। দ্বিতীয় মেয়াদে বর্তমান মহাজোট সরকারের ক্ষমতায় আরোহন, সেই সাথে প্রথম মেয়াদে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং শ্রম আইন ও শ্রম বিধান প্রণয়ন ও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে এ বছরের মে দিবসটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের নিপীড়িত শ্রমিক-জনতার জন্য একটি শুভ বার্তা বহন করছে।

'মে-ডে' হিসেবে খ্যাত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস মূলতঃ শ্রমিক আন্দোলনের সাথে বিশ্ব মানবতার সংহতি প্রকাশ। পৃথিবীর প্রায় ৮০ টিরও বেশী দেশে ১ মে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় ছুটি হিসেবে পালিত হচ্ছে । মে দিবস ঐতিহাসিকভাবে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে সংঘটিত হে-মার্কেট ঘটনার স্মরণে উদযাপিত হয়ে আসছে। হে-মার্কেট ঘটনাটি বিশেষ একদিনের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি প্রায় সুদীর্ঘ উনিশ শতাব্দী ধরে ঘটে আসা শ্রমিক আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশ। যেমনটি ৭১-এ ঘটেছিল দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে বীর বাঙালীর দীর্ঘ সংগ্রামের সর্বব্যাপী অধ্যায়। হে-মার্কেট আন্দোলনও একইরকম উনিশ শতকের নিপীড়িত-নির্যাতিত, শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর দাবি আদায়ের গৌরবপূর্ণ অধ্যায়।

১৮২৭ সালে পৃথিবীর প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে খ্যাত Mechanics' Union of Philadelphia ১৪ ঘন্টার পরিবর্তে ১০ ঘন্টার কর্ম দিবসের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৮৩৪ সালে নিউইয়র্কের বেকারি শ্রমিকদের এক ধর্মঘট সম্বন্ধে Workingmen's Advocate Report থেকে জানা যায়, "journeymen employed in the loaf bread business have for years been suffering worse than Egyptian bondage. They have had to labor on an average of eighteen to twenty

hours out of the twenty-four." ১৮৩৭ সালে ১০ ঘন্টার কর্ম দিবস একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। তারপর ১৮৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকরা "8 hours work, 8 hours recreation and 8 hours rest"- এই দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে বিশ্বব্যাপী ৮ ঘন্টা কাজের দাবিটি সোচ্চার হয়ে উঠে।

১৮৮৬ সালে ৩০ এপ্রিল রোববার তৎকালীন আমেরিকান কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন পঁচিশ হাজারেরও বেশী শ্রমিকের এক শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। তাদের অগ্রগণ্য দাবি ছিল ৮ ঘন্টার কর্ম দিবস। পাশাপশি উপযুক্ত কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা এবং মর্যাদাপূর্ণ ন্যায্য মজুরি। দাবি আদায়ের জন্য পরদিন ১ মে ১৮৮৬ তে শিকাগোর শ্রমিক শ্রেণী কর্ম বিরতি পালন করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে অভূতপূর্ব উদাহরণ তৈরী করে, যা পরবর্তী দিনগুলোতে শ্রমিক আন্দোলনে গভীর রেখাপাত করে।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মে'-র ৩ তারিখ বুধবার শিকাগোর মেক' কমিক রিপার কোম্পানিতে দাবি আদায়রত শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালালে ছয়জন শ্রমিক মারা যায়, আহত হয় অগণিত। পরদিন ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার গত দিনে সংঘটিত বর্বর ঘটনার প্রতিবাদে হে-মার্কেট স্কোয়ারে আয়োজিত এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ আবারো বর্বরোচিতভাবে হামলা চালালে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এতে পুলিশসহ সাতজন শ্রমিক নিহত হয়।আহত হয় অসংখ্য শ্রমিক। এ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়- "The police reacted by firing on the workers, killing dozens of demonstrators and several of their own officers. Initial newspaper reports made no mention of firing by civilians. Reliable witnesses testified that all the pistol flashes came from the center of the street, where the police were standing, and none from the crowd. A telegraph pole at the scene was filled with bullet holes, all coming from the direction of the police." পরবর্তী বছরগুলোতে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় আন্দোলনকারী অসংখ্য শ্রমিক। এদের মধ্য থেকে অন্তত পক্ষে পাঁচজনকে বিভিন্ন প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

১৮৯১ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২য় ইন্টারন্যাশনাল'- কংগ্রেসে মহিমান্বিত শিকাগোর এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির স্মরণে ১ মে'-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষনা করা হয়। সেই থেকে দিনটি জাতীয় ছুটিসহ নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এলে সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ILO Convention বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। মন্ত্রীসভা গঠন করার অব্যবহিতি পরই তৎকালীন মহাজোট সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে 'সরকার, শ্রমিক ও মালিক' এই তিনের সমন্বয়ে ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শক কমিটি (Tri-partite Consultant Committee) পুনর্গঠনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন সংস্কারে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে চেয়ারম্যান করে জাতীয় ১৯টি শ্রমিক ফেডারেশন থেকে ২০ জন, মালিক পক্ষ থেকে ২০ জন এবং ২০ জন সরকারি প্রতিনিধি সদস্য সমন্বয়ে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি (TCC) শ্রমিকদের স্বার্থ ও শিল্প উৎপাদনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কমিটি শ্রম আইন, শ্রমনীতি ও বিধি এবং শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাসময়ে সরকারকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া সরকার ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে চেয়ারম্যান করে শ্রমিক পক্ষের ১২ জন, মালিক পক্ষ থেকে ১২ জন এবং ১০ জন সরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট শ্রম আইন সংশোধন কমিটি গঠন করে। ২০০৬ সালের শ্রম আইনকে Amendment (সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন) করে একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন বিলটি 'সংশোধিত শ্রম আইন -২০১৩' নামে ২০১৩ সালের ১৫ জুলাই সংসদে পাশ হয়েছে। এরই

মধ্যে TCC – এর সুপারিশ অনুযায়ী ২০১২ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার মহান জাতীয় সংসদে শ্রমিক স্বার্থের অনুকূলে নতুন শ্রমনীতি পাশ করেছে এবং 'বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা-২০১৪' চূড়ান্ত করণের কাজ চলছে। সময় ও বাস্তবতা বিবর্তিত হলেও ১৯৮১ সালের পর থেকে আর কোন নতুন শ্রমনীতি ও বিধি প্রণীত হয়নি। সরকার এরই মধ্যে আহত-নিহত শ্রমিক কর্মচারীদের সহায়তার জন্য শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন' পূণর্গঠন করেছে। এ বিষয়ে সংসদে একটি আইন পাশ হয়েছে যে প্রত্যেক মালিক তার লভ্যাংশের ৫% কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অনুদান দিতে বাধ্য থাকবে। এভাবে 'শ্রমিক-মালিক-সরকার' এ তিনের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান মহাজোট সরকারের সময়কালে ২০০৯ সালের জুন মাসের ৩ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ILO - র ৯৮তম Central Council –এ বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করার সৌভাগ্য অর্জন করে। বাংলাদেশের পক্ষে তৎকালীন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি সভাপতিত্ব করেন। সভায় ILO সদস্য ১৮৩ টি দেশের শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিক প্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিনিধি (শ্রমমন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদা সম্পন্ন) ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৭টি দেশের রাষ্ট্রপতি, ৯টি দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ৫টি দেশের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। সে সময় দেশের দক্ষিণ বঙ্গে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের (আইলা) কারণে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত হতে পারেননি। তবে সভায় জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের পাশাপাশি জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি ভিডিও বক্তব্য প্রচার করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে ILO -এর সেই সভায় বাংলাদেশের পক্ষে শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। তাই সেই সভায় উপস্থিত হয়ে আমার বক্তব্য দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সভায় শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যকার ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিক ও মালিকদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র স্ব-উদ্যোগে তাঁর সরকার কোন প্রকার আন্দোলন বা দাবি-দাওয়া ব্যতিরেকে সরকারি কর্মচারিদের জন্য নতুন পে-কমিশন ঘোষণা করেছেন যা ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর রয়েছে। সেই সাথে 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠন করে সরকার জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের জন্য মজুরি নির্ধারণ করেছে যা উল্লিখিত ২০০৯ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া বিগত সরকারসমূহের আমলে জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বিভিন্ন বকেয়া পাওনাদি বর্তমান সরকার পরিশোধ করেছে। এরই মধ্যে সরকার কয়েকটি জুট মিলসহ বিভিন্ন বন্ধ শিল্প-কারখানা চালু করেছে এবং যে সমস্ত মালিক পানির দামে সরকারি এসব সম্পত্তি ক্রয় করে বন্ধ রেখেছেন, মালিকদের ব্যর্থতায় বন্ধ এসব কল-কারখানা সরকারি খাতে ফেরত এনে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। অসৎ মালিকদের হাত থেকে শিল্প-কারখানা রক্ষা করতে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। যে সমস্ত শিল্প মালিকরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে উৎপাদন বন্ধ রেখে অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে শ্রমিক-স্বার্থ নষ্ট করেছেন এবং করছেন, তাদেরকে উপযুক্ত বিচার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

সরকার ব্যক্তি মালিকানাধীন ৪২টি শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে গার্মেন্টসসহ ৩৮টি সেক্টরের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। বাকীগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো ব্যক্তি-মালিকানাধীন সেক্টর চিহ্নিত করে সেগুলোর জন্যও ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা অত্যাবশ্যক। এছাড়া বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে ন্যূনতম জাতীয় মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। পাশপাশি পাঁচ বছর পরপর পে কমিশন ও মজুরি কমিশন গঠন না করে স্থায়ী পে ও মজুরি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। উভয় কমিশন বাজার দর বিবেচনায়, প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য মজুরি ও বেতন-

ভাতাদি নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে উভয় কমিশনের সুপারিশ একই সময়ে দাখিল ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যেহেতু প্রতি ৫ বছর পর পর সরকার নতুন পে-কমিশন ও মজুরি কমিশন প্রদান করে সেহেতু ২০১৪ সালের জুলাই থেকে শ্রমিক-কর্মচারীর জন্য নতুন পে-স্কেল ও মজুরী কমিশন ঘোষণা করার দাবি রাখে। কিন্তু কিছু কু-চক্রী মহলের কারণে সরকার এই কমিশন জুলাই - ২০১৫ থেকে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাননীয় সরকার মহোদয়ের কাছে আবেদন থাকবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজার নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরী, তা না হলে এর প্রভাব সাধারণ জন-জীবনে দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

২০০৬ সালের শ্রম আইনে শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকুরির বয়স সীমা ৫৭ বছর নির্ধারিত ছিল। ১ মে ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের চাকুরির বয়সসীমা ৬০-এ উন্নীত করার ঘোষণা দেন, যা ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ বয়সসীমা ৫৯ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের পরিবার ও পোষ্যদের চাকুরির বয়সসীমা পূর্বেকার ৫৭ থেকে ৫৯ ও পরবর্তীতে আরো এক বছর বাড়িয়ে ৬০-এ উন্নীত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষতঃ এ সীমা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। এছাড়া সরকারী চাকুরিতে যোগদানের বয়স সাধারণের জন্য ৩০ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩২ রয়েছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষাসহ নানাবিধ কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী সরকারি-বেসরকারি চাকুরি কিংবা বি.সি.এস -এ অংশ গ্রহণ করতে পারছে না। এতে করে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। তাই চাকুরির বয়স সীমা ৩৩-এ উন্নীত করা এখন সময়ের দাবি। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে বলে শোনা যায় এবং এ বিষয়ে ২০১২ সালে সংসদেও আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে ০৬ লক্ষাধিক সরকারি চাকুরির পদ শূন্য রয়েছে। চাকুরির বয়স সীমা ৩৩-এ উন্নীত করার মাধ্যমে এ সকল শুন্যপদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব। আমি ২০১২ সালে মে দিবসের আলোচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে চাকুরির বয়সসীমা ৩৩ করার দাবি জানিয়েছিলাম।

সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে National Productivity Committee (NPC) কে উল্লেখ যোগ্যভাবে সহায়তা করে আসছে। এ কমিটি বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধিতে একাগ্রভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যমান ৭ টি শ্রম আদালত পুর্নগঠিত করা হয়েছে। সরকারের বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে এই শ্রম আদালতগুলো সুচারুভাবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে চলছে। শ্রমিক ও মালিকদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি এবং কোর্টে বিচার প্রার্থীদের উপস্থিত হওয়ার স্বার্থে শিল্পঘন এলাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে এ ধরণের আরো আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষতঃ নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, গাজিপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর,বগুড়া এবং কুমিল্লার মতো শ্রমঘন এলাকায় এবং বিভগীয় শহর সিলেট, রংপুর ও বরিশালে শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকার কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিরাজমান শ্রমিক অসন্তোষ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নিরসনকল্পে এরই মধ্যে শিল্পঘন এলাকায় স্থানীয় সংসদ সদস্যের/ জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বয়ে Crisis Management Committee (CMC) গঠন করেছে।

শিল্পঘন এলাকায় শ্রমজীবীদের জন্য আবাসন (Dormitory), হাসপাতাল, কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের সুবিধার্থে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিতে আরো নজরদারি প্রয়োজন। শিল্প-কারখানাগুলোতে যথাযথভাবে বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার জন্য ETP স্থাপনসহ পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া চামড়া শিল্প (Tannery), গার্মেন্টস ও ঝুঁকিপূর্ণ সকল কল-কারখানা শহর থেকে সরিয়ে যাবতীয় অবকাঠামোগত সুবিধাসহ যথা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, ইন্টারনেট ও যাতায়াত এবং আবাসনের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট শিল্প-পার্ক গড়ে তুলতে হবে। আশার কথা, সরকার এরই মধ্যে হাজারিবাগ ট্যানারি শিল্পকে সাভারে স্থানান্তরের কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে।

সরকার শিল্প পুলিশ গঠন করে ইপিজেডসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে এই ক্ষেত্রে সরকারকে আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, শিল্প পুলিশ যেন শিল্প ও উৎপাদন সহায়ক হয়, কখনো যেন মালিক শ্রেণীর শোষন-নিপীড়নের হাতিয়ার না হতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ এবং ক্রমান্বয়ে শিশুশ্রম বন্ধে অবিলম্বে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানা যায়। সরকার ইতোমধ্যে ২৩,০০০ রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ সহ মোট ৩৭৬৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি বেতন কাঠামোর আওতায় এনেছে, যার ফলে প্রায় ৩,৫০,০০০ শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ হয়েছে। তাছাড়াও ৩৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশ প্রহরী নিয়োগ করা হবে যারা পর্যায়ক্রমে সরকারি বেতন কাঠামোর আওতাধীন হবেন। একই সাথে সংবাদমাধ্যমসহ বিভিন্ন পেশাজীবিদের জন্য আলাদা আলাদা বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়নে বিশ্বাসী শ্রমিক-বান্ধব সরকার। পোষাক শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশ ও উন্নয়ন বজায় রাখার স্বার্থে সরকার তাই ২০১৩ সালের নভেম্বরে এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করে। পোষাক শিল্পে ৭টি ধাপে নির্ধারিত এই বেতন কাঠামো (সর্বনিম্ন ১নং গ্রেডে ৫৩০০ টাকা- ৭নং উচ্চ গ্রেডে ১৩,৪০০ টাকা বেসিক) ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই কার্যকর করা হয়। অধিকতরঃ উন্নয়নের স্বার্থে সরকার গৃহীত অন্যান্য শ্রম আইনগুলোর বাস্তবায়ন অতি প্রয়োজন।

এ জন্য শ্রম পরিদপ্তর ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল আরোবৃদ্ধি করা আবশ্যক। একই সাথে শ্রমঘন অঞ্চলে এদের শাখা অফিস খুলতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থা না করে শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করতে ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংরক্ষণে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে গতিশীল নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রম আইন অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন আয়োজনে সহায়ক হতে পারে।

শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের Technical Training Centre (TTC) গুলোকে ফিরিয়ে এনে আরো সক্রিয় করে তুলতে হবে। দেশে মোট ৩৭ টি TTC রয়েছে। এর মধ্যে শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২৬ টি সেন্টারের মাধ্যমে ১৪টি ট্রেড কোর্স চালু রয়েছে। এগুলোকে আরো কার্যকর করে তুলতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, নতুন নতুন কোর্স চালু এবং এর জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নতুন করে সেন্টার প্রতিষ্ঠা ও সেন্টারগুলোকে আরো সক্রিয় ও কার্যকর করে তুলতে প্রবাসী শ্রমিকদের চাহিদা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদেরকে ইংরেজী, শ্রমিক আমদানিকারক দেশগুলোর স্থানীয় ভাষা ও মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজারকে বিবেচনায় রেখে আরবী ভাষায়ও প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

বর্তমানে প্রায় ৮৭ লক্ষ বাংলাদেশী শ্রমিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। সরকার এ সকল শ্রমিকদের স্বার্থে এবং একই সাথে বিদেশে গমনেচ্ছু নতুন শ্রমিকদের সুবিধার্থে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' এর কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশগামী শ্রমিকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সু-ব্যবস্থা হয়েছে। এখন থেকে দালালদের প্রতারণায় জমি-জমা সব হারিয়ে বিদেশগামী কোন শ্রমিকের নিঃস্ব হবার সম্ভাবনা লুপ্ত হবে আশা করা যায়। এছাড়া শ্রমিকরা যাতে স্বল্প খরচে শুধু বিমান ভাড়া দিয়ে বিদেশ যেতে পারে, সরকার সে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। এরই মধ্যে মালয়েশিয়ায় মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫০,০০০ শ্রমিক পাঠানোর জন্য দেশব্যাপী রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের সরকার ইতোমধ্যে ২০-৩০ হাজার টাকায় রাহরাইনেও শ্রমিক রপ্তানির জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে করে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতীয় আয়

রেমিটেন্স আরো বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন। একই সাথে নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টি এবং বাংলাদেশী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিদেশে প্রতিটি বাংলাদেশ মিশনে লেবার সহায়ক ডেস্ক চালু করা প্রয়োজন। ২০১২ সালে ILO General Council-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গৃহ শ্রমিকদের (Domestic Worker) অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার ILO – এর প্রস্তাব অনুসমর্থন করেছে।

দেশের শিল্প আয়ের সবচেয়ে বড় খাত পোষাক শিল্পের ধারাবাহিক অগ্রগতি আবশ্যক। এই শিল্পে আমাদের দেশ গণচীনের পর ২য় অবস্থানে রয়েছে। আমাদের প্রতিযোগী হিসেবে তার পরেই রয়েছে ভারত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া। তবে আশার কথা, চীন এরই মধ্যে ভারি শিল্পে মনোনিবেশ করায় পোষাক শিল্পের বিদেশী ক্রেতারা ক্রমান্বয়েই বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছেন। তাই গার্মেন্টস শিল্পকে ঘিরে যে কোন দেশী-বিদেশী নাশকতামূলক আত্মঘাতি চক্রান্ত প্রতিহত করতে সরকারকে আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ৪০ লক্ষ শ্রমিকের বৃহৎ এই খাতটিতে ৮০ ভাগই নারী। জিএসপি সহ অন্যান্য সুবিধাদি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই বেপজাসহ সকল ইপিজেড -এ এইসব অবহেলিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারী শ্রমিকদের সুবিধার্থে এ সকল শিল্পে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার, দুধ, বিস্কুটসহ বিনামূল্যে শিশু খাবার নিশ্চিত করা আবশ্যক। গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের জন্য রেশনিং প্রথা চালু করা বর্তমান মহাজোট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল। এই সেক্টরের ক্রম-বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সরকার এরই মধ্যে কিছু কিছু গার্মেন্টসে এ প্রথা চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে এ সেক্টরের প্রতিটি ফেক্টরিতে রেশনিং প্রথা চালুর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তবে সকল শিল্প সেক্টরে যথাযথ উৎপাদন ও শ্রমিক স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে সকল শিল্প-কারখানায় রেশনিং প্রথা চালু করা অতীব আবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিটি কল-কারখানায় ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঞ্চিত-অবহেলিত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান নিশ্চিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এ প্রথাকে পুণরুজ্জীবিত করা আজ আমাদের সুমহান দায়িত্ব। তাই বর্তমান শ্রমিক-বান্ধব সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ বিষয়ে আশু সুষ্ঠু পদক্ষেপ নিবেন বলে বাংলার মেহনতি-শ্রমিক জনতা আস্থাশীল।

দেশের উল্লেখযোগ্য উদীয়মান আরো দুটি শিল্পখাত হচ্ছে ঔষধ শিল্প ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প । ঔষধ শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত ও দূরীভূত করে এ খাতটিকে পোষাক শিল্পের মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরেকটি সুবিশাল খাত হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। সরকার ইতোমধ্যে জাহাজ ভাঙ্গা'কে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছে। এখানে বিশেষতঃ চট্টগ্রামের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে হাজার হাজার শ্রমিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ মনোনিবেশ আশু প্রয়োজন।

সর্বশেষে, ILO-এর ধারা ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী Domestic Worker সহ সকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও স্বাধীনভাবে নেতা নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, শুধু শোভন কাজ (Decent Work), ন্যায্য মজুরি (Proper Wage) এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার (Trade Union Rights) ই শিল্প-কারখানায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে ।

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে। মে দিবস তাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চে ঘোষিত মুক্তির সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে, জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে। জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণীত ভিশন - ২০২১ এবং ২০১৫ সালের মধ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করতে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ এবং শ্রমবান্ধব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সময়ের একান্ত দাবি।

জয় বাংলা, জয় হোক বাংলার মেহনতি জনতার।

"মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের মর্যাদার স্বীকৃতি দিবস"

এ্যাডভোকেট মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান
সাবেক এম.পি.
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন-বিএলএফ

মহান মে দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। ইতিহাসে এটি মে দিবস হিসাবেই চিহ্নিত। এই দিবসটি দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য আনন্দের তথা সার্বজনীন প্রাপ্তির দিন। কারণ, অনেক রক্তাক্ত সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার তিমির অধ্যায় পেরিয়ে শ্রমজীবী মানুষ তাদের অধিকার ও মর্যাদার যে আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছে, এটি তারই স্মারক দিবস। তাই এটি একটি ঐতিহাসিক দিবস-সারা বিশ্বের শ্রমের প্রতি মর্যাদার স্বীকৃতি ও বিশ্ব মানবতার স্বরণীয় ইতিহাস।

১৮৯০ সাল থেকে প্রতিবছর পহেলা মে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও"- এই দিনের আন্তর্জাতিক শ্লোগান। ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীতে শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কর্মসময় নির্ধারণ এবং ন্যায্য মজুরির দাবিতে শুরু করেন সর্বাত্মক ধর্মঘট। শ্রমিকদের এ-আন্দোলন ৩ ও ৪ মে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে, এই দুইদিন শিকাগো নগরীতে ১০ শ্রমিক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। গুলিতে আহত হয় বহু শ্রমিক। বহু শ্রমিককের পাঠানো হয় জেলে। গ্রেফতারকৃত শ্রমিকদের ৬ জনকে পরে ফাঁসি দেওয়া হয়। একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় কারাগারে। শ্রমিক শ্রেণীর গৌরবময় সংগ্রামেরই স্মারক এই মে দিবস। একই সঙ্গে তা শ্রমিকদের সংগ্রামের বিজয়োৎসব ও নতুন শপথ গ্রহণের দিন। সকল দেশে এ দিবস পালিত হচ্ছে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে। ইউরোপ-আমেরিকায় সেকালে প্রথমে শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে কর্মসময় হ্রাস করে খাটানো হতো ১০-১২ ঘণ্টা। তবে, তখনও কোথাও কোথাও শ্রমিকদের ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ও কাজ করতে হতো। ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবি শ্রমিকদের অনেক দিনের। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এই দাবি আইএলও সনদের অনুমোদন পেয়েছে।

আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণী উন্নত দেশগুলোর শ্রমিকদের মতো কাজের পরিবেশও পায় না, তেমন উন্নত সুযোগ-সুবিধাও তারা পায়না। আমাদের শ্রমিকের সামগ্রিক, অবস্থা ভাল নয়। ভাল নয় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। অন্যদিকে, বহু শ্রমিক বেকারত্বের শিকার, অনেক শ্রমিকের মজুরি সামান্য। অনেকেকেই অস্বাস্থ্যকর ও অনুন্নত পরিবেশে কাজ করতে হয়। আইএলওর বিধান অনেক স্থানেই পালন করা হয় না। বিশেষ করে নারী ও শিশু শ্রমিকদের প্রসঙ্গে এ কথা বলা যায়। আমাদের দেশে এখনও অগণিত শিশু নানা ধরনের কষ্টকর শ্রমের কাজে নিয়োজিত। দু'মুঠো অন্নের জন্য ওদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত আইএলওর সনদ আজ পর্যন্ত বহু দেশে পূর্ণরূপে কার্যকর হয়নি। আমাদের দেশে একদিকে শ্রমিকদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, অস্থায়ী শ্রমিক এবং দিনমজুর পর্যায়ের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তো বটেই পোশাকশিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। অনেক পোশাক শিল্পকারখানায় আট ঘন্টার অধিক সময় কাজ করানোর এবং ওভারটাইম না- দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অথচ এই পোশাক শিল্প আমাদের প্রধান একটি রফতানিমুখী শিল্প, এই শিল্পই আমাদের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। এই শিল্পকে সচল রাখেন যাঁরা তাঁদের অনেকেই বিশ্বস্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকরা প্রত্যেকে ন্যায্য মজুরি পেলে, তাঁদের জীবনমান উন্নত হলে একদিকে যেমন করে আসবে শ্রমিক- অসন্তোষ, অন্যদিকে, তেমনি উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে, যার জন্য সামগ্রিকভাবে বাড়তে পারে শিল্পোৎপাদন। তবে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত থাকা। এক্ষেত্রে অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও ক্রমান্বয়ে অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে। অসৎ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব। ওই ধারাটিকে বর্জন করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সুস্থ ও সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন-মহান মে দিবসে মেহনতী মানুষকে এই অঙ্গীকারই নিতে হবে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা সবাই শ্রমিক, কারণ শ্রমের কর্ম কৌশলের আদলে শ্রমের প্রকার ভেদ থাকতে পারে। তবে পার্থিব জগতে নানাবিধভাবে আমরা অবশ্যই শ্রমিক। তাই এই মহান মে দিবসে আমাদের সবারই উচিত একে অন্যের শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা। তাহলেই আমার নিজ, নিজ অবস্থান থেকে এই ঐতিহাসিক মে দিবসের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবো।

২০১৫ সালের মে দিবসের প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মো. মজিবুর রহমান ভূঞা
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন

আগ্রাসী পুঁজিবাদের শীর্ষ পিঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লড়াকু শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রক্ত দিয়ে যে ইতিহাস রচনা করেছেন, মে মাসে সারা বিশ্বের শ্রমিক মেহনতী মানুষ আজও তাদের লড়াইয়ে, সংগ্রামে, অধিকার আদায়ের দৃপ্ত শপথে, সংকল্পে তাদের আত্মদানকে সুমহান মর্যাদার সংগে স্মরণ করেন, নিজেদের আত্মত্যাগের সংকল্পে দৃঢ় রাখেন।

মহান মে দিবসের আলোক বার্তা একটি শোষণমুক্ত টেকসই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের পথ দেখায়। কিন্তু সে পথ কি আমরা কন্টকমুক্ত করতে পেরেছি, সে পথ কি মসৃণ হয়েছে? অন্ধকার ভেদ করে আশার আলো কি দেখতে পেয়েছি?

বরং এমন একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সারা বিশ্বের গরীব ও মেহনতী মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে যা পৃথিবীর গুটি কতক লোককে আরো সম্পদশালী করেছে, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষকে গরীব থেকে গরীবতর করেছে।

উল্লেখ করতে খারাপ লাগছে যে, দশ ঘন্টার চেয়ে বেশি সময় কাজ করেও বিশ্বের ৮০ ভাগ শ্রমিক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। ১.২ বিলিয়ন শ্রমিকের আয় ১ ডলার পঞ্চাশ সেন্টের নীচে। ৭৫ ভাগ শ্রমিকের কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই। বাবা মায়ের দারিদ্রতার জন্য ১৬৮ মিলিয়ন শিশু স্কুল থেকে ছিটকে গিয়ে বাধ্য হয়ে শিশু শ্রমিক হয়ে যায়। ১.৩ বিলিয়ন লোক সুপেয় পানি পায়না। ২.৬ বিলিয়ন লোক পয়:প্রণালীর কোনো রকম সুবিধা পায় না। ২০২ মিলিয়ন শ্রমিক ২০১৩ সালে চাকুরীচ্যুত হয় যা ২০১২ সাল থেকে ৫ মিলিয়ন বেশী। যেখানে ৬০০ মিলিয়ন নতুন চাকুরী সৃষ্টির দরকার সেখানে চাকুরীচ্যুতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

অন্যদিকে দৌরাত্ম বাড়ছে বহুজাতিক কোম্পানির । দিন দিন তাদের লভ্যাংশ বাড়ছে। তারা সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তাদের কব্জায় নিয়ে গেছে। তারা স্থায়ী চাকুরীর পরিবর্তে Precarious Work বা অনিয়মিত কাজের সৃষ্টি করছে যাতে শ্রমিকদের বোনাস, ছুটি, বেতনবৃদ্ধি সহ সকল অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

সে জন্য আজ ট্রেড ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী একটি মাত্র প্রচারনায় নেমেছে-টেকসই উন্নয়নের জন্য নতুন চাকুরী সৃষ্টি করতে হবে যে চাকুরি হবে স্থায়ী, কাজটি হবে শোভন, মজুরী হবে সংসার চালানোর মত, কর্মক্ষেত্র হবে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ, সামাজিক নিরাপত্তা করতে হবে সুনিশ্চিত আর শ্রমিকদের আই,এল,ও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর ভিত্তিতে সংগঠন করার যৌথ দরকষাকষি অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

টেকসই চাকুরী, মর্যাদাপূর্ণ বেতন, সামাজিক সুরক্ষা ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যৌথ দরকষাকষির মৌলিক অধিকার এই দাবীগুলোকে সামনে রেখে আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য বাংলাদেশের সকল প্রগতিশীল জাতীয় শ্রমিক সংগঠন সমূহকে আহ্বান জানাই।

মহান মে দিবস অমর হউক।

মে দিবসের চেতনা ও আমাদের অঙ্গীকার

ফজলুল হক মন্টু
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কার্যকরী সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ।

যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ যখন থেকে শুরু, তখন থেকেই শুরু শ্রমিক শোষণের প্রক্রিয়া। আর সময়ের ব্যবধানে তার মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণ। মালিক শ্রেণীর দোর্দন্ড প্রতাপের কাছে শ্রমিকেরা মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস খুঁজে পায়নি। ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনির পরে যে মজুরী দেয়া হতো তা দিয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খাবার জোটানই কষ্টকর হয়ে যেত। বঞ্চনা সইতে না পেরে এক সময় নির্বাক শ্রমিকরাও প্রতিবাদি হয়ে ওঠে। মালিক শ্রেণীর জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ন্যায় সংগত সংগ্রাম ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" এই শ্লোগানের শক্তিতে তারা ঝাপিয়ে পড়ে সংগ্রামে। দীর্ঘ শোষণের শিকল থেকে, দাসত্বের শিকল থেকে মুক্তি পেতে শুরু করে আন্দোলন। অধিকার আদায়ের চলমান আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৮৮৪ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করার দাবি আদায়ে ১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। ঐ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১৮৮৬ সালের ১লা মে সারা দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মালিক পক্ষ তাদের দাবির প্রতি কোন কর্ণপাত না করে বরং শ্রমিকদের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। তাই শ্রমিকরা ১লা মে কাজ ফেলে রাস্তায় নেমে আসে। প্রায় সাড়ে তিন লাখের মতো শ্রমিক শিকাগো শহরের হে মার্কেটে জড়ো হন। ১ মে শিকাগো যেন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে। মিছিল, মিটিং আর ধর্মঘটের শহরে পরিনত হয় শিকাগো। ৩রা মে ম্যাককর্মিক রিপার নামক কারখানায় পুলিশ বিনা উস্কানিতে ৬ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে। ফলে আন্দোলনের জোয়ার দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

৪ মে হে মার্কেট স্কয়ারে সমাবেশের ডাক দেয়া হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সমাবেশে দলে দলে যোগ দেয় শ্রমিকরা। সমাবেশের শেষ পর্যায়ে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। অগনিত শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত হয় হে মার্কেট চত্বর। পুলিশ শ্রমিকের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে আচমকা বোমা বিস্ফোরিত হয়ে মারা যায় ৮ জন পুলিশ। আর পুলিশের গুলিতে আহত ও নিহত হন অসংখ্য শ্রমিক। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বহু শ্রমিককে কারারুদ্ধ করা হয়। শ্রমিকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে অ্যালবার্ট পারসন্স, আগার্স্টাস স্পাইজ, স্যামুয়েল ফিলডেন, মাইকেল স্কোয়ার, জজ এঞ্জেল, লুইস লিঙ্গে, অ্যাডলফ ফিসার ও অস্কার নিব প্রমুখ নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে পার্সন্স, স্পাইজ, জজ এঞ্জেল ও ফিসারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ফাঁসির মঞ্চে দাড়িয়ে শ্রমিক নেতা স্পাইজ চিৎকার করে বলেছিলেন "আজ আমাদের এই নিঃশব্দতা তোমাদের আওয়াজ অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী হবে- দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে তিনি যে কথা বলেছিলেন তা শোষিত শ্রমিক সমাজের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে প্রেরণা জুগিয়েছে। শ্রমিক নেতাদের ফাঁসি সারা বিশ্বের শ্রমিক সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে। শাষক গোষ্ঠির নির্মমতার স্বরূপ আরো জোরালো ভাবে ধরা পড়েছিল শ্রমিকদের কাছে। ফলে তারা আরো উদীপ্ত হয়েছিল অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। ফরাসি বিপ্লবের শত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফ্রেডারিক এঞ্জেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালে ১৮৯০ সাল হতে প্রতি বছর মে এর প্রথম দিনটিকে আর্ন্তজাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এভাবে আর্ন্তজাতিক মে দিবস পালনের সূচনা হয়।

মে দিবসের শ্রমিকদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামী মানসিকতার কাছে পরাজিত হয়েছিল মালিক পক্ষ। বাধ্য হয়েছিল শ্রমিকদের ৮ঘন্টা কাজ করার দাবি মেনে নিতে। জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক সংগঠক হিসেবে আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অধিকার সমূহ স্বীকৃতি লাভ করে। আইএলও

শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই পর্যন্ত ১৮৩টি কনভেনশন প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে ৭টি কোর-কনভেনশনসহ ৩৫ টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রীয় ভাবে মে দিবস পালন শুরু করেন। আবার বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ, ১৪ অনুচ্ছেদ এবং ২০ (১) অনুচ্ছেদে শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী সরকার শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে শ্রমিকের কল্যাণে যুগোপযোগী করেছেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ব্যবহার ও উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছেন। তিনি শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাত্রার মান বাড়াতে ন্যায় সংগত মজুরী নির্ধারণ, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত, নিরাপদ ও উন্নত কর্মপরিবেশ রক্ষায় বেশকিছু কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করেছেন। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ ও ৮১ ধরণের কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় খেটে খাওয়া দুঃখি মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে আর্ন্তজাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্যে নতুন নতুন শ্রম বাজার খোজা হচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে বহিঃবিশ্বের কর্মসংস্থানের পদ সহজীকরণ করে বর্হিগমন পদ্ধতি আধুনিকায়ন, ব্যায় সংকোচন ও ডিজিটালাইজড করে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তিনি শ্রমিকদের চাকুরীর বয়স ৫৭ বছর থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করেছেন। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরীর বয়স ২ বছর বাড়িয়ে ৫৯ বছর করেছেন। নতুন পে-স্কেল ও ২০% মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিসহ পে-কমিশন ও সার্ভিস কমিশন গঠন করেছেন। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছরে উন্নীত করে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বৃদ্ধি করেছেন।

বেসরকারি শিল্প সেক্টরের নিম্নতর মজুরি পুনঃনির্ধারণ করেছে। দেশের শ্রমঘন ও সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী আরএমজি সেক্টরে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১৬৫০/- টাকা থেকে ৮২% বৃদ্ধি করে প্রথমে ৩,০০০/- হাজার, পরে ৫,৩০০/- টাকা পুনঃ নির্ধারণ করেছেন। কর্মজীবী নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি চার থেকে ছয় মাসে উন্নীত এবং তাদের জন্য মাতৃত্ব কল্যাণ ভাতা চালু করেছেন। সরকার রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী কাঠামো নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরী কমিশন গঠন করে তার সুপারিশের আলোকে শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ব্যহত করার লক্ষ্যে হরতাল ও অবরোধের নামে একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পেট্রোল বোমা মেরে বাসের ড্রাইভার, হেলপার ও নিরীহ যাত্রীদের হত্যা করছে। প্রতিদিন হাসপাতালের বার্ন ইউনিটগুলো পেট্রোল বোমার আঘাতে ঝলসানো মানুষের আত্মচিৎকারে ভারি হয়ে উঠছে। তাই শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ ও জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে এই দানবদেরকে রুখতে হবে। মালিক শ্রমিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে সচল রাখতে হবে কলকারখানায় উৎপাদনের চাকা। বাস্তবায়ন করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত দিন বদলের কর্মসূচী। এই হোক
মে দিবসের অঙ্গীকার।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

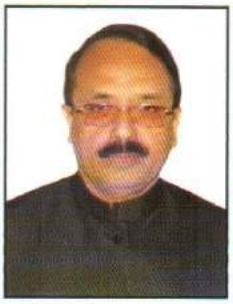

মহান মে দিবসঃ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট

মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন
মহা-সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে অধিকার আদায়ের গৌরবময় এক ঐতিহাসিক দিন মহান মে দিবস। এই অধিকার আদায়ের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের রচনা হয়েছিল আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে। সভ্যতার শুরু থেকেই শ্রমজীবী মানুষ নানাভাবে শোষিত-নির্যাতিত হয়ে আসছে। এই শোষিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ পায় ১৮৮৬ সালের ৪ মে। রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় অধিকার আদায়ের পথ, জন্ম হয় মহান মে দিবসের। সেই থেকে ১ মে দিবসটি ঐতিহাসিক মহান মে দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সুখী, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াস একান্তভাবে আবশ্যক। শ্রমিককে মনে রাখতে হবে মালিক বা শিল্প উদ্যোক্তা না থাকলে শিল্পের বিকাশ হবেনা। শিল্পের বিকাশ না হলে কর্মসংস্থান হবে না। পাশাপাশি মালিক বা শিল্প উদ্যোক্তাকে মনে রাখতে হবে শ্রমিক ব্যতীত তার শিল্প অচল। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও আইনানুগ অধিকার না দিলে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হবে। সুতরাং শিল্প পরিচালনায় মালিক ও শ্রমিকদের সুসম্পর্ক স্থাপন ব্যতিত শিল্পের বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিবেশ স্থাপন করা সম্ভব নয়। শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন মালিক-শ্রমিক ঐক্য এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা।

মে দিবস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে শ্রমজীবী মানুষের দাবী আদায়ের লড়াই-সংগ্রাম ও আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান সমস্যাদি সহ শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন কাজ করে থাকেন। যা তাদের সাংবিধানিক অধিকার। প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ভোটে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সিবিএ নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত সিবিএ প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের প্রচলিত ও শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সুশৃঙ্খলভাবে সাংগঠনিকসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নির্বাচিত সিবিএ এবং ননসিবিএ নেতাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তারা অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং স্বার্থ হাসিলের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে নানা ধরণের ষড়যন্ত্র করে থাকেন। তারা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও মিডিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যা তথ্য দিয়ে অপপ্রচার করেন এবং শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে তৎপর থাকেন। তাদের অপপ্রচারে মনে হয় ট্রেড ইউনিয়ন করাই যেন একটি অপরাধ।

সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন করার অবাধ অধিকার নিশ্চিত হলে সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ অত্যন্ত সহজভাবে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হতে পারে। অপর দিকে অবাধ সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন করতে বাধা সৃষ্টি হওয়ার কারণেই শ্রমিক কর্মচারীরা স্বত:স্ফুর্তভাবে তার অধিকার ও ন্যায্য দাবী আদায়ের পাশাপাশি মালিকের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করাতে বাধ্য হয়।

তখনই সৃষ্টি হয় নৈরাজ্যকর অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি। এতে শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই আইএলও কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮ এর মাধ্যমে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ কোন সময়ই শিল্প বিকাশের জন্য বাধা নয়। বরঞ্চ আইএলও কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮ এর ভিত্তিতে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার শিল্প বিকাশের পথকে সুগম করতে পারে। তাই শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সুগম করতে, শিল্পে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে, শ্রমিক কর্মচারীদের বাঁচার মত মজুরী সহ ন্যায্য দাবী সমূহ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান এবং শিল্পে সুষ্ঠু পরিবেশে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে একমাত্র বিকল্প পথ হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠিত হতে দেয়া এবং সে ভিত্তিতে আইএলও কনভেনশন ৮৭ এবং ৯৮ ভিত্তিতে শ্রম আইন সংশোধনীর মাধ্যমে শিল্পাঙ্গনে অস্থিরতা নিরসন করা।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে এখনও কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক ও পরস্পরের প্রতি ভাল ব্যবহার বা মনোভাব এবং শিল্প ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য আগ্রহ বা উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক হচ্ছে উন্নয়নের চাবিকাঠি। শ্রমিক এবং মালিক যতদিন একে অপরকে বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে মেনে নিতে পারবে না এবং শিল্পকে নিজের গৃহ বা বাড়ীর মর্যাদা দিতে পারবে না ততদিন সুসম্পর্ক সৃষ্টির বাধা কাটবে না।
শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ কর্মস্থল, ন্যায্য মজুরী, প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং মালিক-শ্রমিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক খুবই জরুরী। আশার কথা বর্তমান সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে অত্যন্ত আন্তরিক। শ্রমিকের যথাযথ প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং মালিক-শ্রমিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করে মানসম্মত পণ্য ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণে তৎপর হতে হবে। মেহনতি মানুষের আত্মত্যাগের মহিমার ভাস্বর মহান মে দিবসের চেতনা দেশ ও জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রয়াসকে আরো বেগবান করবে শ্রমজীবী মানুষের এটাই প্রত্যাশা।

দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ পাটকল আদমজী জুটমিলসহ কয়েক সহস্র কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বেকার করে দেয়া হয়েছিল। তাদের রুটি-রুজির পথ বন্ধ করে তাদের কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দেয়া হয়েছিল। তারা এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামী ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সাথে গোপন আঁতাত করে বিএনপি সরকার গঠন করে। সে সময়ে সারের দাবীতে আন্দোলনরত ১৮ জন কৃষককে এবং পবিত্র রমজান মাসে মজুরীর দাবীতে আন্দোলনরত ১৭ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তারা আনসার ব্যাটালিয়ান ক্যাম্পে বিমান থেকে বোমা মেরে শত শত আনসার ব্যাটালিয়ান জোয়ানদের হত্যা করেছে। ২০০১ সালে জামায়াতে ইসলামী ও স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে জোট বেঁধে ঐক্যজোট গঠন করে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। তারা ২০০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবীর আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সজল ও বাচ্চু নামে দুই জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেছে। তারা মিল-কারখানা বন্ধ করে দিয়ে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে। বিদ্যুৎ এর দাবীতে আন্দোলনরত চাপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে নিরীহ শ্রমিক-কৃষক-জনতাকে গুলি করে ২০ জনকে পাখির মত হত্যা করা হয়েছে।

৭১' এর পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধী চক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধাচারণসহ বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতাকে নস্যাৎ করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এই অপশক্তি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামাত সহ বিশ দলীয় জোট হরতাল ও অবরোধের নামে জ্বালাও-পোড়াও, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ, পেট্রোল বোমা মেরে নারী-শিশু, শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ হত্যা করে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার পায়তারা করছে। যা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। তাই বিবেকের তাড়নায় এই অনৈতিক ও অরাজনৈতিক আচরণ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়

ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের নির্মূল করার জন্য সকলকে '৭১ সালের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশে শ্রমিক শ্রেণী মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অসংখ্য শ্রমিক-কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কত পরিবার ধ্বংস হয়েছে। কত শ্রমিকের মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছে। তার হিসাব করা কঠিন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী-মানবতা বিরোধীদের বিচার হয়নি বলে বাংলাদেশ পাপমুক্ত হয়নি। খুন যদি পাপ হয়, ধর্ষণ যদি পাপ হয় তবে '৭১ এর রাজাকার-আলবদররা পাপী। তাদেরকে বিচার করেই বাংলাদেশকে পাপমুক্ত করতে হবে।

স্বাধীনতা বিরোধীরা ৩০ লাখ শহীদের রক্ত খচিত আমাদের পতাকার চিহ্ন মুছে ফেলতে চাইবে। ধ্বংস হয়ে যাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং আমাদের সব অর্জন। তাই আসুন মহান মে দিবসের রক্তদানের চেতনায় পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধাপরাধী মানবতা বিরোধীদের বিচার সুনিশ্চিত করি এবং যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা সহ সকল ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করি। এজন্য দরকার বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানসহ সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমন্বিত শক্তির ঐক্য।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

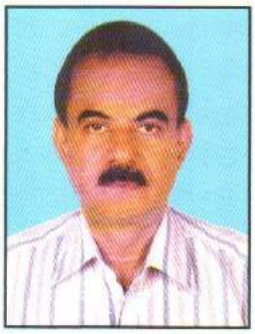

মে দিবসের চেতনা ও শিল্পোন্নয়ন

মোঃ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী
সভাপতি
জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক লীগ,বি-১৯০২,সিবিএ
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ও সহ-সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক মে-দিবস অর্থাৎ ১ মে তারিখ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে মকরম্যাক রীপার ওয়ার্কস নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটী শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল মহান মে দিবসের ইতিহাস। সৃষ্টি হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের দাবী আদায়ের ইতিহাস। বিরামহীন শ্রমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল কর্মকাল বা কাজের সময়সীমা। মালিক পক্ষ উপলব্ধি করেছিল দাবীর বাস্তবতা এবং এতদসম্পর্কে নিয়মনীতি বা আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গঠিত হয় এবং কাজের সময়সীমা সম্পর্কে কনভেনশন গৃহীত হয়। এ কনভেনশন পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই অনুসমর্থন লাভ করে এবং কনভেনশনের বিধান মোতাবেক স্ব-স্ব দেশে কাজের সময়সীমা সম্পর্কে আইন প্রণীত হয়।

শ্রমিকদের এ বিক্ষোভ বা আন্দোলনের ফলে শ্রমিক সংগঠন স্বীকৃতি পায়, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, দাবী আদায়ের অবকাঠামো গড়ে উঠে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। মজুরি নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড ও মজুরি কমিশন গঠিত হয়, চাকরির শর্তাবলীর বিধান নির্দিষ্ট হয়, প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকৃতি পায় এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকৃতি পায়। এসব শ্রমিক আন্দোলনেরই প্রতিফলন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সুতরাং পূর্বের মত শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিক্ষোভ বা আন্দোলনের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে। কারণ অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মালিক বা শ্রমিক আলাদা কোন দল বা গোষ্ঠী নয়, এ হচ্ছে সমন্বিত গোষ্ঠী। এ পরিবেশে সমন্বিত গোষ্ঠীর উপর অধিকতর দায়িত্ব এসে পড়েছে। কেবল দেশের জন্য নয়, তাদের নিজেদের স্বার্থেও উৎপাদিত পন্যের পরিমাণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, পন্যের গুণগতমান অন্য সব দেশের পণ্যের গুণগতমানের তুলনায় যাতে কোনক্রমেই কম না হয় সে সম্পর্কে প্রতিযোগিতা করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা আবশ্যক। কারণ, এ প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে উৎপাদিত পণ্য কেবল গুদামজাত হয়ে থাকবে, এ বিষয়গুলো শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে উপলব্ধি করতে হবে। মালিকদেরকের বিশ্বায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক। শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশী শ্রমিক কর্মহীন। মাথাপিছু বার্ষিক জিডিপি ৫০০ ডলারের কম। এছাড়া প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রম বাজারে আসছে। অথচ প্রয়োজনের তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ অপ্রতুল। জনসংখ্যার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এসব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং লাগসই কর্মসূচী গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ পূর্বের তুলনায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আশা করা যায়, ২০২০ সালের দিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নততর হয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

দেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলো বাতিল করে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে একটি সমন্বিত আইন জারি হয়েছে। এ আইনটি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। কতগুলো নতুন বিষয় এ আইনে

স্থান পেয়েছে। যেমনঃ চাকরি হতে অবসর গ্রহণ, ভবিষ্যৎ তহবিলের ব্যবস্থা, কর্মের সাথে জড়িত না থাকার কারণে অর্থাৎ সাধারণ মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার ও দরকষাকষির সুযোগ নিশ্চিত করা। এ ছাড়া বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ জারি হওয়ার ফলে শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে কল্যাণ সাধনের জন্য বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অনেক সচেতন এবং এই সচেতনতার বিকাশ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এখন শিল্প সম্পর্ক সুষ্ঠু হলে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা নিশ্চিত হবে। সুতরাং তাদের এ বিশ্বাসকে অর্থবহ করার জন্য সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এ অবদানকে ধরে রাখতে হলে শ্রমিকদের পূর্বের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করতে হবে, দাবি আদায়ের পদ্ধতি আইনসম্মত হতে হবে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে অধিক দায়িত্বশীল ও সচেতন হতে হবে। সকল সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে নিরসনের জন্য মন-মানসিকতা রাখতে হবে। বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে যেসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ঃ -

১. আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বিপুল পরিমাণে জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
২. সরকারীভাবে স্বল্প খরচে শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ;
৩. মজুরী কমিশন গঠন;
৪. বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় শ্রমিকদের দ্বিগুনেরও বেশী ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ;
৫. কর্মরত অবস্থায় মৃত শ্রমিক/কর্মচারীদের গোষ্ঠী বীমার টাকা ১,০০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০টাকায় নির্ধারণ;
৬. সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশনের হার ৩০% বৃদ্ধি।
৭. সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিতসহ সকল সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর মেয়াদ ২ (দুই) বছর বৃদ্ধি;
৮. সময় উপযোগী মহার্ঘভাতা প্রদান;
৯. সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিতসহ সকল সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পে-কমিশন গঠন।
১০. ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্বের হার কমিয়ে আনা।
১১. বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদ্যুৎ ভাতা প্রবর্তন।
১২. শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মের পাশাপাশি খেলাধুলার পরিবেশ সৃষ্টি।

উল্লেখ্য ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি সময়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে ২০১৪ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রের হার ২৫% নামিয়ে আনা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩২০০ মেঃওঃ হইতে ১৩০০০ মেগাওয়াটে উত্তীর্ণ সহ সর্বক্ষেত্রে যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়ে বাংলাদেশ যখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হতে চলেছে, ঠিক সেইসময় তা বিনষ্ট করার জন্য ১৯৭১ সালের পরাজিত শত্রুরা অর্থাৎ বিএনপি-জামাত সহ ২০ দলীয় জোট বাংলাদেশের একদিকে যেমন হরতাল-অবরোধের নামে জ্বালাও পোড়াও করে দেশের অর্থনীতির ক্ষতিগ্রস্থ করা সহ পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যা করছে, অন্যদিকে মেধা বিনষ্টের জন্য শিক্ষাবিদদের হত্যাসহ ধ্বংসাত্মক কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

মে-দিবসের আদর্শ ও চেতনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শ্রমিকের সমস্যার প্রতিলক্ষ্য রাখা যেমন মালিকের দায়িত্ব, তেমনিভাবে মে-দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিক দায়িত্বশীলতার সাথে নিয়ম-শৃংখলা অনুসরণ করে শ্রম প্রদান করা শ্রমিকের কর্তব্য। শ্রমিক যে শিল্পে নিয়োজিত, সে শিল্পকে দৃঢ় অবস্থানে টিকিয়ে রাখার জন্য সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাও তাদের জন্য অবশ্য করণীয়।

মে দিবসের চেতনা ও বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ

রাজেকুজ্জামান রতন
সাধারণ সম্পাদক
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
কেন্দ্রীয় কমিটি

মানুষের চারপাশে যা কিছু তা সবসময়ই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। কিছু পরিবর্তিত হয় প্রাকৃতিক কারণে, কিছু পরিবর্তিত হয় মানুষের শ্রমে। রুক্ষ মাটি মানুষের শ্রমেই আবাদযোগ্য হয়। প্রাকৃতিক লোহা পরিণত হয় ইস্পাতে, ইস্পাত ছুড়ির ফলায়, কয়লা তেল গ্যাস পরিণত হয় শক্তিতে, বিষ পরিণত হয় জীবন রক্ষাকারী ঔষুধে। মানুষের শ্রমের ফলেই ৭০০ কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, বিদ্যুতের আলো, যানবাহন, বাসস্থান সৃষ্টি করা ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যদি এখনও প্রশ্ন করা হয় কাউকে যে, সবচেয়ে অপছন্দের বিষয় কি? তাহলে সাধারণভাবে যে উত্তর আসবে তা হলো 'পরিশ্রম করা'। আবার ঠিক উল্টো প্রশ্ন করলে, সবচেয়ে পছন্দের বিষয় কি? তার উত্তর আসবে 'পরিশ্রম না করে সহজে কিছু পাওয়া।' যে শ্রমের মাধ্যমে জীবন ধারণের সব উপকরণের সৃষ্টি সেই শ্রমের প্রতি মানুষের এই নেতিবাচক ধারণা কেন? উত্তর খুঁজতে গেলেই ইতিহাস শিক্ষকের মতো দেখিয়ে দেয় একদল মানুষ যখন অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করতে শুরু করেছে তখন থেকেই শ্রমের প্রয়োজন বেড়েছে এবং মর্যাদা কমেছে। যারা উদয়াস্ত শ্রম করে অন্যের জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও সহজ করে তাদের কাছে শ্রম করা অভিশাপের মত। আর যারা অন্যের শ্রমে রাজা-বাদশার মত জীবন-যাপন করে তাদের কাছে শ্রম ছোট লোকের কাজ।

ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিন্তার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এরপর শিল্প বিপ্লব দেখালো মানুষের শ্রমে কি অসাধ্য সাধন করা যায়। এডাম স্মিথের Law of Value এবং ডেভিড রিকার্ডোর Labour theory of value এবং কার্ল মার্ক্সের Theory of surplus value শ্রমের মূল্য, শ্রমিকের মর্যাদা ও অবদান সম্পর্কে যেমন ভাবিয়ে তুললো তেমনি শ্রমিকরাও তাদের জীবনের মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করলো। সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এমনকি চৌদ্দ, ষোল, আঠার ঘন্টা বাধ্যতামূলক কাজের যে বিধান চালু ছিল তা শ্রমিকের জীবনকে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে ফেলে রেখেছিল। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত কাজের ঘন্টা কমাবার দাবীতে ধর্মঘটের পর ধর্মঘট হয়েছে। দুনিয়ার প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে পরিচিত ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়নের জন্ম ১৮২৭ সালে, গৃহ নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের এক ধর্মঘটের মাধ্যমে, তা ছিল ১০ ঘন্টা কাজের দাবিতে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভ্যানবুরেনের আমলে সরকারি কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য দশ ঘন্টা কাজের দিন বেধে দেয়া হয়। কিন্তু শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের নিয়ম চালু করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। ১৮৫০ সালের পর থেকে এ আন্দোলন তীব্রতা পেতে শুরু করে। এ আন্দোলন শুধু আমেরিকায় নয়, যেখানেই শ্রমিকরা জোটবদ্ধ হয়েছে সেখানেই শক্তিশালী হয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার গৃহনির্মাণ শ্রমিকরাও আওয়াজ তুলেছিল, '৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা আমোদ-প্রমোদ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম।

আমেরিকায় ১৮৮৬ সালে ৬০টি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি বালটিমোরে মিলিত হয়ে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন গঠন করে। এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যেই সাধারণ কাজের দিন হবে ৮ ঘন্টা। কার্ল মার্কসের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম আন্তর্জাতিক এর জেনেভা কংগ্রেস এই দাবি সমর্থন করে। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার এক পর্যায়ে ১৮৮৬ সালের ১ মে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র শিকাগোতে শ্রমিকদের এক বিশাল সমাবেশ করা হয়। এ ধর্মঘট ভাঙ্গতে মালিক ও পুলিশের মিলিত আক্রমনে শ্রমিকের রক্ত ঝড়ে। রক্তে ভেজা এই আন্দোলনের পর প্রহসনমূলকভাবে পার্সনস, স্পাইজ, ফিসার এবং এঙ্গেলের ফাঁসি দেয়া হয়। কিন্তু তাতে আন্দোলন স্থগিত হয়নি বরং ৮ ঘন্টা

কাজের দিন ঘোষণার দাবি আরো তীব্রতা নিয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফরাসী বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা দেশের সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্যারিসে জড়ো হন। এখানে আবার গড়ে উঠে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস। এখানে সর্বসম্মতভাবে ১ মে তারিখটিকে আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের স্মারক দিবস হিসেবে মে দিবস পালনের মাধ্যমে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৯৩ সালে মে দিবসে জুরিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যে প্রস্তাব নেয়া হয় তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল, '৮ ঘণ্টার দাবিতে ১ মে'র যে শ্রমিক সমাবেশ, তা শ্রমিক শ্রেণির সুদৃঢ় সংকল্পের অঙ্গীকার; এই সংকল্প হলো সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণি বৈষম্যের বিলোপ সাধন করা এবং এইভাবে শ্রেণি বৈষম্য বিলোপের মাধ্যমে সমস্ত জাতির শান্তির পথে আন্তর্জাতিক শান্তির একমাত্র সড়কে পদার্পন করা।' এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হলো মে দিবসের অন্তর্নিহিত চেতনা।

বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের শ্রমজীবী এবং পাকিস্তানবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষও মে দিবসকে গ্রহণ করেছিল ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির সাথে সাথে শোষণ মুক্তির আকাঙ্খায়। স্বাধীনতার পর মে দিবস সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশে আইএলও কোর কনভেনশন ২৯, ৮৭, ৯৮, ১০০, ১০৫, ১১১, ১৮২ অনুসমর্থিত হয়েছে। ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবি সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হয়নি এবং ৮ ঘন্টার কাজের দাবির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ন্যায্য মজুরির দাবি সকল ক্ষেত্রে আজও বাস্তবায়িত হয় নাই। বেঁচে থাকার মত মজুরি বা living wage এর জন্য শ্রমজীবী মানুষকে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে বারবার। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ফলেই উৎপাদন বাড়ছে, রপ্তানি আয় বাড়ছে। জিডিপি বাড়ছে কিন্তু শ্রমিকের মজুরি ন্যায় সঙ্গতভাবে বাড়ছে না। মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটছে ফলে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন কঠিন হয়ে পড়ছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বয়স যত বাড়ছে, আয় বৈষম্যও ততই বাড়ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ চিত্র বিশ্বের সর্বত্র। শুধু খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য প্রাপ্যতার চিত্র দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশ্বে ধান গম ও ভুট্টা মিলে উৎপাদন হচ্ছে বার্ষিক ২৩০ কোটি টন। তাতে প্রতিটি মানুষের বার্ষিক ৩২৪ কেজি খাদ্য পাওয়ার কথা। কিন্তু অপুষ্টিতে ভুগছে বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষ যাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী। উৎপাদন ও বন্টনের বৈষম্যমূলক চিত্র তাই সমস্ত ক্ষেত্রেই। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা বেড়েছে ২ গুণ আর খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ৩ গুণ। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের অপুষ্টি আশানারূপ কমেনি। অথচ এ বৈষম্য দূর করে মানবিক সমাজের প্রত্যাশাতেই তো শ্রম ঘন্টা কমানোর দাবি উঠেছিল। ৮ ঘণ্টা কাজ করেই শ্রমিক এমন মজুরি পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল যা দিয়ে সে বিনোদন ও বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। মে দিবসের সে স্বপ্ন এখনও শ্রমিকের কাছে অনেক ক্ষেত্রে অধরাই রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতিও ভিন্নতর কিছু নয়। বাংলাদেশের সস্তা শ্রমশক্তি আজ সবার কাছেই লোভনীয়। শ্রমশক্তির বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বে ৭ম। ৫ কোটি ৬৭ লাখ শ্রম সক্ষম মানুষের মধ্যে কৃষিতে ২ কোটি ৫৭ লাখ, শিল্প কারখানায় ৬৭ লাখ, পরিবহনে ৪০ লাখ, দোকান-হোটেল-রেষ্টুরেন্ট ৮৪ লাখ, নির্মাণ শিল্পে ২৬ লাখ, দিনমজুর হিসেবে ১ কোটি ৬ লাখ শ্রমিক আছে। এর মধ্যে গার্মেন্টসে কর্মরত ৪০ লাখ শ্রমিকের কথা বিভিন্ন ভাবেই উল্লেখ করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের তুলনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার আইন সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেখানে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান কি এবং তারা কি পায় এটা আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট। না পাওয়ার বঞ্চনা থেকেই তো মে দিবসের জন্ম। আজও কখনো কখনো সেই না পাওয়ার বেদনা শ্রমজীবী মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এখন শ্রমজীবী মানুষের সামনে কাজ, কর্মঘণ্টা ও মজুরী প্রশ্নের সাথে সাথে আর একটি প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তা হলো কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা। তাজরীন, রানাপ্লাজা এবং সর্বশেষ মংলা সিমেন্ট কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু দেখিয়ে দিয়েছে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক কত নিরাপত্তাহীন। শ্রমিক যে কোন

সময় যেমন ছাঁটাই হয়ে যেতে পারে, তেমনি জীবন হারাতে পারে এ আশংকাও আজ প্রবল। কিন্তু সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ চাইলে শ্রমের মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি, চাকুরীর নিরাপত্তা আর জীবনের নিরাপত্তা তো প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। তবে আশার কথা এই যে, বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক।

মে দিবস তাই প্রতিবছর একথাই মনে করিয়ে দেয়–
শ্রম ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়, শ্রমের মর্যাদা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া উৎপাদনশীল মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ১৮৮৬ সালের সেই রক্তাক্ত মে দিবসের পর ১২৯ বছর পার হয়েছে। অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে শুধু শ্রমিকের অধিকার নয়, গণতন্ত্র, মানবাধিকার কোন কিছুই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মে দিবসে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি ছিল প্রকাশ্যে কিন্তু এর অন্তরালে ছিল শোষণমুক্তির আকাঙ্খা। আজও মে দিবস বিশ্বের দেশে দেশে সে আকাঙ্খা বাস্তবায়নের সংগ্রামে সকল শ্রমজীবী মানুষকে ডাক দিয়ে যায়।

মে দিবসের চেতনা দীর্ঘজীবী হোক।

"শ্রমিক–মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং উপযুক্ত আইন প্রসঙ্গ

এ্যাড. মাহবুবুর রহমান ইসমাইল
সভাপতি
বাংলাদেশ টেক্সটাইল-গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
কেন্দ্রীয় কমিটি

মানুষের জীবনের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সকল মৌলিক অধিকারের চেয়েও প্রধান মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানে আর্টিকেল ৩১, ৩২, ৩৪ এ প্রতিটি নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যাক্তি স্বাধীনতার অধিকার এবং জবর দস্তি শ্রম নিষিদ্ধ করণের বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ্য আছে। এগুলো ইউনিভার্সেল হিউম্যান রাইট এবং মানবাধিকার সনদেও উল্লেখ্য। যাদের বা যার কারণে অপর কোন মানুষের প্রাণহানি ঘটে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা বা কার্যকর হয়ে না উঠলে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। তৈরি পোষাক শিল্প কারখানায় এ পর্যন্ত ২৩৫ টি অগ্নীকাণ্ড বা ভবন ধসে প্রায় ২ সহশ্রাধিক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং কয়েক হাজার পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। উল্লেখ্যযোগ্য কয়েক ঘটনার জন্য সরকারীভাবে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এসব ঘটনা বা শ্রমিকদের প্রাণহানির জন্য মালিক সংগঠন এবং আই.এল.ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে কম-বেশী দেয়া না দেয়া বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এক ধরণের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে সব কিছু ধুয়ে মুছে দেয়ার কারণে শ্রমিকদের প্রাণ হানিও কমেনি ভবনধস-অগ্নীকাণ্ডও রোধ হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রাণহানির জন্য আইনগত শাস্তির বিষয় নিয়ে কতটুকু ব্যবস্থা নেয়া গেছে এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন? অগ্নীকাণ্ড ও ভবন ধসের ঘটনার উপোর্যপরি পুনরাবৃত্তি তাজরিন গার্মেন্টসে অগ্নীকাণ্ড এবং রানা প্লাজা ধসের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সীমা লংঘনে পূজিবাদী নিষ্ঠুর পরিনতি দেখে বিশ্ব বেনিয়া সম্প্রদায় নিজেরাই শিহরিত হয়ে পড়েছিল। একজন মানুষের প্রাণ হানির অপরাদের জন্য যাবৎজীবন কারাদণ্ড-ফাঁসির আইন থাকলেও শত-সহশ্রাধিক মানুষের প্রানহানির অপরাদের জন্য প্রচলিত আইন দ্বারা বিচার করা সম্ভব নয়। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে যখন প্রচলিত আইন তৈরি করা হয়েছিল তখন এক সঙ্গে সহস্রাধিক মানুষের প্রানহানির ঘটনা ঘটেনি বা এ ধরণের ধারণাও ছিলনা। এ সমস্ত ঘটনা এবং প্রাণহানির জন্য আইন সংশোধন পূর্বক বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে এগুলোর বিচার করা প্রয়োজন বলে আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কারণ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ধরণের আইন প্রণয়ন না হলে অপরাধ মুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব নয়। শিল্প মালিক বা নিয়োগ কর্তা এমন ঝুকিপূর্ণ কর্ম পরিবেশ বজায় রাখতে পারেন না যা দ্বারা অন্যের ক্ষতি বা প্রাণহানি ঘটতে পারে এবং যে ঘটনা বা অবহেলার জন্য তিনি দায়ী হতে পারেন। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য গার্মেন্টস শিল্প একটি গ্লোবাল চেইন সিস্টেম বিজনেস, এই প্রেক্ষিতে বিদেশী ক্রেতা বা ব্রান্ড বায়ার যারা তাদের ব্যবসায় মুনাফার প্রয়োজনে আমাদের দেশে উৎপাদন করে থাকে এক্ষেত্রে ব্রান্ড-বায়ারদেরও কর্পোরেট সোস্যাল লাইবিলিটি রয়েছে। পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায়, কোন বহু জাতীক কোম্পানী বিভিন্ন দেশের খনিতে উৎপাদনের সময় দূর্ঘটনা বা প্রাণহানির জন্য তারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্রান্ড-বায়ার যখন আমাদের দেশে কোন কাজের অর্ডার দিবে তখন শ্রম মন্ত্রণালয়ে অবশ্যই হলফ নামা দিয়ে বলতে হবে তাদের অর্ডার প্রাপ্ত কারখানা নিরাপদ কর্ম পরিবেশ রয়েছে এবং যে কোন দূর্ঘটনার জন্য তারা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। এছাড়াও দেশীয় শিল্প মালিকগণ আদালতে এই মর্মে ডিক্লেয়ারেশন প্রদান করবেন যে, কারখানা আইন ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ত্রুটির জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। এ সমস্ত বিষয় কোন শিল্প মালিককে ঝামেলা বা শাস্তি প্রদানের জন্য নয়।

এটি কোন শিল্প কারখানায় যেন অগ্নীকাণ্ড বা ভবন ধস না ঘটে তার আইনগত পদক্ষেপ মাত্র। বিলিয়ন ডলারের এ ব্যবসায় মুনাফা অর্জনকারী মালিকপক্ষ আর অন্যদিকে তাদেরই শ্রমিক যাদের মেহনত ও দক্ষতা নির্ভর করে পোশাক শিল্প টিকে আছে, সেই শ্রমিক কর্মস্থলে জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবন নিরাপত্তা প্রদান করা গার্মেন্টস শিল্পের স্বার্থেই প্রয়োজন। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যতিত গার্মেন্টস শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকারখানায় কয়েক দিন পর পর অগ্নিকাণ্ড ও ভবন ধসের কারণে বিদেশী বায়ার/ক্রেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যার কারণে ক্রেতাদের জোট একর্ড বাংলাদেশের শ্রম পরিবেশ নিয়ে অসন্তুষ্ট। শ্রমিকদের আগুনে পুড়ে অথবা শ্রমিকদের রক্ত দিয়ে বানানো পোশাক সাধারণ ক্রেতারা ব্যবহার করেন না। এখন পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ড ও ভবন ধসের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে এমন কোন দৃষ্টান্তমূলক বিচার বা শাস্তি দেখতে পাওয়া যায়নি, যার দ্বারা শ্রমিক বা ক্রেতাগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হতে পারে। বিজ্ঞ জনেরা মনে করে, গার্মেন্টস শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে দেশের স্বার্থে। তবে কোন শোষণ বা শ্রমিকের লাশের উপর এই শিল্পের অগ্রগতি হবে না। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দায়ী-দোষীদের শাস্তি, ন্যায়বিচার ও নিরাপদ কর্মস্থল সবাই আশা করে।

**"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"**

মহান মে দিবস ও বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর করণীয়

চৌধুরী আশিকুল আলম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ

অসংগঠিত শ্রমিকদেরকে সুসংগঠিত করে শ্রমিকদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকদের অব্যাহত সংগ্রাম, অত্যাচার নিপীড়ন, জীবন ও রক্তদানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সরকার ও মালিকদের কাছ থেকে শ্রমিক শ্রেণীর দাবী আদায়, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলনের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দিবসের নাম হচ্ছে মহান মে দিবস। এক থেকে একাধিক কারখানা – এক রাষ্ট্র থেকে অনেক রাষ্ট্র তথা সারা দুনিয়া জুড়ে শ্রমিকের লাগাতার আন্দোলন এবং ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই তারা এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলো। একচেটিয়া পুঁজির নির্মম শোষণ নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি, শ্রমিকের দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগঠন ছাড়া শ্রমিকের অন্য কোন হাতিয়ার নাই। সংগঠন করার স্বাধীনতা, ধর্মঘটের অধিকার হচ্ছে শ্রমিকের একটি মৌলিক অধিকার। যা আজ সারা দুনিয়া জুড়েই চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন।

অতি মুনাফাকে নির্বিঘ্ন রাখতে একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা তাদের বাজার ও প্রভাব বলয় বিস্তার করার প্রতিযোগিতায় সমগ্র পৃথিবীকে অশান্ত করে চলেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাজনিত পরিস্থিতি কয়েক দশকে বৃহৎ ধনী দেশগুলোতে এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যা শিল্প সেক্টরে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। শ্রমিকের অর্জিত সুবিধা কেড়ে নেওয়ার কারণে উন্নত-উন্নয়নশীল-অনুন্নত দেশে শ্রমিক-কৃষক-জনগণ প্রায়শঃই বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। অনেক ক্ষেত্রে সু-সংগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠছে, আবার অনেক ক্ষেত্রেই স্বত:স্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে উঠছে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে সংগঠিত নেতৃত্ব ও পরিকল্পিত কর্মসূচী না থাকায় বিক্ষোভ সমূহ ফেটে পড়ে নৈরাজ্যিক পরিবেশ তৈরী করছে।

মে দিবস এমন একটি দিবস যা শ্রমিককে তার করণীয় সর্ম্পকে দিক নির্দেশ করে। শ্রমিককে সংগঠিত হওয়ার প্রেরণা যোগায়। তাকে মনে করিয়ে দেয় সেই হচ্ছে নতুন সৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশের কারিগর। আমাদের দেশে সংগঠিত শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক অনেকটাই দুর্বল। শিল্প এবং শ্রমিক একে অপরের পরিপূরক। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটার অস্তিত্ব বিবেচনা করা যায় না। শিল্পোন্নত দেশ গুলোতে শ্রমিক শ্রেণী যখন তাদের প্রাপ্ত অধিকার বঞ্চিত হওয়া এমনকি ধর্মঘট করার মত মৌলিক অধিকারের উপর খড়্গ আসার বিপদ নিয়ে সেচ্চার তখন আমাদের দেশে শ্রমিকরা সংগঠিত হতে পারছেনা। আমাদের দেশ আই এল ও কনভেনশন অনুস্বাক্ষরকারী, কনভেনশন বলে শ্রমিকরা ইচ্ছা মাফিক তার পছন্দের ইউনিয়নে যোগ দিতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সে সংগঠন করতে গেলে তার চাকরী হারায়। অর্থাৎ বেশিরভাগ শিল্প উদ্যোক্তারা চান না যে তার শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সংগঠিত হোক। তাদের অনেকের যুক্তি হচ্ছে এরা ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বোঝেনা, ট্রেড ইউনিয়নকে ঘিরে মালিকদের ভয়। ভয় হচ্ছে শ্রমিকরা সংগঠিত হলে, তারা তাদের অধিকার সচেতন হলে মালিকদের কাছ থেকে তাদের দাবী এবং অধিকার নিয়ে দর কষাকষি করবে। ইচ্ছা মাফিক তাকে ঠকানো যাবে না।

শ্রমিকদের ভিতর বিদ্যমান ক্ষোভের আগুন যেকোন কৌশলে চাপা দিলে আগুন যদি বেরোনোর পথ না পায় তাহলে তাতে বিস্ফোরণ ঘটে সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নই পারে

শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করতে। দারিদ্রের কষাঘাতে গ্রাম থেকে উঠে আসা শ্রমিক বিশেষত আজকের দিনে গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মে নিয়োজিত অধিকাংশ নারী শ্রমিক কর্ম ক্ষেত্রে এসে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। একদিকে বেঁচে থাকার তাগিদে অতিরিক্ত কর্ম ঘন্টা কাজ করে পরিশ্রান্ত হয়ে সংগঠিত হওয়ার জন্য তার যে তৎপরতা তার সময় প্রায়ই কম। অন্য দিকে সংগঠন করতে গেলে থাকে চাকরী হারানোর ভয় সহ নানাবিধ নির্যাতনের ভয়। তার ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠছে না। যার ফলশ্রুতিতে আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো প্রায়শঃই শ্রমিকদের বিক্ষোভ স্বত:স্ফূর্তভাবে ফেটে পড়ে যাকে মানবিক আচরণ দিয়ে সমাধান করার বদলে বিভিন্ন পর্যায়ে দমন পীড়ন দিয়ে বন্ধ করতে যেয়ে দেখা দেয় এক ধরনের নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির। এক কারখানার শ্রমিক অসন্তোষ সমাধান না পেয়ে, দমন পীড়নের শিকার হয়ে অনেক কারখানাকে এমনকি জন জীবনকেও বিপর্যস্ত করে ফেলে। সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে তারা প্রাথমিক পর্য্যায়েই অনেক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। সেই সমাধানের বিভিন্ন আইনী ব্যবস্থা সমূহ সঠিকভাবে কার্যকরী করারও সুযোগ থাকে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে ছোট সমস্যাও বড় হয়ে দেখা দেয়। যাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয় ষড়যন্ত্র/চক্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন নামে।

এদেশের শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার এবং সু-সংগঠিত আন্দোলন গড়া এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এদেশের সর্বস্তরের মানুষই জানে। শ্রমিক আন্দোলনে প্রতিশ্রুতিশীল, দায়িত্ববান ও আদর্শিক নেতৃত্বের অনেকেই লেখাপড়া শেষ করে নিঃস্বার্থভাবে শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছেন। শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন করার প্রতিশ্রুতিশীল একঝাঁক সাহসী নিবেদিত প্রাণ শ্রমিক নেতৃত্ব ছাড়া শ্রমিকদের দায়িত্বশীল সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনা।

আজকের পৃথিবীতে একচেটিয়া পুঁজির নির্মম শোষণকে, বাজারে প্রভাব বলয় নিয়ে প্রতিযোগিতাকে মোকাবেলা করতে গেলে মে দিবসের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার ও দাবী প্রতিষ্ঠা, সকল ধরণের শোষণ, জুলুম এবং নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার এ লড়াইয়ে আসুন আমরা সততার সাথে সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হই।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

উৎপাদনশীলতায় দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক সংলাপের গুরুত্ব

কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ
শ্রম উপদেষ্টা
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
এবং অবসরপ্রাপ্ত শ্রম পরিচালক।

যে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা-বাণিজ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ ও পুঁজির যথোচিত ব্যবহার এবং পেশাদারিত্ব। বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে এত বেশি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে যথোচিত, কাঙ্খিত ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের দক্ষতা ও পারদর্শিতা উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা অবারিত ও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, যতক্ষণ না দক্ষতার মান পাশ্চাত্যের শ্রমজীবীর দক্ষতার মানের সব পর্যায়ে না আসে। কারণ দেশে ও বিদেশের বাজারে পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নির্ভর করে পণ্যের গুণগত মান, উৎকর্ষতা ও উৎপাদন ব্যয়ের ওপর এবং এ অর্জন তখনই সম্ভব, যখন শ্রমিকের প্রায়োগিক জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা আশান্বিত হয় এবং উৎপাদনশীলতার পরিমাণ গুণসম্পন্নভাবে বৃদ্ধি পায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থ ব্যতীত শিল্প সৃষ্টি হয় না; তেমনি শ্রম ব্যতীত বা মানুষের সম্পৃক্ততা ব্যতীত শিল্প উৎপাদনশীল বা অর্থকরী হয় না। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় বা স্বতশ্চালিত যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন স্বতশ্চল হচ্ছে বটে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও মনুষ্য স্পর্শ একান্ত অপরিহার্য। সুতরাং উৎপাদনের সব স্তরে মানুষের যেমন স্পর্শ প্রয়োজন, তেমনি সে মানুষের নিপুণতা ও ফলিত জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রযুক্তির উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা শিল্পোন্নয়নের জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব ও বিচক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা। বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে শ্রমিকের দক্ষতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার বিচক্ষণতা অপরিহার্য।

আমরা দেখতে পাই মানবগোষ্ঠীকে সমাজে বহুবিদ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ চাকরির সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। সুতরাং জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে রাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রকে দূরদর্শিতাপূর্ণ বা পরিণামদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীকে চাকরির সহায়তার মাধ্যমে অর্থাগমের ব্যবস্থা করা যায়। কারণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড- প্রসারিত হলে অর্থের সমাগম বৃদ্ধি পায়, জনকল্যাণে সে অর্থ ব্যয় করা যায়, বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ হয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এতদ্ব্যতীত, মানুষকে কর্মে নিয়োজিত করা যায়। যেহেতু নিয়োজিত ব্যক্তিদের দক্ষতা, নিপুণতা ও ফলিত জ্ঞান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য, সেহেতু দক্ষতা উন্নয়নের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

জনশক্তি বা শ্রমশক্তিকে সঠিক ও ফলপ্রসূভাবে ব্যবহারের জন্য তাদের অধিকার, সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা, কল্যাণ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। উপযুক্ত মজুরি, অধিকাল কর্মের ভাতা, ছুটি, বিশ্রাম, উৎসাহ ভাতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, প্রসূতি কল্যাণ ভাতা, নিরাপত্তাপূর্ণ কর্মপরিবেশ, চিকিৎসা, দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ, সংগঠন করার

অধিকার, ভবিষ্য তহবিল, দরকষাকষিসহ বহুবিধ বিষয় বিদ্যমান, যা কেবল অর্থ দিয়েই পূরণ করা যায় না। আলোচনার মাধ্যমে বিনা অর্থ ব্যয়ে এ বিষয়াদির অনেকাংশই সহজভাবে সমাধান করা যায়। উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে জ্ঞানচর্চা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ এক বিশেষ ধরনের প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সামাজিক সংলাপের প্রক্রিয়া অপরিহার্য। সামাজিক সংলাপ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার একটি বস্তুনিষ্ঠ কৌশল, যার মাধ্যম উৎপাদনশীলতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও সোভন কাজের উন্মেষ ঘটানো যায়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সামাজিক সংলাপের একটা সংজ্ঞা দিয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা নিশ্চিত করার জন্য সমভাবে ভোগ্য এমন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে ঐকমত্যে আসার জন্য আলোচনা, পরামর্শ বা তথ্যবিনিময়ের উদ্দেশ্যে সরকার, মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করা। এ সামাজিক সংলাপ দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় বা ব্যাপক ত্রিপক্ষীয় হতে পারে। সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে বহু বিস্তৃত ঐকমত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা উদ্ভূত যেকোনো প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়।

অতীতে কর্মপরিবেশ, মজুরি ও অন্য বিষয়াদি নিয়ে প্রধানত মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিতর্ক হতো এবং যখন দ্বিপক্ষীয় সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিরসন সম্ভব হতো না, তখন সরকার কর্তৃক হস্তক্ষেপ করে সমঝোতার মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হতো। যা-ই হোক, আজকের দিনে বহু দেশে মালিক ও শ্রমিকদের সাথে সরকার কাজ করছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে সমঅর্জন পরিকল্পনা ও কৌশল উন্নয়ন করা, যাতে কর্মক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়। এ ছাড়া এর মাধ্যমে শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, শ্রমিকের নিরাপত্তা ও পারিতোষিকের উৎকর্ষ বিধান করা যায় এবং পরিশেষে বিশ্বের অর্থনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধনীসহ) এর চতুর্দশ অধ্যায়ে সামাজিক সংলাপের (Social dialogue) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় সংলাপের মাধ্যমে শিল্পবিরোধ সহজেই নিরসন করা যায়। এ পদ্ধতি উন্নত চিন্তাধারার ফসল। আন্তর্জাতিক বিশ্বে এ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে ফলে শিল্পবিরোধ কদাচিত জটিল রূপ ধারণ করে। সামাজিক সংলাপের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় ১৯৪৯ সালের জুন মাসে জেনেভায় আহূত ৩২তম গভর্নিং বডির বৈঠকে যৌথ দরকষাকষির অধিকার সম্পর্কিত নীতিমালার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং এর ভিত্তিতে ১৯৪৯ সালের ১ জুলাই ৯৮ নম্বর কনভেনশন গৃহীত হয়। বাংলাদেশ এ কনভেনশনটি ২২ জুন ১৯৭২ অনুসমর্থন করে। এ অনুসমর্থিত কনভেনশনের বিধান অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার শ্রম আইনে যথোপযুক্ত বিধান প্রণয়ন করেছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ শ্রম আইনের এ বিধান অনুসরণ করে সামাজিক সংলাপ করলে শিল্পে যেকোনো বিরোধ নিরসনে সহায়ক হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকের দক্ষতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সামাজিক সংলাপ শিল্পের উন্নয়নে প্রভূত অর্থযুক্ত।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

ট্রেড ইউনিয়নেরও প্রয়োজন বিশ্বায়নের ঃ

জেড,এম,কামরুল আনাম
সম্পাদক, শ্রমিকের ডাক

বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির চালিকা শক্তি যা এখন প্রত্যেককে প্রভাবিত করছে। বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছর পূর্বে বহু জাতিক কোম্পানীর সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার এবং তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছিল দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার, যা আজ বৃদ্ধি পেয়ে ষাঁট হাজারে উন্নীত হয়েছে এবং তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সাত লক্ষেরও বেশী। যেখানে বর্তমানে ১২৫ মিলিয়নেরও বেশি শ্রমিক কাজ করছে। বিশ্বায়ন-বস্ত্র, পোষাক এবং জুতা কারখানার চেয়ে অন্য কোথাও বেশী দৃশ্যমান হয় না। যেখানে মাত্র ৩০টি জাতির বাজারে রপ্তানীর জন্য ১৬০ টি দেশে উৎপাদন কার্যক্রম চলে থাকে।

আমরা যে কোন একটি তৈরী পোষাক পরিধান করে থাকি, যাই উৎপাদনে অবদান রাখে ১০ টিরও বেশী ভিন্ন ভিন্ন দেশ। উদাহরণ স্বরূপ ঃ তূলা উৎপাদন হয় সেনেগালে, সুতা কাটা হয় পাকিস্তানে, পোষাক বোনা হয় বাংলাদেশে, কাপড় কাটা হয় জার্মানীতে, সেলাই হয় তিউনিসিয়া, সুতা আসে আয়ারল্যান্ড থেকে, চীন থেকে আসে বুতাম, ইন্দোনেশিয়া থেকে লেবেল, মোড়ক তৈরী হয় মেক্সিকোতে এবং পোষাক সম্পূর্ণ হয় মাল্টাতে।

এ ছাড়া উৎপাদনের একটি বিরাট অংশ উৎপাদিত হয় ফ্রি ট্রেড জোনে, যেখানে জাতীয় শ্রম আইন প্রয়োগ হয় না অথবা নিয়োগকর্তা/ কর্তৃপক্ষ শ্রম আইন মানে না। এ ধরণের এলাকায় ২৭ মিলিয়নেরও বেশী শ্রমিক নিয়োজিত আছে।এ প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে এবং মৌলিক শ্রম অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাবের কারনে এই সেক্টরের শ্রমিকদের উপর বিরাট প্রভাব বিদ্যমান।

বিশেষ করে স্বল্প মজুরী ও দীর্ঘ কর্মঘন্টা অতি সাধারণ ব্যাপার। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের গার্মেন্টসের সেলাই কাজে মহিলারা দিনে ১৫ ঘণ্টা, সপ্তাহে সাত দিন কাজ করে মাসিক ৭০ ইউএস ডলারেরও কম মজুরী পায়। কম্বোডিয়াতে কিশোর কিশোরীগণ ক্লান্তি ও অপুষ্টি জনিত কারণে তাদের সেলাই মেশিনের উপর পড়ে মারা যায়।

আরো খরচ কমাতে নিয়োগ কর্তাগণ শিশু শ্রমিক ব্যবহার করে থাকেন । এদের অনেকের চেহারা থাকে মলিন, উকুন তাড়াতে মাথা ন্যাড়া করা হয়, ব্যাপকভাবে হাটুর নীচ থেকে পুরো শরীর থাকে অসুস্থতায় ভরা, শারিরীক বর্ধন হয় অর্ধেক এবং পাকিস্তানে এদের প্রতি দু'জনের একজন ১২ বছরের বেশী বাঁচেনা ।

অতীতে এশিয়া ও মধ্য আমেরিকাতে এ ধরণের অবস্থা ছিল সাধারণ। বর্তমানে এ অবস্থা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ও দৃষ্টি গোচর হতে শুরু করেছে। যদি শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার উদ্দেশ্য থাকে অথবা চেষ্টা করে তাহলে তাদেরকে হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন, এমন কি হত্যা পর্যন্ত করা হয়। বিগত কয়েক বছর আগে ইন্দোনেশিয়ায় ন্যূনতম মজুরী পরিশোধে নিয়োগকর্তা অস্বীকৃতি প্রদান করার প্রতিবাদে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কারনে জুতা ইউনিয়নের একজন তরুণ নেত্রীকে বেআইনীভাবে ৬ সপ্তাহেরও বেশী সময় ডিটেনশন দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ এর অভিযোগ আনা হয়।

বস্তুতঃ অনেক দেশেরই সিদ্ধান্ত/কর্মসূচী হল ট্রেড ইউনিয়ন মুক্ত ফ্রি ট্রেড জোন স্থাপন করা। এই চেষ্টাগুলোর পুরোভাগে আমেরিকা ও ইউরোপের বহুজাতিক কোম্পানী, পণ্য উৎপাদনকারী ও খুচরা বিক্রেতাগণ জড়িত।

অনুরূপভাবে তারা একদেশ থেকে অন্যদেশে তাদের কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছেন। যেখানেই তারা কার্যক্রমপরিচালনা করে সেখানেই তারা ইউনিয়নের স্থিতিশীলতা ও আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়। এ ধরনের অনেক কোম্পানী এখন ঠিকাদার (Contractors) এবং উপ-ঠিকাদার (sub-Contractors) দের মাধ্যমে কাজ করছে যদিও সরাসরি উৎপাদনের চেয়ে এটা অনেক ব্যয়বহুল। এর কারন অতি সাধারন যে, উপ-ঠিকাদারীর মাধ্যমে সার্বিক প্রায় সব কিছুই যোগান দেয়া সম্ভব এবং এর তেমন কোন দায় দায়িত্বই কোম্পানীর থাকে না। বর্তমানে গ্লোবাল ইউনিয়ন সংগঠনগুলোসহ ট্রেড ইউনিয়নগুলো প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হচ্ছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলো অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে এবং সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্বেও উন্নতি ঘটাতে হবে অন্যদিকে সৎ যোগ্য নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব নির্বাচনের মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্য যেন তাদের ইউনিয়নে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সক্রিয় অংশগ্রহন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও দরকষাকষি করতে এবং একটা বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ফলপ্রসুভাবে রক্ষার্থে তাদের কার্যক্রমকে বিশ্বায়ন মূখী করতে হবে। সে লক্ষ্যে ইউরোপিয়, মার্কিন, তাইওয়ানিজ, কোরীয়ান বহুজাতিক কোম্পানীগুলো সহ তাদের ঠিকাদারী (Contractors) ও উপ-ঠিকাদারী (sub-Contractors) এবং লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ও দরকষাকষির আওতায় নিতে হবে। তবে সাংগঠনিক কৌশল নির্ধারণে একটি লক্ষ্য অবশ্যই স্থির করতে হবে, যেখানে কোম্পানী রয়েছে এবং আমদানীকারক দেশ রয়েছে এবং প্রত্যেক বহুজাতিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কাঠামো তৈরী করে এর আওতায় প্রত্যেক বহুজাতিক কোম্পানীর সাথে যেন চুক্তি সম্পাদন করা যায়।

এখানে মূল করণীয় হল, "আন্তর্জাতিক কাঠামোতে চুক্তিগুলো অর্জন করার ক্ষেত্রে কোম্পানীগুলো ও ইউনিয়নগুলো আচরণবিধি পুরোপুরি ব্যবহারে আন্তর্জাতিক শ্রমমান মেনে চলতে বাধ্য করতে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে সম্পৃক্ত করা ও জবাবদিহীতায় আনা"। ইউনিয়নগুলোকে বিধি (Code of Conduct) প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ সমস্ত কোম্পানীদের দ্বারা পরিচালিত জনসংযোগের চেয়ে অবশ্যই অগ্রগামী হতে হবে। তারা উদ্বুদ্ধ করবে যে বিধি গুলো যেন আইএলও (ILO) কোর কনভেনশন এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো তাদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনার জন্য কোর কনভেনশন গ্রহন করে এবং তাতে পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে। তবে বিষয়টি বহিঃ যাচাই এবং এর প্রভাবের নিয়মিত মূল্যায়নের উপর নির্ভর করবে।

বিশ্বব্যাপী প্রতিটি দেশে মৌলিক শ্রম মানের কার্যকর বাস্তবায়নই মূলত এসব উদ্যোগের পরিপূরক তাছাড়া অন্য কিছু নয়। দুর্ভাগ্য যে অনেক সরকারই শ্রমিকদের মূল শ্রমমান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং আইএলও এ ব্যাপারে একটি ক্ষমতাহীন সংস্থা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। সেজন্য বিশ্বব্যাপী ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার্থে একটি নতুন কলেবর তৈরীতে আগ্রহী। যাতে বাণিজ্য হবে সংযোজিত ও শ্রমিকের অধিকার থাকবে সুরক্ষিত তবে যে দেশসমূহ এটি মানতে অস্বীকার করে সে দেশগুলো বিশ্ববাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে হবে প্রত্যাখ্যাত।

আন্তর্জাতিক সংহতির উন্নয়নের সাথে সাথে সকল ইউনিয়নগুলোর প্রয়োজন দমনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে শিশুশ্রম একটি উপযুক্ত উদাহরণ। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন শিশু শ্রমিক কাজে নিয়োজিত আছে। এদের অর্ধেকই কখনো স্কুলে যায়নি। অধিকাংশ ক্রীতদাসের চেয়ে নিম্নতর। তারা ৪ বছর বয়সে কাজ শুরু করে। তারা কখনো কখনো মজুরী ছাড়াই কাজ করে। তাদেরকে অনেক সময় মারা হয় যখন তারা কোন ভুল করে বা মায়ের জন্য কাঁদে। তারা সার্ট সেলাই করে, তারা কার্পেট বুনে, তারা সুতা কাটে, তারা বুটিকের কাজ করে এবং জুতা তৈরী করে। তারা এই শোষিত শ্রমিকের এক বিশাল বাহিনীতে পরিনত। বিশ্বব্যাপী শিশুশ্রম নিরসনের আন্দোলন সৃষ্টিই তাদের একমাত্র ভরসা।

ইউনিয়নগুলো চিরতরে শিশুশ্রম মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর অভিযানে যোগদান করছে। শ্রমিকদের অধিকারগুলোর অপব্যবহার রোধের উদ্দেশ্যে একইভাবে বিশ্বব্যাপী ইউনিয়নগুলো অভিযান চালাচ্ছে। এগুলো হলসংগঠনের স্বাধীনতা খর্ব, দাস শ্রমিক, বৈষম্য, বিপদযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র।

বিশ্বায়ন কর্তৃক উপস্থাপিত শ্রমিকদের অধিকারের ক্রমবর্ধমান এই অপব্যবহার গুলো কঠিন অবস্থা নির্দেশ করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রয়োজন ভবিষতে এই কঠিন অবস্থাগুলোর মোকাবেলা করা। একাজ করতে প্রয়োজন দ্রুত খাপ খাওয়ানোর সামর্থ যাতে আমাদের মুখোমুখি ক্রমাগত পৃথিবীর পরিবর্তনে পুনঃকাঠামো যা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং যা আরও দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ পরিবর্তন আরো বেশী হওয়া প্রয়োজন। ইউনিয়নগুলোকে অবশ্যই ভবিষৎ-এর দিকে তাকাতে হবে ও এমন কর্মসূচী এবং কাঠামো তৈরী করতে হবে যা এখন থেকে ভালভাবে ২০(বিশ) বছর পর্যন্ত তাদের সদস্যদের জন্য কাজ করবে। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে থেকে পরিবর্তন আসতে হবে। বস্তুতঃ ভবিষৎ-এর জন্য সংক্ষিপ্ত শ্লোগান হবে- স্থানীয় ভাবনা বিশ্ব কর্ম, বিশ্ব ভাবনা, স্থানীয় কর্ম "Think local, act global – think global, act local"। বিশ্বায়নের এ যুগে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তৈরী করা একটি জরুরী প্রয়োজন। ট্রেড ইউনিয়নের বিশ্বায়নের মাধ্যমেই সেই জরুরী মেটানো যেমনই সম্ভব তেমনই শ্রমিকের অধিকার আদায়ও সম্ভব হবে। যদি এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে শোষণ হবে অবাধ এবং শ্রমিকেরা সত্যিকারার্থে ইউনিয়ন মুক্ত বিশ্ব দেখতে পাবে। যা কোন ভাবেই শ্রমজীবী মানুষের কাম্য হতে পারেনা। সুতরাং এখন থেকেই সুদুর প্রসারী চিন্তা এবং কর্মসূচী গ্রহন প্রয়োজন।

"শ্রমিক–মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

মহান মে দিবস-লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা

আনোয়ার হোসেন খোকন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মটরযান মেকানিক ফেডারেশন

বিশ্ব সভ্যতার শুরু থেকে আমরা দুটি ধারা লক্ষ্য করি, একটি মালিক শ্রেণী অন্যটি শ্রমিক শ্রেণী। প্রত্যেক পক্ষ একে অন্যকে প্রতিপক্ষ মনে করে । এক প্রতি পক্ষ অন্য প্রতি পক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টাই অব্যাহত থাকে। তারা মনে করে না যে, একজন না থাকলে অন্যজন অক্ষম । আর না বুঝার কারণে আমরা দেখেছি অতীতে অনেক ঘটনা, যে ঘটনা গুলো শত শত বছর পরেও শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীকে স্মরণ করে দেয় । যেটা আমাদের কারো কাম্য নয়। সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হলো।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তার 'কুলি-মজুর' কবিতায় লিখেছেন- "তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাইল ধূলি তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান, তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান"সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোন এক মিলনের বাঁশি । 'সেই লাঞ্ছিত-বঞ্চিত কুলি-মজুরদের উত্থানের একটি পরম পর্ব হল 'মে দিবস'। মে দিবস হলো আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব সংগ্রামের গর্ভ থেকে উত্থিত একটি দিবস। কোনো একক দেশের নয়, এটি পৃথিবীর সব দেশের শ্রমিকদের 'দিবস'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব ঘটে দুই বিপরীত স্বার্থের ধারক দুটি শ্রেণী-পুজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যকার বৈরী দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নেয় শ্রেণী সংগ্রামের প্রক্রিয়া। মজুরি, কাজের সময়, নিরাপত্তা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় তীব্র দ্বন্দ্ব। প্রথমাবস্থায় শ্রমিকরা শ্রেণী হিসেবে ছিল অসংগঠিত ও অসচেতন। তাদের প্রতিরোধও ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ১৭৬০ সালে শুরু হয় 'লডাইড মুভমেন্ট'। শ্রমিকরা কারখানা ও যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে চুরমার করার মধ্য দিয়ে তাদের ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটাতে থাকে। ১৭৫৮ সালে ম্যানচেস্টারের তাঁত শ্রমিকরা প্রথম ধর্মঘট আন্দোলন শুরু করে। এসব আন্দোলন ক্রমে তীব্র হতে থাকে। শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলনের মুখে ১৭৯১ সালে ফ্রান্সে এবং ১৭৯৯ সালে ইংল্যান্ডে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু তাতে শ্রমিক আন্দোলনকে স্তিমিত করা সম্ভব হয়নি। ১৮৩১ সালে লিয়ন শহরে বস্ত্র শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে এবং ১৫ দিন শহরটি দখল করে রাখে। ১৮৩৪ সালে সেই শহরে আবার বিদ্রোহ হয়। এসব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রসারিত হয়। শুরুর দিকে শ্রমিকদের কাজের কোনো সময়সীমা ছিল না। এক সময় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত -কে কাজের সময় হিসেবে নির্ধারিত হয়। কোনো কোনো কারখানায় ১৯-২০ ঘণ্টাও কাজ করানো হতো। ১৮২৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন অফ মেকানিক্স' ইহা পৃথিবীর প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন ১০ ঘণ্টা কাজের দাবীতে ধর্মঘট করে। ১৮৪৭ সালে ইংল্যান্ডে '১০ ঘণ্টা কাজ'-এর নিয়ম প্রতিষ্ঠা হয়। ন্যায্য মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে 'কাজের সময়' নির্দিষ্ট করে দেয়ার দাবিটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৮৪ সালের ৭ নভেম্বর 'আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার' ১৮৮৬ সালের মে মাস থেকে ৮ ঘন্টা কাজের নিয়ম চালু করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম, ৮ ঘণ্টা বিনোদন- এই স্লোগান ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৮৬ সালে ১ মে শিকাগো শহরে শ্রমিকরা '৮ ঘণ্টা কাজের' দাবীতে ধর্মঘট করে। ৩ লাখ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। পরদিন ২ মে রোববার ছিল বলে সে দিন কোনো কর্মসূচি ছিল না। রোববার দিনভর আন্দোলন প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী করে ৩ মে আরও ব্যাপক ধর্মঘট সংঘটিত হয়। সেদিন মালিকের গুণ্ডা ও পুলিশ হামলা চালিয়ে ৬ জন শ্রমিককে নিহত করে। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৪ মে শিকাগোর বিখ্যাত 'হে মার্কেটে' প্রতিবাদ

সমাবেশ ডাকা হয়। সেদিন বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের একবারে শেষ পর্যায়ে সরকার ও মালিকদের গুপ্তচররা হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। ছদ্মবেশী সরকারী এজেন্টদের বোমা হামলায় ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তুলে পুলিশ নির্বিচার গুলি চালায়। ৪ জন শ্রমিক নিহত হন ও শতশত আহত হন। হে মার্কেটে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। ১৮৮৬ সালের মে মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটের মূল দাবি ছিল ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ওই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৪ মে হে মার্কেট স্কোয়ারের বিশাল সমাবেশ মালিক ও সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর নির্বিচারে লাঠিচার্জ ও গুলিতে শ্রমিকের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল হে মার্কেট চত্বর। আমেরিকার শ্রমিকদের এই আন্দোলন সেই দেশে ও একই সঙ্গে পৃথিবীর দেশে -দেশে ছড়িয়ে পড়ে।আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। অবশেষে, এই আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন স্থানে মালিকেরা বাধ্য হয়ে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবি মেনে নিতে শুরু করে। সেখানেই পাশাপাশি অনুষ্ঠানরত সোশ্যালিস্ট লেবার ইন্টারন্যাশনালের সম্মেলনে জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের ঘোষণা অনুযায়ী ১৮৯০ সালে থেকে প্রতিবছর ১ মে; মে দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এভাবেই আন্তর্জাতিক মে দিবস পালনের সূচনা হয়। নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে জাঁক-জমকের সঙ্গে মে দিবস পালিত হলেও বাংলাদেশে এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা শ্রমের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তারা পায়নি উপযুক্ত মজুরী ও মর্যাদা।

১৮৮৬ সাল থেকে ২০১৫ সাল, মাঝখানে কেটে গেছে একশত উনত্রিশ বছর। শিকাগো শহরের হে মার্কেট থেকে যে আগুনের শিখা জ্বলেছে তা দিনে দিনে শহরে শহরে ছড়িয়েছে। দেশে দেশে আনুষ্ঠানিকতায় যেমন পালিত হয় মে দিবস, তেমনি চেতনায় ধারণের শপথ গ্রহণ করা হয়।

আমরা শ্রমিক, আমারা স্ব স্ব যোগ্যতায় অবদান রাখছি দেশের অর্থনীতিতে। এই অস্বাভাবিক জীবন আর নিত্যকার শোষণের পরেও আমার বেঁচে থাকার গ্যারান্টিই চাই। তোমরা মালিক হতে পারো কিন্তু মনে রেখো শেষ বিচারে আমরা হয়ত কোনদিনও মালিক হতে চাইব না, শুধু হতে চাইব একজন মানুষ: সত্যিকার অর্থেই মানুষ! বাংলাদেশে ১ মে শ্রমজীবী মানুষের দিবস হিসেবে পালিত হলেও এ দেশে শ্রমিক শ্রেণীর জীবন নিরাপদ নয়। পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্প। ৪০ থেকে ৪৫ লাখ শ্রমিক এ শিল্পে কর্মরত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পোশাক শিল্পে কাজ করতে গিয়ে অতীতে শ্রমিকদের বড় বড় দুর্যোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে।

এই জন্য আমাদের শ্রমিকের যথাযথ মূল্যায়ন করে , শ্রমিককে সম্পদ হিসাবে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এই দেশে অল্প পারিশ্রমিকে শ্রমিক পাওয়া যায়, যা বিশ্বের কোন দেশে এই ধরণের নজির খুব কম। ফলে শ্রমিকের সঠিক মূল্যায়ন করে তাদের কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নের ধারা ধরে রাখা আমাদের উচিত বলে মনে করি।

আজ বাংলাদেশে পোষাক শিল্প, বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক, মটর মেকানিক, পরিবহনসহ পরিসংখ্যা করলে দেখা যাবে জনংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ শ্রমিক। আর এই বিপুল সংখ্যক জন বলকে অবমূল্যায়ন করে আমরা যদি উন্নয়নের বা সভ্যতার কথা চিন্তা করি তাহলে ভুল হবে। আমাদের শ্রমিকদের যদি প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন করে দেশে ও বিদেশে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। সাথে সাথে তাদের সকল সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করলে এই শ্রম শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। তা না হলে আমরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হব। শ্রমিক মালিক সম্পর্ক থাকবে বন্ধুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগে গ্রহণ করে, বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাব মূর্তিকে ভালো ভাবে তুলে ধরা সহজ হবে এবং বাংলাদেশকে একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হবে। সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভুমিকা পালন করাই সরকারের মূল কাজ। আমরা বিগত কয়েক বছর সরকারের আন্তরিকতা দেখেছি তবে আরো বেশী আন্তরিকতা আশা করি। শ্রমিকদের ন্যায্য-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা না দিলে দেশ জাতির কোন দিন উন্নয়ন সাধিত হবে না। মে দিবস উদযাপন সত্যিকার অর্থে সফল হবে যেদিন সকল শ্রমিক, সকল পেশার শ্রমজীবী তাদের অধিকার লাভ করবে। যাদের শ্রমের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই সভ্যতা, সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নে তাদের অধিকার নিশ্চিত হলেই মে দিবস পালনের স্বার্থকতা খুজে পাওয়া যাবে। আমরা সেদিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন শ্রমিকদেরকে অধিকার আদায়ের জন্য আর কাজ ফেলে রাস্তায় নামতে হবে না।

মহান মে দিবস ও শিল্প বিরোধ উত্তরণ

মোঃ আব্দুর রশীদ
যুগ্ম-শ্রম পরিচালক
জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ
ইউনিট, শ্রম পরিদপ্তর, ঢাকা।

মহান মে দিবস শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মে দিবস বিশ্বের শ্রমিকদের পারস্পরিক একাত্মতা ঘোষণা আর সমৃদ্ধ জীবনের লক্ষ্যে সুদৃঢ় শপথ গ্রহণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। শোষণ নয় সহমর্মিতাই যে যথার্থ মানবিক গুণ তা মে দিবসের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশমান। পুঁজিবাদী শোষণের নির্মমতার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মে দিবস ছিল প্রাথমিক বিজয়। শ্রমিকদের রক্তের বিনিময়ে বিশ্বে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যে ইতিহাস রূপায়িত হয়েছে তার সঙ্গে মে দিবসের চেতনা জড়িয়ে আছে । মে দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে শ্রমিক সম্প্রদায়ের বিজয় ঘোষিত হয়। এ বিজয়ের পথ ধরেই শ্রমিক সম্প্রদায় সারা বিশ্বে অনেক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকদের রক্তপাতের মাধ্যমে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণী মে দিবসকে মুক্তির দিশারী হিসেবে গর্ব ও প্রত্যয়ের সঙ্গে পালন করে আসছে। এর ফল হিসেবে এসেছে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, দর কষাকষির সংগ্রামে ধর্মঘট করার অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার যা আজ বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত। শ্রমিক সম্প্রদায়ের পথ ধরেই বিশ্বের কয়েকটি দেশে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মে দিবসের এই চেতনার ফলেই কোন কোন দেশে শ্রমিক শ্রেণী চূড়ান্ত- বিজয় অর্জন করে সমাজ ব্যবস্থায় এনেছে রূপান্তর। আবার কোন কোন দেশের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও আন্দোলন তাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা ও অধিকারকে বহুদূর পর্যন্ত সংহত করেছে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" –এই শ্লোগান সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে যেমন একতাবদ্ধ করেছে, তেমনি অধিকার আদায়ের জন্য দিয়েছে সীমাহীন প্রেরণা।

বাংলাদেশের নাগরিকও বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর সাথে সংহতি প্রকাশ করে এই দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করছে। এ দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে শিল্প বিরোধও সম্পৃক্ত । বাংলাদেশে বিদ্যমান শিল্প বিরোধ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর তা করতে পারলে শিল্প বিরোধ সম্পূর্ণ ঠেকাতে না পারলেও কিছুটা অন্তত প্রশমিত করতে পারে ।

শিল্প বিরোধ উত্তরণের উপায়সমূহ হলোঃ

১। শ্রমিকদের প্রতি সঠিক মনোভাব (Appropriate Attitude to Workers) ঃ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যদি শ্রমিক কর্মীদের সঙ্গে সঠিক মনোভাব প্রদর্শন করে তাহলে শিল্প বিরোধ অনেকটা কমে যায় । নিম্ন পর্যায়ের শ্রমিক কর্মীদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও মূল্যবোধের স্বীকৃতি দেওয়া হলে তারা ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য । তাই তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ পরিহার করে মানবীয় সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। সঠিক মজুরী কাঠামো নির্ধারণ (Determing Proper Wages Structure) ঃ বাংলাদেশে শ্রমিকদের মজুরি স্কেল বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখা প্রয়োজন। সরকার প্রদত্ত বেতন ও মজুরি কাঠামোতে ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা থাকে । কিন্তু লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত কমে যাচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে না মজুরি, দ্রব্য ও সেবার যোগান । বেতন ও মজুরি কাঠামো নির্ণয়ে জীবন ধারণ উপযোগী কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

৩। কার্য পরিবেশের উন্নয়ন (Development of Working Condition) ঃ বাংলাদেশের শিল্প কারখানার অভ্যন্তরে কার্য পরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত কিনা তাও দেখা প্রয়োজন। কর্ম পরিবেশের উন্নয়নের দাবিতে অনেক সময় শ্রমিকরা আন্দোলনে নামে। কর্ম পরিবেশ উন্নত করা হলে শ্রমিকদের অসন্তোষ বহুলাংশে হ্রাস পায়।

৪। উন্নত শিল্প সম্পর্ক (Improved Industrial Relations) ঃ উন্নত শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখতে পারলে শিল্প বিরোধ অনেকাংশে দূরীভূত হয়। সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানের কাজে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। এতে কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং শ্রম ঘূর্ণায়মানতা হ্রাস পায় । তবে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য শিল্প স্বেচ্ছাচারিতা দূর করে শিল্পীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে দরকষাকষি, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা, কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি (Increase in Self Consciousness) ঃ শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে আত্মসচেতনতাবোধ জাগ্রত করতে পারলে শিল্প বিরোধ অনেকাংশে নিবারণ করা যায়। এরূপ মনোভাব সৃষ্টির জন্য শ্রমিক কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকরা যখন আত্মসচেতন হবে তখনই শিল্প বিরোধ হ্রাস পেতে থাকবে।

৬। শ্রমনীতি (Labour Policy) ঃ শ্রমিক অনুকূল শ্রমনীতি শিল্প বিরোধ নিরসনে সহায়ক। শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে শ্রমনীতি এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন শিল্প বিরোধকে প্রশমিত করে।

৭। দক্ষ ব্যবস্থাপনা (Efficient Management) ঃ পেশাজীবী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাগণকে শুধু উৎপাদন কলা-কৌশলে পারদর্শী হলেই চলবেনা, তাদেরকে লোক ব্যবস্থাপনা, মানবীয় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও পারদর্শী হতে হবে। এ জন্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। অভিযোগের প্রতি সুদৃষ্টি প্রদান (Giving Attention to Complain) ঃ শ্রমিক কর্মীরা অনেক সময় বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে ব্যবস্থাপকদের শরণাপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় ব্যবস্থাপকদের উচিত অভিযোগের প্রতি সুদৃষ্টি প্রদান করা এবং অতি দ্রুত সেই অভিযোগের সুষ্ঠু প্রতিকার করা । এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হলে শিল্প বিরোধ বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

৯। স্বজনপ্রীতি দূরীকরণ (Removing Nepotism) ঃ স্বজনপ্রীতি এবং প্রিয় তোষণ পরিহার করতে পারলে শিল্প বিরোধ কমানো যায়। কারণ কর্মী নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতিতে স্বজনপ্রীতি দেখা দিলে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় । এ ধরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আস্তে আস্তে শিল্প বিরোধকে উৎসাহিত করে। ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে পারলে শিল্প বিরোধ হ্রাস পাবে।

১০। প্রণোদনা দান (Motivation) ঃ ব্যবস্থাপকদের উচিত কর্মীদের মতামতের মূল্য দেয়া । তাদের মন, মস্তিস্ক ও পেশি সবই যেন প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে ব্যয় করা হয় এরূপ উপলব্ধি ঘটাতে হবে। শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে প্রণোদনা প্রদান করা গেলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আনুগত্য ভাব জাগ্রত হবে। নিছক বেতন ছাড়া কর্মীরা তত্ত্বাবধায়কদের কাছ থেকে সুন্দর ব্যবহার, কাজের স্বীকৃতি দান, আত্ম উন্নতির সুযোগ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা পেতে চায়। এতে শ্রম ব্যবস্থাপনা বিরোধ হ্রাস বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে ।

১১। গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন (Establishing Research Center) ঃ বিভিন্ন কারণে শিল্প বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ সব দ্বন্দ্ব ও বিরোধের কারণ খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থায় বিরোধের কারণসমূহ শনাক্ত করে তার প্রতিকার করা গেলেই শিল্প বিরোধ কমে যাবে।

১২। শ্রম আইন সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি (Labour Consciousness about Labour Law) ঃ বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকরা অশিক্ষিত। শ্রম আইন সম্পর্কে তাদের ধারণা কম, সুস্থ মনোভাব গঠনের লক্ষ্যে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রম আইন সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে যাতে নিজেরাই নিজেদের দাবি আদায়ে সচেষ্ট হয়।

১৩। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা (Establishment of Justice) ঃ প্রতিষ্ঠানের একক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। কর্মী নির্বাচন, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া আইন শৃংখলা রক্ষায়ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।

১৪। শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন (Strong Trade Union) ঃ ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে শক্তিশালী করার প্রয়াস নিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। সুষ্ঠু দরকষাকষি প্রক্রিয়ায় তাদের অনুপ্রেরণা দিতে হবে। আন্ত:ইউনিয়ন দ্বন্দ্ব পরিহার করতে হবে। সরকার, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সকলকে সচেষ্ট হতে হবে যেন দেশে শক্তিশালী সুস্থ এবং ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে।

১৫। শ্রম আইনের সংশোধন (Amendment of Labour Laws) ঃ শ্রমিকদের কল্যাণ শ্রম আইন দ্বারা প্রভাবিত। সংগঠনের একতা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় শ্রম আইন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের শ্রম আইনের উৎস হচ্ছে ব্রিটিশরাজ প্রনীত তদানীন্তন নিয়মাবলী। পাকিস্তান আমলেও শ্রম আইনের তেমন কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি, সময় ও চাহিদার বিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধনকৃত এতে শ্রমিক কল্যাণ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মহান মে দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সংহতিপ্রকাশ এবং তাঁদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপনসহ শ্রমিকদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে সকল পরিস্থিতিতে শান্ত থেকে শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যে কোন প্রকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলার পরামর্শই দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে।

শিল্পে শান্তি ও অধিক উৎপাদনই হউক এবারের মহান মে দিবসে শ্রমিক-মালিকসহ সকলের অঙ্গীকার এবং অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার দৃঢ় শপথে বলীয়ান হয়ে সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হওয়াই এখন সময়ের দাবি।

কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক বাংলাদেশ এবং মহান মে দিবস

মোঃ খোরশেদ আলম
যুগ্ম শ্রম পরিচালক
খুলনা বিভাগ, খুলনা।

ষোল কোটি জনগোষ্ঠির বাংলাদেশ। এক সময় বলা হতো কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষির সাথে শিল্পের ভূমিকাও রয়েছে অপরিসীম। বিশাল এ জন গোষ্ঠির উন্নয়নে বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে দেশকে বিশ্বের দরবারে দাঁড় করানোর জন্য কৃষির সঙ্গে শিল্পের অগ্রগতি অপরিহার্য। বিশ্বের যে সকল দেশ উন্নত হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, তাদের উন্নতির পেছনে রয়েছে শিল্পের অবদান। বাংলাদেশও তাদেরকে অনুকরণ করে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি সাধন করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প, পাট শিল্প, চিংড়ি শিল্প ও চা শিল্পের অবদান উল্লেখযোগ্য। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রেও এ সকল শিল্পগুলোর ভূমিকা কম নয়। তাছাড়া, টেক্সটাইল, রোলিং মিল, স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, পেপার মিল গুলোও দেশের চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্প সেক্টরের কতিপয় প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করতে হয়। কৃষি ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম যে জিনিসটি বিশেষ প্রয়োজন সেটি হলো পানি। এই পানি নিয়ে প্রতিবেশী দেশের অসম বন্টন আমাদের কৃষিকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। সময়মত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পানি হলো কৃষির প্রাণ। এ সময়ে পানি দিতে না পারলে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। তবে আমাদের কৃষিবিদ ও কৃষকগণ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেচের মাধ্যমে এ সমস্যা অনেকটা সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। একইভাবে শিল্প ক্ষেত্রেও রয়েছে অনেক প্রতিবন্ধকতা। এর মধ্যে পোশাক ও পাট শিল্পে প্রভাব বেশী রয়েছে। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প হলো অন্যতম। বিদেশী রাষ্ট্র সমূহ পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ কিছু শর্ত আরোপ করে রপ্তানী ক্ষেত্রে অনেক বাধাগ্রস্থ করেন। ফলে এ শিল্পের মালিকগণ নতুন শিল্প তৈরীতে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। অবশ্য এ অবস্থার উন্নতির জন্য সরকার আন্তরিক রয়েছেন। অন্যদিকে পাট শিল্পের ক্ষেত্রে রয়েছে মন্দাভাব। এই মন্দাভাব কেটে বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রচার আবশ্যক, তাই সরকারকে এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সরকারের নীতি নির্ধারণ করা আবশ্যক। কৃষি এবং শিল্প উভয়ের অগ্রগতি দেশের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে কৃষি অথবা শিল্প যেটাই বলিনা কেন উভয় ক্ষেত্রেই মূল উপাদান হলো শ্রমিক। যে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের অবস্থা ভাল, ধরে নেয়া যায় ঐ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক অবস্থাও ভাল। শ্রমিকের অবস্থা ভাল বলতে ন্যায্য মজুরী যথা সময়ে প্রদান করা। দ্বিতীয়টি হলো কাজের সময় নির্দিষ্ট করা। এই দুটো বিষয় যে প্রতিষ্ঠানে ঠিক থাকে সে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরাও মালিককে যথাযথ সম্মান করে এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রম পরিস্থিতি ভাল থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানে আসে কাঙ্খিত ও মান সম্মত উৎপাদন। এখানে দেখা যায় দু'টি বিষয়ই উভয় ক্ষেত্রে শান্ত রাখে এবং উন্নতির দিকে ধাবিত করে। কাজের সময় নির্ধারণ ও সঠিক সময়ে ন্যায্য মজুরী প্রদান। এই দু'টি বিষয়েই আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই আল্লাহ্‌র রসুল (সঃ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একজন লোক দিনে কত ঘন্টা পরিশ্রম করবে তার স্পষ্ট ঘোষণা করেন। তিনি বলেন তোমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৮ ঘন্টা কাজে ৮ ঘন্টা বিশ্রামে এবং ৮ ঘন্টা ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ব্যয় কর। এতে দেখা যায় আল্লাহর রাসুলই কাজের সময় ঘন্টা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ বলেছেন শ্রমিকের মজুরী ঘাম শুকানোর আগেই পরিশোধ কর। অর্থাৎ মজুরী পরিশোধের সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে জন্যই ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়। মহান আল্লাহ পাকই ইসলামকে পরিপূর্ণ ধর্ম ঘোষণা করেন। আমরা এই বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন না করার কারনে যত দূর্গতি এবং যত অশান্তি।

বাংলাদেশ তথা পাক ভারতের জন্য ১৮৭৪ সালের পূর্বে কোন শ্রম আইন ছিল না। ১৮৭৪ সালে আমেরিকার এক সিনেটর ভারত উপ-মহাদেশের জন্য একটি খসড়া শ্রম আইন প্রস্তাব করলে ১৮৮১ সালে প্রথম শ্রম আইন পাস হয়। যেখানে কাজের ঘন্টা ছিল ১৪। পর্যায়ক্রমে আইন সংশোধন হয়ে আসে । সর্বশেষ ১৯৬৫ সালের কারখানা আইন এবং ২০০৬ সালের শ্রম আইনে কাজের ঘন্টা ৮ উল্লেখ করা হয়। যদিও ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকগণ আন্দোলন করে দৈনিক কাজের সময়কাল ০৮ ঘন্টা আদায় করে নেয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সে দেশের শ্রমিকগণ তখন থেকে তাদের দাবীর স্বীকৃতি পায়। কিন্তু আমাদের দেশের শ্রম আইন থাকলেও সকল ক্ষেত্রে এখনো এর প্রয়োগ হয়নি, তবে এর বাস্তবায়ন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আবশ্যক।

মজুরীর ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ৩৮টি শিল্প সেক্টরের ক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরী ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেন। এর মধ্যে গার্মেন্টস ও জুট সেক্টর উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সরকার গার্মেন্টস সেক্টরে সর্বনিম্ন মজুরী ১৬০০/- টাকা থেকে ৫৩০০/- টাকায় উন্নীত করেন এবং ইতোমধ্যে এর যথাযথ বাস্তবায়নও হয়েছে। কিন্তু জুট সেক্টরে ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানার জন্য ১৯৮৬ সালের পর ২০১৩ সালে নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করে গেজেট প্রকাশ করেন। এই গেজেট অনুযায়ী মালিক পক্ষ টাইম রেটের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করলেও পিস রেটের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। ফলে জুট সেক্টরের সার্বিক পরিস্থিতি অশান্ত রয়েছে। তবে এ অশান্তের আরও একটি কারন রয়েছে সেটি হলো আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা অব্যাহতভাবে কমে যাওয়া। তাই পাট সেক্টরের শ্রম পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে নিম্নতম মজুরীর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং একই সঙ্গে দেশে ও বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। কাজের ঘন্টা নির্ধারণ ও মজুরী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন সুন্দর উৎপাদনের সহায়ক। শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি, কারখানায় সুন্দর পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে মালিক পক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা করতে পারে এই ট্রেড ইউনিয়ন। অথচ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে মালিক পক্ষের যত আপত্তি, এক সময়ে সার্ভিস বই প্রদানেও মালিক পক্ষের আপত্তি ছিল। ইতোমধ্যে সার্ভিস বই প্রদানের উপকারিতা বুঝে ওঠায় মালিক পক্ষ অনুষ্ঠান করে সার্ভিস বই প্রদান শুরু করেছে। একইভাবে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সহায়তা করলে শ্রম পরিস্থিতির উন্নতিতে এরা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

১৮৮৬ সালে শ্রমিকগণের আন্দোলনের ফলে ৮ ঘণ্টা কর্ম নির্ধারিত হলেও মজুরীর ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই আন্দোলন করতে হয় তাদেরকে। ফলে প্রতিটি আন্দোলনের সময়ে মে দিবসের অনুপ্রেরণাই কাজ করে আসছে। তাই মে দিবসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাইকে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার আঙ্গিকে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজের মাধ্যমে খোঁজ করতে হবে দিন বদলের মন্ত্র। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে একটি আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হতে হবে সকলকে।

ধন্যবাদ, আল্লাহ্ হাফেজ।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে

খান আখতার হোসেন
যুগ্ম শ্রম পরিচালক
রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ, রাজশাহী।

যুগ বদলেছে। সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করেই এগিয়ে চলেছে এযুগের নারীরা- এদেশের নারীরা। যে নারী একদিন ঘরের বাইরে আসতে সাহস পায়নি সেই নারী এখন আকাশে বিমান ওড়াচ্ছে, হিমালয়ের চূড়ায় উঠছে, বন্দুক কাঁধে যুদ্ধে যাচ্ছে, মাইন অপসারণ করছে, প্যারাসুটার হয়ে আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ছে, দেশ শাসনও করছে। ভাবা যায় এসব ? কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন নারীদের অবস্থান ছিল অন্তঃপুরে। কাজ ছিল ঘর সামলানো ও সন্তান মানুষ করা। এই ভারতবর্ষেই নারীরা নিগৃহীত হয়েছে বেশী। বৈদিকোত্তর যুগে নারীদের তিনটি রূপে দেখা হতো- কন্যা, জায়া, জননী। বৈদেশিকদের উপস্থিতি বেড়ে যাওয়ায় ভারত বর্ষের সমাজপতিরা নারীদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রতাকে নিয়মের বেড়াজালে বেঁধে ফেলেন। শুরু হয় সতীদাহ, বাল্য বিবাহ ও গৌরীদান। এযুগে নারীদের নয় বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ প্রথা চালু হয়। সঙ্কুচিত হয়ে আসে ভারতবর্ষের নারীদের শিক্ষার পথ। বিয়ে নারীর জন্য অবশ্য করণীয় আর সন্তান জন্মদান ও স্বামীসেবা ছিল প্রধান কাজ। স্ত্রীর কাছে স্বামী ছিল দেবতা বা প্রভূ। পর্দার মাঝে দিনাতিপাত করতো নারীরা। একমাত্র জাতীয় উৎসব বা শোকের সময় ছাড়া ঘরের বাইরে আসার অনুমতি দেয়া হতোনা এদের। এরপর আসে বৌদ্ধ যুগ। এযুগে গৌতম বুদ্ধের উদ্যোগে নারীদের অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোড়ামী যখন নারীদের কোনঠাসা করছে তখন গৌতম বুদ্ধ নারী মুক্তির ব্রত নিয়ে আসেন। সমাজের সব ধরনের কাজে নারীকে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেন। নারীদের উপর অত্যাচার করা অপরাধ হিসেবে গণ্য করেন। নারীদের অবাধ চলাচলের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেন। আগ্রহীদের জন্য শিক্ষার পথ উন্মোচন করেন। মৌর্যযুগে উচ্চবর্ণ নারীদের অবাধ বিচরণ ছিল নিয়ন্ত্রিত। এযুগে নারীরা কুন্দুক ক্রীড়া ও অক্ষ ক্রীড়ার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। চিকিৎসা ও সেবার ক্ষেত্রে নারীরা সাফল্য অর্জন করেন। এযুগে নারীদের সামরিক শিক্ষায়, গুপ্তচর বৃত্তিতে সুযোগ সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত সাহিত্য, সঙ্গীত রচনায় চিত্র শিল্প সৃষ্টিতে নারীরা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করে। এভাবে নারীদের উন্মেশ ঘটতে থাকে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নারীদেরকে সংস্কারমুক্ত, উদার ও মানবিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সময় এগিয়ে চলে। যার অর্জন আজ নারীরা পাচ্ছেন। সমাজের প্রতিটি কাজে তাদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার দিন সুদৃঢ় হয়েছে। নারীরা আজ হাতে তুলে নিয়েছেন সমাজ গড়ার সনদ। শ্রমের রাজ্যে নিজেদেরকে যোগ্য বলে প্রমাণ করেছেন। যার ধারাবাহিকতায় শ্রমে দিন দিন নারীর নিয়োগ বাড়ছে সরকারী বেসরকারী সর্বত্র। ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যবসায়ও নামছে নারী। শিক্ষায় বাড়ছে নারীর অংশগ্রহণ। দেশ পরিচালনার নীতি নির্ধারনী পর্যায় থেকে রপ্তানি আয়ের চাবিও এখন নারীদের হাতে। পোশাক শিল্পই এদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত। এশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ৮০ শতাংশের বেশী হচ্ছে নারী। দিন দিন শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েই চলেছে। নারী আজ বীরদর্পে পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে কাজ করছেন। নারীদের জয়জয়কার শ্রমের সর্বত্র।

প্রযুক্তিভিত্তিক লেনদেন সেবা প্রদানকারী বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান মাষ্টারকার্ডের এক জরীপে নিয়মিত কর্মসংস্থানে এশিয়া মহাদেশের ভেতর বাংলাদেশ প্রথম। নিয়মিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ১০২.৪ পয়েন্ট, দ্বিতীয় স্থানে থাকা চীনের স্কোর ৯৯.৪ পয়েন্ট, তৃতীয় স্থানে থাকা ভারতের স্কোর ৯৯ পয়েন্ট। ২০১৪ সালের দ্বিতীয় ভাগে মাষ্টারকার্ড বাংলাদেশসহ এশিয়া ও প্রশান্ত মাহসাগরীয় অঞ্চলে ১৬ টি দেশে 'নারী উন্নয়ন সূচক শীর্ষক' এক জরীপে এসব তথ্য উঠে আসে। বিগত ৯ বছরে নারীর

জরীপে দেখা যায় বিগত ৯ বছরে উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশের নারীদের সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি হয়েছে। ২০০৭ সালে যেখানে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৩১.৭ পয়েন্ট সেখানে ২০১৪ সালে তা বেড়ে ৭৬.৮ পয়েন্টে উন্নীত হয়েছে। প্রতিবেদনে নিয়মিত কর্মসংস্থানে বাংলাদেশে অগ্রগতি হয়েছে ২১.১ পয়েন্ট, চীনের ১৬ পয়েন্ট ও ভারতের ৩৯.৬ পয়েন্ট। এ দেখা যায় ১০টি দেশ উচ্চ শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়ায় পুরুষের তুলনায় নারী এগিয়ে। তবে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বেশিরভাগ দেশেই নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার বেশি থাকলেও ব্যবসায়িক নেতৃত্বে তারা পিছিয়ে আছে। ফিলিপাইন, নিউজিল্যান্ড ও থাইল্যান্ডে উচ্চশিক্ষিত নারীদের ব্যবসায়িক নেতৃত্বে সম্ভাবনা ভালো। একমাত্র দেশ হিসেবে ফিলিপাইনেই টানা ৯ বছর ধরে পুরুষের চেয়ে নারীরা এগিয়ে। কর্মসংস্থানে তারা জয় করেছে নিজেদের অবস্থান। নারীরা কাজ করছে ঘরে বাইরে সর্বত্র।

কর্মসংস্থান (মোট শ্রম শক্তির অংশ ও নিয়মিত কর্মসংস্থান), সক্ষমতা (মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষায়), নেতৃত্ব (ব্যবসার মালিকানা, ব্যবসায় নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব) এই তিনটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে এগিয়ে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। দেশটির সার্বিক স্কোর হচ্ছে ৭৭ পয়েন্ট। তৃতীয় ফিলিপাইনের স্কোর ৭২.৬ ও চতুর্থ সিঙ্গাপুরের স্কোর ৭০.৫ পয়েন্ট। এক্ষেত্রে পয়েন্ট তালিকার শেষে রয়েছে ভারত (৪৪.২ পয়েন্ট), বাংলাদেশ (৪৪.৬ পয়েন্ট) এবং শ্রীলংকা (৪৬.২ পয়েন্ট)। যাদের স্কোর ৫০ পয়েন্টের কম এসব দেশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে লৈঙ্গিক সমতা আনতে হলে নারীদের আরো অনেক উন্নতি করতে হবে। সামর্থ্যের দিক থেকে নারীদের স্কোর ১০০ পয়েন্ট পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড। অর্থ্যাৎ সামর্থ্যের দিক থেকে এসব দেশের নারীরা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী নারীরা পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে ভারতের স্কোর ৮৫.৭ পয়েন্ট, দক্ষিণ কোরিয়ার ৮৫.৯ পয়েন্ট এবং বাংলাদেশের ৮৭.৪ পয়েন্ট।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীরা আজ বিশ্বের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে। চমক সৃষ্টি করেছে কর্মের প্রতিটি স্তরে তারা চাকুরীর পাশাপাশি ব্যবসা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিগত ৯ বছরে থাইল্যান্ডের স্কোর ৬২.৭ পয়েন্ট।

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পণ্যসেবা উদ্ভাবনের জন্য নেতৃত্ব কাঠামোয় নারীরা এগিয়ে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ- সিপিডির এক গবেষণা পত্রে বলা হয়েছে অর্থনীতিতে অতিদ্রুত বিশেষ করে চাকুরি, ব্যবসায় নারীর সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণে দেখা যায় ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে ১৫.৮ শতাংশ, ২০০২-২০০৩ সালে ২৬.১ শতাংশ, ২০০৫-২০০৬ সালে ২৯.২ শতাংশ এবং ২০১১-২০১২ সালে ৩৯.১ শতাংশ। পরিকল্পানা কমিশনের তথ্য মতে- ২০০৫ সালে সরকারি কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ২৯ শতাংশ। ২০১০ সালে এ হার বেড়ে হয়েছে ৩৬ শতাংশ। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও শ্রীলংকার কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশ গ্রহণ প্রায় সমান। আলোচ্য গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে- নারীদের উচ্চ শিক্ষা যত বাড়বে কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণও তত বাড়বে। উচ্চ শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর অংশগ্রহণ ভারতে ১০০:৭৩, শ্রীলংকায় ১০০:১৯২ এবং বাংলাদেশে ১০০:৬৬। বিগত ১৫ বছরে এদেশে উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশ গ্রহণ দ্বিগুন বেড়েছে। সরকারি আধাসরকারি বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মজুরীতে আজও নারী বৈষম্যের শিকার। কর্মক্ষেত্রে মজুরী কম পাচ্ছে নারী। নানা সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে তারা। সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বি আই ডি এসের গবেষণার তথ্যে দেখা যায় নারী শ্রমিক যেখানে ২৭৪ টাকা দৈনিক মজুরী পায় সেখানে একজন পুরুষ শ্রমিক পায় ৩৬১ টাকা। অথচ উক্ত তথ্যে জানা যায় কর্মক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর কাজে মনোযোগিতা বেশী।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ব্যানবেইসের ২০১৩ সালের জরিপের তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক নারী শিক্ষকের সংখ্যা ১৯৯০ সালে ছিল ৩৩ হাজার ৯২ জন (২০.৫৭%), ২০০১ সালে ৬১ হাজার (৩৭.৬%), ২০০৬ সালে ৭৫ হাজার ৪২৭ জন (৪৬.৫%) এবং ২০১২ সালে ২ লাখ ৬১ হাজার ৮৮৭ জন (৫৮.২)। সরকারি চাকুরিতে

দিন দিন নারী কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে। ২০০৯ সালে নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ২৩ হাজার ৬৪৪ জন, ২০১০ সালে ২ লাখ ২৭ হাজার ১১৪ জন, ২০১১ সালে ২ লাখ ৫০ হাজার ১৯৯ জন, ২০১২ সালে ২ লাখ ৫২ হাজার ৮৪৫ জন এবং ২০১৫ সালে ২ লাখ ৮৮ হাজার ৮০৪ জন। বর্তমানে সরকারি চাকুরিতে নারী ২৪'১৮% পুরুষ ৭৫'৮২%।

নারীদের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) প্রতিবেদন আলোকে থেকে যায়, বাংলাদেশ এখনো ১৮ বছর বয়সের পূর্বেই ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়। একারণে উচ্চ শিক্ষা, চাকুরির আগেই ঝরে পড়ছে তারা। যেখানে মেয়েরা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল ৫৪.২৮ শতাংশ, মাধ্যমিক পর্যায়ে ছিল ৫২.৭ শতাংশ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মাত্র ৩৩ শতাংশ। সরকারি চাকুরি জীবীদের মধ্যে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে যে সব ক্যাডার কর্মকতা নিয়োগ পাচ্ছেন সেখানে সর্বশেষ নিয়োগ পেয়েছেন ৩ হাজার ২০২ জন নারী। যা ৩৩ তম বিসিএস নিয়োগের মাত্র ৩৮.২২ শতাংশ। দিন দিন বিসিএসের মাধ্যমে নারীর চাকুরী পাওয়ার সংখ্যাটি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২৯ তম বিসিএসে ২৮.৪৬ শতাংশ, ৩০তম বিসিএসে ৩১.৪৩ শতাংশ, ৩২তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নারী কোটা) এ ৫৫ শতাংশ নারী। বর্তমানে প্রশাসন ক্যাডারে কর্মরত সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মকর্তার মধ্যে নারীর সংখ্যা এক হাজারের উপরে। ৭২ জন সচিবের মধ্যে নারী পাঁচজন। বিসিএস শিক্ষাতে ৩০% নারী। দেশের সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে দিন দিন নারীর অংশ গ্রহণ বাড়ছে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী নারী শান্তিরক্ষীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ৩১ শে জানুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের ২১৭ জন নারী শান্তিরক্ষীর দায়িত্ব পালন করছেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, নেপালের ১৭৫ জন, ভারতের ১৪১জন নারী শান্তিরক্ষী রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর পর বিমান বাহিনীতেও নারী বৈমানিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে দু'জন নারী কর্মকর্তাকে। ভাবা যায় নারী আজ আকাশে উড়ছে ? ২০০০ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিয়মিত কমিশনে মহিলাদের নিয়োগের যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীতে একই উদ্যোগ গ্রহণ করে নারী ক্যাডেট/অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়। নারীরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। মাইন অপারেশনের মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একমাত্র নারী সদস্য ক্যাপ্টেন ফেরদৌস কাশেম সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছেন। এক হাজার মিটার উচ্চতা থেকে মোট ছয়বার ভূমিতে লাফ দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম প্যারাসুটার হিসেবে সনদ অর্জন করেন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জান্নাতুল ফেরদৌস। প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ মিটার গতিতে প্রতিবারই সফলভাবে ভূমিতে নেমে আসেন তিনি। একাজ শুধু দিনের আলো নয় রাতের বেলায়ও করতে হয় তাঁকে। ভয়ঙ্কর আসামী ধরছেন পুলিশ বাহিনীর নারী কর্মকর্তারা। পুলিশের অপারেশনে গিয়ে নারী পুলিশ সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। সাড়ে তিন দশক আগে পুলিশ বাহিনীতে মাত্র ১৪ জন নারী সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত হাজার ৬৫২ জন। পুরুষ সদসস্যের মতই তারা সমানতালে সমান চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। বহন করছেন হালকা থেকে ভারী অস্ত্র। হাতে ওয়্যারলেস সেট, মাথায় হেলমেট পরে অংশ নিচ্ছেন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে নারী সদস্য পুলিশ ৫.'২৫ শতাংশ। যার মধ্যে অতিরিক্ত আইজিপি নারীও রয়েছেন।

তৈরী পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের কলকারখানায় কর্মরত ৮০% এর বেশী নারী। সিপিডির গবেষণা পত্রের তথ্যে জানা যায়, মোট শ্রম শক্তির নারীর অংশগ্রহণ ১৯৯৫-১৯৯৬ সাল ১৫.৮%, ২০০২-২০০৩ সালে ২৬.১%, ২০০৫-২০০৬ সালে ২৯.২% এবং ২০১১-২০১২ সালে ৩৯.১%। বিদেশে নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে ২০১১ সালে ৩০৫৭৯ জন, ২০১২ সালে ৩৭৩০৪ জন, ২০১৩ সালে ৫৬৪০০ জন, ২০১৫ সালের জানুয়ারীতে ৬২২৬ জন ও ফেব্রুয়ারীতে ৭৫৩৬ জনের।

বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের আয়তনের এদেশের বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি মানুষ বাস করছে। এই জনসংখ্যার মধ্যে শিশু ও ষাটোর্ধদের বাদ দিলে প্রায় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মোট শ্রম শক্তির সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। এদের মধ্যে কৃষি শ্রমিকের

সংখ্যা ৫৫.৩০%, শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ৭.৬%, হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট শ্রমিকের সংখ্যা ১.২%, পরিবহন শ্রমিকের সংখ্যা ৪.২%, গার্মেন্টস শ্রমিকের সংখ্যা ৭.১%, অন্যান্য সেক্টরে ১৪.৬০%। বাংলাদেশের গার্মেন্টস, কৃষি, পাট, বস্ত্র, ইস্পাত, প্রকৌশল, রাসায়নিক, চিনি, খাদ্য শিল্প, গ্লাস, কলকারখানা, জাহাজ, রেলওয়ে, চা-বাগান, কয়লা, কঠিন শিলা, গ্যাস, কাগজ, জুতা, চামড়া, ব্যাগ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, এলুমিনিয়াম ছাড়াও ছোট ছোট শিল্প চুড়ি, রাবার, স্পঞ্জ, ডায়িং, ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, চাতাল, চাউলের কল, তেলের কল, স-মিল এসব খাতে শ্রম শক্তি ব্যয় হয়। এসব খাত ছাড়াও সরকারি বেসরকারি সেক্টরে নিয়মিতভাবে নিয়োগ পাচ্ছে নারীরা। গার্মেন্টস শিল্প, মৎস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, চাতাল ও চা শিল্পে প্রায় ৮০% মহিলা কাজ করে। সরকারি নিয়ম অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষায় ৬০% নারী শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামুলক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এর বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যায় কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে মোট কর্মজীবী নারী ২০১০ সালে ১ কোটি ৬২ লাখ, ২০১৩ সালে ১ কোটি ৬৮ লাখ। ২০১৩ সালে কৃষি খাতে ৯০ লাখ নারী, শিল্প খাতে ৪১ লাখ নারী, সেবা খাতে ৩৭ লাখ নারী। এছাড়াও কলকারখানায় ২২ লাখ, ব্যাংক বীমায় ৭০ হাজার, গৃহকর্মে ৯ লাখ, শিক্ষকতায় ৬.৫ লাখ এবং কারখানার মালিক ২১৭৭ জন নারী। প্রতিবছর এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতির মূল ধারার কর্মক্ষেত্রগুলোতে নারীর অবদান বাড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ অর্থনীতির বৃহৎ তিনটি খাত কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে কাজ করছে প্রায় ২ কোটি নারী (২০১৩ সালে ছিল ১ কোটি ৬৮ লাখ)। এদেশে উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। মূলধারার অর্থনীতি হিসেবে স্বীকৃত উৎপাদন খাতের ৫০ লাখ ১৫ হাজার কর্মীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী। তবে নারী কর্মীদের সিংহভাগই শ্রমজীবী। বাকিদের মধ্যে কেউ উদ্যোক্তা, কেউ চিকিৎসক, কেউ প্রকৌশলী। এদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে নির্বাহী ও উচ্চপদেও দায়িত্ব পালন করছেন প্রায় পাঁচ হাজার নারী। এছাড়া শিক্ষক, নির্মাণ কর্মী, বিজ্ঞানী, ব্যাংকার, শিল্পী, গণমাধ্যম কর্মী প্রায় সব পেশাই বেছে নিচ্ছেন নারীরা।

সম্প্রতি বিবিএস এর প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় দেশের কলকারখানায় পুরুষের চেয়ে ১ লাখ বেশী নারী কাজ করছেন। বিভিন্ন কারখানায় বর্তমান ২১ লাখ ১ হাজার ৮৩০ জন নারী শ্রমিক এবং ১৯ লাখ ৯৫ হাজার ৫৫৭ জন পুরুষ শ্রমিক কাজ করছেন। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশে ৪২ হাজারের বেশী ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ কারখানা আছে। যার ভেতর ২ হাজার ১৭৭ টির মালিক নারী। গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত ১ কোটি ৬ লাখের মধ্যে সিংহভাগই নারী। এ পেশায় মজুরী নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। তাদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করতে দাবী উঠেছে বিশিষ্টজনদের ভেতর থেকে।

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে নারীর সংখ্যা এখনো অপ্রতুল। এ নিয়ে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বহুজাতিক আয়কর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গ্রান্ট থর্নটনের এক গবেষণায় দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতি মেয়ে শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৫ জন ছেলে শিক্ষার্থী, জার্মানীতে ৩৩% ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে নারী, রাশিয়াতে নারী উচ্চপদে ৪৩% (যা বিশ্বে সর্বোচ্চ), চীনের প্রতিষ্ঠানে আর্থিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন ৬৩% নারী, জাপানে উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত নারীর হার ৯% (যা বিশ্বে সর্বনিম্ন), লাতিন আমেরিকায় স্নাতক শেষে নতুন চাকুরীতে ১৩% নারী, দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন কর্মী নিয়োগে নারীদের প্রাধান্য দেয় ২৯% নারীকে, নিউজিল্যান্ডে ব্যবসা বাণিজ্যে উচ্চ পদে কর্মরত নারীদের অবস্থান ৩১%। গড়ে বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত নারীর হার ২৪%। এসব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশ্বের নারীদের কর্মসংস্থানে শ্রম ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যে কাজ করছে সেখানে নারীর অংশগ্রহণও নিশ্চিত করেছে। এদেশের নারীরা সকল সেক্টরে কাজ করছেন। সুযোগ এসেছে নিজেদের শিক্ষা দীক্ষাকে কাজে লাগাবার। কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও নারীরা বৈষম্যের শিকার। মজুরী, মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধাদি, ছুটি ও কর্মঘন্টায় অনেক সেক্টরে এখনও বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ মানা হয় না। বিভিন্ন কল্যাণের ক্ষেত্রেও নারীরা বৈষম্যের যাতাকলে আটকে আছে। সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রম পরিদপ্তর ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিরলস কাজ করছে এসব অনিয়ম থেকে সকলকে মুক্ত করতে। আশা করা যায়, সব কালোমেঘ কেটে গিয়ে নারী শ্রম শক্তি দেশের উন্নয়নে সুদৃঢ় ভুমিকা রাখবে। নারীরা যোগ্যতা বলে জয় করবে, ডিজিটাল বাংলাদেশ।

শ্রমিক অধিকার : স্বদেশ ও ভিনদেশ

মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ
উপ শ্রম পরিচালক
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা।

মহান মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশের দিন, বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে রক্তঝরা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টির দিন। বাংলাদেশে এ দিনটি সরকারি ছুটির দিন। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে দেশের সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র, নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে এবং বেতারসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বিশেষ অনুষ্ঠান মালা প্রচার করা হয়। শ্রমিক অধিকারের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে থাকে। তবে কষ্ট পেতে হয় যখন শুনি, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ মে দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে না।

বাংলাদেশ শ্রম আইন বাস্তবায়নকারী একটি সরকারী সংস্থার একজন কর্মকর্তা হওয়ার সুবাদে খুব কাছ থেকে দেখে উপলব্ধি করি যে, বাংলাদেশে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার ব্যাপ্তি প্রশংসনীয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনায় কলে-কারখানায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে খেটে খাওয়া সকল শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রম প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকলে দেশময় দিন রাত্রি পরিশ্রম করছেন। শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের অনেক উন্নত এবং ধনী দেশের চেয়ে বাংলাদেশ সরকার অনেক বেশী আন্তরিক। বিশ্বের সর্বাধিক শ্রমঘন অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্যের একটি ধনী ও উন্নত দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই'তে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে কূটনৈতিক পদমর্যাদায় সরকারী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার এ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। সুযোগ হয়েছিল দেশটির আশে পাশের একই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক বাহক কয়েকটি দেশ ভ্রমন করার এবং সেখানের কর্মরত সকল প্রকার শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)কর্তৃক নির্ধারিত শ্রমমান সমূহ কার্যকর এবং অনুসরণে দেশগুলোর কঠোর ও প্রতিকূল মনোভাব দেখার। তাই আমার এ লেখায় বাংলাদেশের মতো বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি গরীব ও উন্নয়নশীল দেশে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকরা যে কতো বেশী অধিকার ভোগ করেন এবং তাদের প্রাপ্যতা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকার সাধ্য অনুযায়ী যে অনেক উদার তা তুলনামূলক বিবরণীতে উদ্ধৃত করার চেষ্টা থাকবে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে মে' দিবস কি এবং কেন -তা যেমন অনেকেই জানেন না আবার তা উদযাপনে ঐ দেশের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও অনুপস্থিত। সংযুক্ত আরব আমিরাতও এর বাইরে নয়। তাই এ অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দিবসের মতো মে' দিবস পালনে সরকারী নির্দেশনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা গেলে উদ্যোগটি বাংলাদেশী প্রবাসীদের কাছে প্রশংসনীয় হতে পারে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত মধ্যপ্রাচ্যের একটি অন্যতম ধনী এবং তেলসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে সমধিক পরিচিত। আবুধাবী, দুবাই, সারজাহ, আজমান, উম আল কোইয়ান, রাস আল খাইমা এবং ফুজাইরা এ ৭টি রাজ্য নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত গঠিত। তন্মধ্যে দুবাই এর সুউচ্চ ভবনসমূহের আধুনিক স্থাপত্যশৈলী, বিশ্বমানের আধুনিকতম নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বিশ্বের অন্যতম একটি কসমোপলিটন শহর হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে যেখানে বিশ্বের প্রায় ১১০ টি দেশের মানুষের বসবাস। তাছাড়া বিনোদন এবং শপিং এর উদ্দেশ্যে প্রতিদিন প্রচুর বিদেশী টুরিস্টদের আগমন ঘটছে। ছুটিতে সকল আরব দেশের লোকেরা সপরিবারে আসছেন বেড়াতে। উন্নত বিশ্বের নামকরা সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুবাই শাখায় পড়ছে অন্যান্য দেশসহ আরব বিশ্বের ছেলে মেয়েরা। এ বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনায় যে কাঠামোগত ভবনাদি নির্মান এবং সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের কাজ রয়েছে এর প্রায় পুরোটার সাথেই জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বাংলাদেশী

অভিবাসী শ্রমিকদের ঘামঝরা অক্লান্ত পরিশ্রম। সংযুক্ত আরব আমিরাতে বর্তমানে প্রায় ১.২ মিলিয়ন বাংলাদেশী শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন যার প্রায় ৪০% নির্মাণ সেক্টরে, ৫০% শ্রমিক ক্লিনিং সেক্টর, গৃহকর্মী, অটোমোবাইল গ্যারেজ, গার্মেন্টস, উৎপাদিত ফল ও সবজি বাজারজাত ও বিক্রয়করণ সম্পর্কিত কাজ ইত্যাদি পেশায় এবং ১০% রয়েছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ব্যাংকার, বিক্রয় প্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ী হিসেবে। বাংলাদেশী শ্রমিকদের পাশাপাশি কাজ করছে ফিলোপিনো সহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের শ্রমিকেরা। তবে অধিকাংশ বাংলাদেশী শ্রমিকদের কর্মনিষ্ঠা, অনুগতমূলক সুআচরণ ও অন্যান্য দেশের তুলনায় শ্রম বিনিময় হার সস্তায় পাওয়া যাওয়ার কারণে তারা যেমন জনপ্রিয় তেমনি মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে বেশী শোষিত এবং অধিকার বঞ্চিতও বটে। তাদের স্বার্থ রক্ষায় আমার কর্মকালীন সময়ের একটা বড় অংশ কেটেছে দেশটির লেবার ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের সাথে দেন-দরবার করে। দুবাই ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের অন্যান্য রাজ্যেও প্রচুর বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করেন। বর্তমানে দেশটিতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের আনুপাতিক সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহকর্মী ছাড়া বাংলাদেশী শ্রমিকদের এমপ্লয়মেন্ট ভিসা প্রদান সাময়িক বন্ধ রয়েছে। তবে দুবাইতে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য এক্সপো ২০২০ কে টার্গেট করে নির্মান সেক্টরে প্রচুর বড় বড় প্রজেক্ট সরকার হাতে নিয়েছেন। মনে হয়েছে, তাদের প্রয়োজনেই অদূর ভবিষ্যতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনেক বাংলাদেশী শ্রমিক নিতে হতে পারে বিধায় অচিরেই বন্ধ ভিসা খুলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে অভিবাসী শ্রমিক (নন ন্যাশনাল) এবং ন্যাশনাল শ্রমিক উভয়ের জন্য একই শ্রম আইন প্রযোজ্য। তবে নিজস্ব ন্যাশনাল শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য শ্রম আইনে বেশ কিছু শিথিল শর্ত রয়েছে। যেমন: একজন ন্যাশনাল শ্রমিক তার চাকুরী পছন্দ না হলে মালিকের অনুমতি বা বিনা অনুমতিতে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে অন্য মালিকের কাজ করতে পারবে। কিন্ত একজন নন ন্যাশনাল শ্রমিক তার চুক্তিবদ্ধ সময়ের মধ্যে মালিকের অনুমতি গ্রহণ করে চাকুরী ছাড়লেও পরবর্তী ১(এক) বছর অন্য কোন মালিকের কাজ করতে পারবে না। করলে শ্রম আইনে নতুন নিয়োগ কর্তার বেশ অর্থ জরিমানার বিধান রয়েছে। তবে মালিক শ্রমিকের যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে যদি দেশটির ডিপার্টমেন্ট অব লেবার অনুমোদন দেয় তবেই মাত্র শ্রমিকটি অন্যত্র কাজ করা সুযোগ পাবে। সন্মানিত পাঠককূল, বিষয়টিকে ডিসক্রিমেনশন ভাবলেও ভুল হবে না মনে করি।

বাংলাদেশের শ্রম আইন ওদের চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী। ধারণাটি সহজেই অনুমেয় যখন দেখা যায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রম আইনে মোট ধারা আছে ১৮৬ টি অপরদিকে বাংলাদেশ শ্রম আইনে ৩৫৮ টি ধারা রয়েছে। মহিলা শ্রমিকেরা যদি টানা ১(এক) বছর কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন তবেই মাতৃত্বকালীন কল্যাণ সুবিধা পাবেন দেড় মাস করে মোট ৩(তিন) মাস, অপর দিকে বাংলাদেশের মহিলা শ্রমিককেরা টানা ৬(ছয়) মাস চাকুরী করলে সেই সুবিধা পাবেন মোট ৪(চার) মাস।

সংযুক্ত আরব আমিরাত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র সদস্য হয়েছে ১৯৭২ সালে, যা বাংলাদেশের সমসাময়িক। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে দেশটি আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুসমর্থন করেছে মোট ৯টি, আর বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে মোট ৩৫ টি কনভেনশন। আইএলও'র অবশ্য পালনীয় ৮ টি কোর কনভেনশনের মধ্যে অনুসমর্থন করেছে ৬টি। তন্মধ্যে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ২ টি কোর কনভেনশন যথা: শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট কন-৮৭ এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সম্বলিত কন-৯৮ অনুসমর্থনই করেনি। ফলে শ্রম আইনে শিল্প বিরোধ উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই অর্থ্যাৎ শিল্প সম্পর্কিত কোন অধিকার ভোগ করার কোন সুযোগই নেই দেশটিতে কর্মরত শ্রমিকদের। ফলে দেশটির শিল্প কারখানায় কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা আইনত: বেআইনী। তবে কোন শিল্পে বা প্রতিষ্ঠানের কোন ইস্যুতে শ্রমিক মালিকে বিরোধ দেখা দিলে তা নিস্পত্তিতে ডিপার্টমেন্ট অব লেবারের অধীনে শ্রম আইন মতে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ রয়েছে যা আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থা হতে একটু ভিন্নতর। আমার লেখাটি দেশটির বিরোধ নিস্পত্তির আইনগত কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক শেষ করতে চাই।

দেশটির জনগণ আইন প্রতিপালনে খুবই শ্রদ্ধাশীল এবং সরকারও তা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ী। শ্রম আইনের সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রম মন্ত্রণালয় খুবই শক্তিশালী একটি মন্ত্রণালয়। যার অধীনে ডিপার্টমেন্ট অব লেবার খুবই শক্তিশালী শ্রম আইন বাস্তবায়নকারী একটি সংস্থা। ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্টও আছে। ইন্সপেক্টরদের রুটিন মাফিক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ছাড়াও যে সকল প্রতিষ্ঠানে কমন ইস্যুতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ থাকে তা তাদের পরিদর্শন রিপোর্টে উল্লেখ করে দ্রুত ডিপার্টমেন্ট অব লেবারে প্রেরণ করতে হয়, যার অনুলিপি শ্রম মন্ত্রণালয়েও প্রেরিত হয়। ডিপার্টমেন্ট অব লেবার বিষয়টি অবহিত হওয়ার সাথে সাথে কোন পক্ষ আবেদন করুক আর না করুক অসন্তোষ নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আপডেট মন্ত্রণালয়কে ইলেক্ট্রনিক্যালি জানাতে থাকে। বিরোধ নিষ্পত্তিতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব লেবার মেডিয়েটরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং নিষ্পত্তিতে সফল না হলে কাজ শুরু করার ১০ দিন পর শ্রম আইনের ১৫৬ ধারা মতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পূর্বগঠিত কনসিলিয়েশন কমিটিতে বিষয়টি প্রেরণ করা হয়। এই কমিটিতে লেবার ও ইন্সপেক্টিং ডিপার্টমেন্ট এর কর্মকর্তা ছাড়াও প্রয়োজন মতে সংশ্লিস্ট ভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণও সদস্য হিসেবে থাকেন। এই কমিটি বিরোধটি নিষ্পত্তিতে ২(দুই) সপ্তাহ সময় নেন এবং দুই পক্ষের অবশ্যই পালনীয় নিষ্পত্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কোন একটি পক্ষ এই নিষ্পত্তি না মানলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সুপ্রিম আরবিট্রেশন বোর্ড বরাবর আপীল করতে পারবেন। বোর্ডটির চেয়ারম্যান স্বয়ং শ্রমমন্ত্রী এবং অন্যান্য সদস্য হলেন একজন সিনিয়র বিচারপতি, শ্রম আইন নিয়ে দীর্ঘ দিন কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেশটির একজন সিনিয়র এডভোকেট এবং সরকারের পছন্দমতো আরো দুজন সদস্য থাকেন, যাদের প্রদত্ত রায়ই চূড়ান্ত এবং অবশ্য পালনীয়। এই বোর্ডকে আপিল আবেদন পাবার পর শ্রম আইনমতে সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত রায় প্রদান করতে হয়।

নিয়োগকর্তার চাকুরীর শর্তাদি লংঘন নিয়ে কোন একজন শ্রমিকের অভিযোগ পেলে লেবার ডিপার্টমেন্ট এমপ্লয়ারকে দপ্তরে এনে সমাধানের চেষ্টা করেন। ব্যর্থতায় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে ডিপার্টমেন্টের মতামতসহ প্রেরণ করা হয় এবং বিষয়টি আদালতে নিষ্পত্তি হয়। অপরদিকে ইন্সপেক্টরগণ শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে শ্রম আইনের কোন ধারার লংঘন পেলে প্রথমে তা উল্লেখ করে সতর্কীকরণ চিঠি দেন এবং পরবর্তী সময়েও অবস্থার পরিবর্তন না হলে শ্রম আদালতে মামলা করে দেন।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

শ্রম ও শিল্পের কল্যাণে শ্রমিক প্রশিক্ষণ

মোঃ বেল্লাল হোসেন শেখ
অধ্যক্ষ
শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম

সভ্যতার ইতিহাস শ্রমের ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। তাজমহলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ কোনো পর্যটক সম্রাট শাহজাহানের উদ্যোগের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হন। কিন্তু তাজমহল নির্মাণে দীর্ঘ সময় ধরে অসংখ্য শ্রমজীবীর অবর্ণনীয় শ্রম ও ঘামের কথা স্মরণ করতে পারেন না। কবি নজরুল সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রতিটি অট্টালিকার মনোমুগ্ধকর রং যার রক্তে রাঙা- সে হচ্ছে শ্রমজীবী। জাগতিক প্রতিটি উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প পরিচালনা ইত্যাদি আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত শ্রমের উপর ভিত্তি করে টিকে আছে। শ্রমই বিশ্ব সভ্যতাকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছে। শ্রমিক হচ্ছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অতন্দ্র সৈনিক। শ্রমকে বলা যায় এক প্রকার শক্তি। এ শক্তির পেছনের প্রতিনিধি হচ্ছে মানুষ। আমরা জানি যে, যে কোন শক্তিকে যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো না যায়, তবে তা অপচয় হতে পারে বা অব্যবহৃত থেকে যেতে পারে। শ্রম শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য তাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের বিশেষ কোনো জ্ঞান ও দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে এবং মানুষের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলছে শ্রমজীবী মানুষের অবিরাম সংগ্রাম। প্রশিক্ষণ হচ্ছে সে সংগ্রামেরই গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে, কর্মস্থলে তাকে জীবনের নিরপত্তা খুঁজে নিতে সাহায্য করে, ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) কে শ্রমিক ও শিল্পের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারে, পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা, নিরাপত্তা বিধান ও পারিবারিক কল্যাণ সাধনে শ্রমিককে সক্ষমতা প্রদান করে।

দক্ষ শ্রমশক্তিকে বিবেচনা করা হয় মূল্যবান মানব সম্পদ হিসেবে। শ্রমের দক্ষতার মাঝেই লুকিয়ে থাকে অপার সম্ভাবনা। মেশিনের উৎপাদন দক্ষতা ও ক্ষমতা স্থির থাকে। কিন্তু শ্রমের দক্ষতা বা কর্মক্ষমতা স্থির নয় বরং তা গতিশীল। শ্রমদক্ষতার এ গতিশীল বৈশিষ্ট্যের কারণে দক্ষ শ্রমিক উৎপাদনে নতুন মাত্রা ও নবধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাই শিল্পের উন্নত উৎপাদনশীলতার অন্যতম পূর্বশর্ত হল দক্ষ শ্রমশক্তি। উৎপাদিত পণ্য বা সেবার গুণগতমান বহুলাংশে নির্ভর করে শ্রমিকের নিপুণতার উপর। কারণ শ্রমিকের হাতের পরশে কোন পণ্য বা সেবা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এ সত্য উপলব্ধি করে শিল্পের মালিক বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছেন। অপরদিকে, দক্ষতা শ্রমিকদের জন্য সৌভাগ্য নিয়ে আসে। এর মাধ্যমে ঘটে শ্রমিকের কর্মের নিশ্চয়তাসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন। দক্ষতা শ্রমিককে দেয় উন্নত মজুরী পাবার নিশ্চয়তা। ফলে শ্রমিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হয় এবং পারিবারিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। সংগঠিত হওয়া ও যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে দক্ষতা শ্রমিককে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে দেয়।

নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রমিক প্রশিক্ষণ ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। নিরাপদ কর্ম পরিবেশের সাথে মালিকের সম্পদ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তা জড়িত। আধুনিক যুগে শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে বিভিন্ন ধরণের আইন ও বিধি বিধান রয়েছে। এ সব আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আইন অমান্যতার কারণে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধানে মালিকের প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় বটে তবে তা-ই কিন্তু যথেষ্ট নয়। কারণ তথায় সদা উপস্থিত শ্রমিকের তৎপরতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ

ব্যতিরেকে এ নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব নয়। কারখানায় অগ্নি নিরাপত্তা, মেশিন নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইনের যে বিধি বিধান ও কৌশল রয়েছে সেসব আইনের বিধি বিধান ও নিরাপত্তা কৌশল শ্রমিকদের অবহিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য। যেমন- কারখানায় নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে নিরাপত্তা কমিটি গঠনের বিধান এবং এ কমিটির সদস্য হিসেবে শ্রমিকদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধান কল্পে প্রণীত আইনের বিধি বিধান অনুসরণ করে আইনের মান্যতা তথা কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা, কর্মস্থলে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার নিশ্চিত করা ও সেইফটি কমিটির সদস্য হিসেবে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ জরুরী। সেজন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৭৮ ক (৩) ধারায় কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেইফটি নিশ্চিত করণের জন্য প্রত্যেক শ্রমিককে কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রমিকরা যত বেশী সতর্ক ও সচেতন হবে নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের অংশ গ্রহণও ততবেশী নিশ্চিত হবে।

শ্রমিকদের সংগঠিত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার বাংলাদেশ শ্রম আইন দ্বারা স্বীকৃত অধিকার। আমাদের দেশের শ্রমিকরা এ অধিকার ভোগ ও প্রয়োগের আইনগত দিক ও কৌশলসমূহ অনুধাবন করতে পারেনা। সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা। পারস্পরিক দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শিল্প বিরোধের মীমাংসা পদ্ধতি শ্রম আইনে উল্লেখ রয়েছে। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উক্ত আইনগত পদ্ধতি সম্পর্কে না জানার ফলে শ্রমিকরা নিজদের দাবী আদায়ে অবৈধ ধর্মঘট, বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। ফলে শিল্পের কর্মপরিবেশ বিঘ্নিত হয় এবং মূল্যবান শ্রম-ঘণ্টা নষ্ট হয়। তৈরি পোশাক শিল্পে সংগঠিত শ্রম অসন্তোষের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি, শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, শ্রমিকদের সহিত মিডলেবেল ম্যানেজমেন্টের আচরণ, তুচ্ছ/মিথ্যা ঘটনা থেকে শ্রমিকদের মধ্যে গুজব সৃষ্টি ইত্যাদি শ্রম অসন্তোষের অন্যতম কারণ। শ্রম আইনের উপর মিডলেবেল ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। শ্রমিক-মালিকের মধ্যকার সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকদের অঙ্গীকার ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে শ্রম আইনে অংশগ্রহনকারী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে উক্ত অংশগ্রহনকারী কমিটিকে অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর করা যাচ্ছে না। শিল্প ক্ষেত্রে সুষ্ঠু শ্রমিক মালিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষার মহান ব্রত নিয়ে যে ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি এবং অংশগ্রহনকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন থেকে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এর পিছনে একটি বড় কারণ হল ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। কাজেই দায়িত্বশীল শ্রম ও শিল্প-বান্ধব ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্টদের শিল্প সম্পর্ক ও ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৩৪৮ ধারায় শ্রমিকগণের ও মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাগণকে শ্রম আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। একই ধারায় শ্রমিকগণের ট্রেড ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়ন, যৌথ দারকষাকষি প্রতিনিধি ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রতিনিধিগণ উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবার কল্যাণ শ্রম কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা ও মনোযোগ তাদের সুস্বাস্থ্য ও পারিবারিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের শ্রমিকদের মজুরী অপেক্ষাকৃত কম থাকায় তারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবার কল্যাণের প্রতি উদাসীন থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার সঠিক নিয়ম-কানুন তাদের জানা থাকেনা। স্বল্প আয়ের সংগে সংগতি রেখে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের পদ্ধতি সে জানে না কিংবা কেউ তাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে না। স্বল্প আয় দিয়ে কিভাবে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের পরিকল্পনা করা যায় এবং পারিবারিক বাজেট তৈরী করা যায় সে ব্যাপারে শ্রমিকরা সচেতন থাকেনা। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের

শ্রমিকদের মধ্যে নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের প্রবনতা দেখা যায়। এতে তার স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং পারিবারিক কল্যাণ বিঘ্নিত হয়। এ অবস্থা থেকে শ্রমিকদের মুক্তি দিতে পারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ে সচেতনতা, যা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব।

শিল্প ও শ্রমিকদের সামগ্রিক কল্যাণে প্রশিক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে বর্তমান সরকার। কেবল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিক শ্রেণী শিল্পের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে পারে। আর বর্তমানে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকের চাহিদা বেড়েছে। এ লক্ষ্য কে সামনে রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম পরিদপ্তরের অধীনে শ্রম ও শিল্পের কল্যাণে প্রতিষ্ঠা করেছে চারটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আই.আর.আই) নামে এ চারটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান দেশের পুরাতন চারটি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) অবস্থিত। সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- শিল্পের জন্য একটি দক্ষ, প্রশিক্ষিত, আধুনিক ও উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা এবং শ্রম আইন সম্পর্কে শ্রমিক-মালিকদের অধিকতর সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলা। এ প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রতি বছর হাজার হাজার শিল্প-শ্রমিক ও শিল্প-ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে এ প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউটে দুই ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ৪ (চার) সপ্তাহ মেয়াদী শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ কোর্স ও ১ (এক) সপ্তাহ মেয়াদী শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স। এছাড়াও শিল্প মালিকদের চাহিদা মোতাবেক ২-৩ দিন মেয়াদি আউট সোর্সিং কোর্স পরিচালনা করা হয়। চার সপ্তাহ মেয়াদী শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স শিক্ষায়তনের নিজস্ব অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এবং এক সপ্তাহ মেয়াদী শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স ও আউট সোর্সিং কোর্স বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কর্তৃক প্রশিক্ষণ সেবা বিনা খরচে প্রদান করা হয়। উপরন্তু প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য শ্রমিকদের দৈনিক উপস্থিতি সাপেক্ষে ১৫০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। যে কোন সরকারি , আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, সিবিএ প্রতিনিধি, অংশগ্রহনকারী কমিটির সদস্য, সেইফটি কমিটির সদস্য, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মডিউলে অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে-বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর আলোকে শ্রমিকদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী, কর্মক্ষেত্রে অসৎ শ্রম আচরণ ও শাস্তির পদ্ধতি, পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সম্পর্কিত বিধিবিধান, ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও বাতিলকরণ পদ্ধতি, সিবিএ নির্ধারণ পদ্ধতি ও ইহার কার্যক্রম, অসৎ শ্রম আচরণ, শিল্প বিরোধ ও ইহার মীমাংসা পদ্ধতি, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, শ্রম আইনে অপরাধ, দণ্ড পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধিবিধান, অংশ গ্রহণকারী কমিটি গঠন ও উহার কার্যক্রম, মজুরী ও ইহার পরিশোধ সম্পর্কিত বিধিবিধান, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধিবিধান, কর্মঘন্টা ও ছুটি সম্পর্কিত বিধিবিধান, কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকদের অংশগ্রহন সম্পর্কিত বিধিবিধান, ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কিত বিধিবিধান, বাংলাদেশের শ্রম নীতি, শ্রম প্রশাসন ও উহার কার্যক্রম, আই এল ও গঠন কার্যাবলী এবং আই এল ও কনভেনশনের আলোকে বাংলাদেশের শ্রমমান, কর্মে মনবল এবং দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায়, কর্মে অবসাদ, ক্লান্তি ও উদ্বুদ্ধকরণ, নেতৃত্ব ঃ নেতৃত্বের প্রকারভেদ এবং আদর্শ নেতার গুণাবলী, শিল্পে মানবিক সম্পর্ক ও শিল্প সম্পর্কের উন্নয়ন, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রমিক ও মলিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিল্পে উৎপাদনশীলতার ধারণা ও উহা বৃদ্ধির কৌশল, প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ পদ্ধতি ও কৌশল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, অটিজম, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও উহার কৌশলসমূহ, শ্রম আইনের উপর বিভিন্ন ঘটনা সমীক্ষা ইত্যাদি বিষয়। এছাড়া শ্রম পরিদপ্তরের অধীনে দেশের শিল্পঘন এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে ৩০টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিল্প শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও শ্রান্তিবিনোদন সুবিধা ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদান করা হয়। তার পাশাপাশি এ সকল কেন্দ্রে এক সপ্তাহ মেয়াদী শ্রমিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু রয়েছে। উক্ত কোর্সসমূহে অনুরূপ কোর্স মডিউল অনুসরণ করা হয় এবং প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফিডব্যাকে এ সব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা, কাজের প্রতি আগ্রহ ও শৃঙ্খলাবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিকরা স্বীকার করেছেন। এ প্রশিক্ষণের প্রতি সরকার যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন শিল্প-মালিক ও শ্রমিকগণ যদি সেভাবে গুরুত্ব দেয় তবে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে আরও জোরদার করার মধ্যদিয়ে শ্রম ও শিল্পের কল্যাণে এক নব দিগন্তের সূচনা করা সম্ভব। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে একটি চীনা প্রবাদ এ প্রসঙ্গে প্রণিধান যোগ্য। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে -"যদি তুমি এক বছর যাবত কোন ফল ভোগ করতে চাও, তবে তোমার ঘরের আঙ্গিনায় শাক-সব্জি চারা রোপন কর। যদি তুমি পঞ্চাশ বছর যাবত কোন ফল ভোগ করতে চাও, তবে তোমার ঘরের আশ-পাশের জায়গায় ফলবান বৃক্ষ রোপন কর। আর তুমি যদি শত শত বছর যাবত বংশ পরম্পরায় কোন ফল ভোগ করতে চাও, তবে তোমার অধীনের মানুষগুলোকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোল। তবে তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে।" উক্ত প্রবাদ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রশিক্ষণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার প্রভাব সুদূর প্রসারী।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

উৎপাদনশীলতা

হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার
উপ শ্রম পরিচালক

আধুনিক যুগে জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে উৎপাদনশীলতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কোন শিল্পই টিকে থাকতে পারেনা। শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রমিকগণ মজুরী বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দাবি তুললে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কথা বলে থাকেন। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলেই শ্রমিকের মজুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানো সম্ভব এবং প্রতিষ্ঠানকেও লাভজনক হিসেবে গড়ে তোলা যায়। কাজেই শ্রমিক পক্ষ, মালিক পক্ষ উভয়েরই উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার।

উৎপাদনশীলতা ঃ

উৎপাদনশীলতা ধারণাটির সাথে উৎপাদন কথাটি চলে আসে। কিন্তু উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা এক কথা নয়। উৎপাদন হ'ল নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা। উপযোগ হ'ল যে বস্তু বা সেবা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে। উৎপাদনশীলতা বলতে পূর্বের সময়ের তুলনায় অধিক পরিমান উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টির ক্ষমতা বুঝায়। আমরা অন্যভাবে বলতে পারি উৎপাদনশীলতা মানে (১) দক্ষতার সহিত উৎপাদন, (২) কম উৎপাদন খরচে উৎপাদন, (৩) উন্নত গুনগত মানের পণ্য উৎপাদন। এ ক্ষেত্রে পণ্যের গুনগত মান হ্রাস করা যাবে না। গানিতিকভাবে আমরা উৎপাদনশীলতাকে প্রকাশ করতে পারি।

$$\text{উৎপাদনশীলতা} = \frac{\text{উৎপাদন আউটপুট}}{\text{উপকরণ (ইনপুট)}}$$

এখানে, উৎপাদন ঃ বস্তু ও সেবা/পণ্য (Goods or commodities and services)
উপকরণ ঃ ব্যবহৃত সম্পদ ঃ

১. ভূমি (LAND)
২. শ্রম (LABOUR), মজুরী, বেতন, ভাতা, উৎসব বোনাস,
৩. কাঁচামাল (RAW MATERIALS)
৪. মূলধন (CAPITAL)
৫. অশিল্প জনিত ব্যয়ঃ মুদ্রণ, মনোহারী, ডাক, বীমা, তার, টেলিফোন ইত্যাদি।

যে কোন শিল্প উপকরণের পরিমান বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক, তবে এ বৃদ্ধি যদি উপকরণের বৃদ্ধির সমানুপাতিক হয় তবে তাকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বলা যায় না।
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তখনই বলা যাবে, যখন ঃ

১. উপকরণের আনুপাতিক বৃদ্ধির চেয়ে উৎপাদনের আনুপাতিক বৃদ্ধি বেশী হয়।
২. উপকরণের পরিমান স্থির রেখে কর্মোদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
৩. উপকরণ ও উৎপাদনের পরিমান স্থির রেখে উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান উন্নত হয়

কাজেই আমরা বলতে পারি কম খরচে বা পূর্বের খরচে আগের চেয়ে ভাল পণ্য বা সেবা দেওয়ার নাম উৎপাদনশীলতা।

উৎপাদনশীলতার সুফল ঃ উৎপাদনশীলতা স্বনির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষম হয়েছেন। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে মালিক, শ্রমিক, ভোক্তা এমনকি সরকারও তার সুফল পেয়ে থাকে।

মালিক শ্রেণীর লাভ ঃ দক্ষতার সহিত ও কমখরচ উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদন মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জন্য অতি সুখকর বিষয়। উৎপাদন খরচ কম হওয়াতে কমমূল্যে পণ্য বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হয়, অথচ মুনাফা অক্ষুণ্ন থাকে। পণ্যের গুনগত মান উন্নত হলে ভোক্তা সমাজ সহজে উক্ত পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বেশী দামেও উক্ত পণ্যের বিশাল বাজার সুবিধা লাভ করে। বাজার সুবিধা বজায় থাকা কিংবা ইহার সম্প্রসারণ কোন প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার অন্যতম পূর্বশর্ত। যেমন ঃ ইউনিলিভার এর পণ্য (দাম বেশী হলেও সুনাম আছে)। চায়নার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী সারা পৃথিবীতে এখন বাজার দখল করেছে। বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে সারা পৃথিবীতে যাদের উৎপাদনশীলতা বেশী তারাই টিকে থাকছে এবং লাভবান হচ্ছে।

শ্রমিক শ্রেণীর লাভ ঃ উৎপাদনশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকের মজুরীর পরিমান নির্ধারিত হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে শ্রম মজুরী ও শ্রমিকদের অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। উন্নত মজুরী শ্রমিকদের উন্নত মননশীলতা নিশ্চিত করে। শ্রমিক কাজে উৎসাহ পায় এবং কাজের প্রতি মনোযোগী হয়। ফলস্বরূপ কাজের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তবে উৎপাদনশীলতার দিকে নজর না দিয়ে যদি এক তরফাভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে মজুরী বৃদ্ধির দাবী জোর করে আদায় করা হয়, তা হলে এতে উৎপাদন খরচ বাড়ে এবং দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ বৃদ্ধিপাপ্ত মজুরী দ্বারা শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান মোটেও উন্নত হয়না। আমেরিকা, কানাডা, জাপান এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের উৎপাদনশীলতা বেশী এবং মজুরীও বেশী।

ভোক্তার লাভ ঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যয় কমে এবং বাজারে পণ্য সামগ্রীর দামও কমে। ভোক্তা সমাজ কম দামে বেশী পণ্য কিনে বেশী উপযোগ লাভ করতে পারে। মানুষের জীবন যাত্রার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

সরকারের লাভ ঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে সরকার উহা থেকে বাড়তি রাজস্ব পায়, মুদ্রাস্ফিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে, রপ্তানী বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসে, বহি:বাণিজ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, চোরাচালানের প্রবণতা কমে যায়। তাই উৎপাদনশীলতার সুফল রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর মানুষ ভোগ করে থাকে।

আমরা যদি ছকের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতাকে দেখাই তাহলে তা নিম্নরূপ দেখানো যায় ঃ

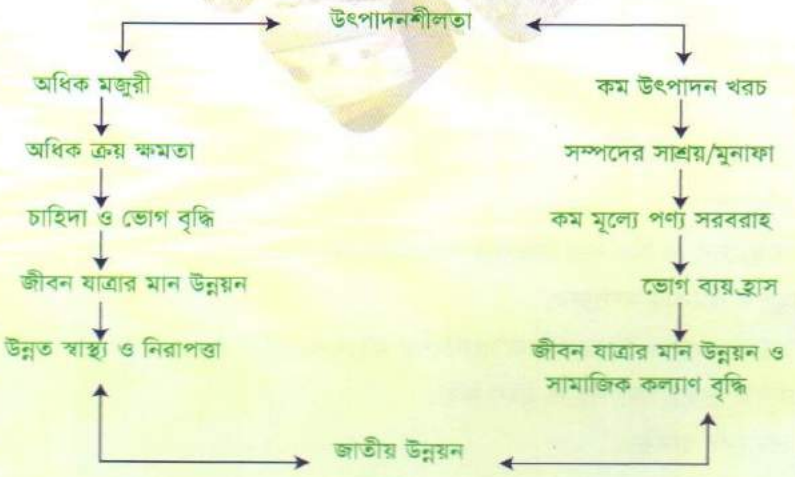

উৎপাদনশীলতার প্রভাবকারী উপাদানসমূহ ঃ উৎপাদনের সহিত জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমূহের দক্ষতার উপর উৎপাদনশীলতা নির্ভরশীল। উৎপাদনের বিভিন্ন পক্ষসমূহের দক্ষতার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে না পারলে কোন এক পক্ষের দ্বারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়না। যেমন ঃ- কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক দক্ষ হলেও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও কৌশলগত কারণে দক্ষতার পুরোমাত্রা ব্যবহার সম্ভব হয় না। যেমন ঃ

P F(TOL)

এখানে,

P- PRODUCTIVITY

T- TECHNOLOGY

O-ORGANISATIONAL EFFICIENCY

L-CO-OPERATION OF LABOUR

প্রযুক্তি ঃ- আধুনিক যুগ হল প্রযুক্তির যুগ। আধুনিক যুগে উৎপাদনশীলতা পুরোপুরি প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। ইতোপূর্বে মানুষ যা করতে পারেনি উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহার করে তা এখন সহজে করা সম্ভব হচ্ছে। চীনে মাটি ছাড়া আলু উৎপাদনের কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে। উন্নত রাষ্ট্রগুলো কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এর ফলে উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা প্রোডাক্টিভিটি লেভেলকে উচ্চস্তরে নিয়ে গেছে। অথচ বাংলাদেশের অনেক শিল্প কারখানাই এখনও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে না।

সাংগঠনিক দক্ষতা ঃ উৎপাদনের বিভিন্ন পক্ষগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ইহার সমন্বয় সাধন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক দক্ষতা প্রয়োজন। উৎপাদনের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, কাঁচামাল ক্রয় ও ইহার মান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করতে পারলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাগুলোতে অব্যাহত লোকসানের কারণ উৎপাদনের বিভিন্ন পক্ষসমূহের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা পুরোমাত্রায় ব্যবহার না করা।

শ্রমিক পক্ষের আগ্রহ ও সহযোগিতা ঃ কিছুকাল আগেও বিশ্বাস করা হত যে, উন্নত প্রযুক্তি কেবল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু আইএলও ১৯৮১ সালে এক বুলেটিনে প্রকাশ করে যে, উৎপাদনশীলতার প্রধান নিয়ামক শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা। শ্রমিকদের আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা পাওয়ার একমাত্র উপায় হ'ল সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পে মানবিক সম্পর্ককে জোরদার করা। প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে হবে যে, শ্রম কোন পণ্য নয়। উৎপাদনের কাজে সক্রিয় অংশীদার 'শ্রম' এর পেছনে রয়েছে মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ। সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি তার কর্ম স্পৃহাকে বাড়িয়ে দেয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, সংশয়, সন্দেহ, তিক্ততা থাকা মোটেই সমীচীন নয়। এতে উৎপাদন ব্যহত হয়।

উন্নত শিল্প সম্পর্ক সৃষ্টির পদক্ষেপগুলো নিম্নে দেওয়া হ'ল ঃ

১. বাস্তবসম্মত ও চমৎকার নিয়োগ নীতি প্রণয়ন;
২. সুনির্দিষ্ট মজুরী নীতি প্রণয়ন;
৩. উন্নত কর্ম পরিবেশ;
৪. শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা বিধানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. শ্রম কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন;
৬. গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনের মতামত চাওয়া এবং শ্রমিক সংগঠনকে গুরুত্ব প্রদান;
৭. সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করা;
৮. ইনসেন্টিভ প্রদানের ব্যবস্থা।

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব প্রদান। শিল্পোন্নত প্রায় প্রতিটি দেশে শিল্প ব্যবস্থাপনা পলিসিতে উক্ত নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এ নীতির কোন বিকল্প নেই। শিল্প সম্পর্ক রক্ষা ও শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাওয়ার জন্য জাপানী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে "সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনা" পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

উপসংহার ঃ উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি প্রায় অসম্ভব। শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উৎপাদনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক ও সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আজ জাতীয়ভাবে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব দেশের মঙ্গলের জন্য উৎপাদনের তৃনমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ব্যতীত কোন শিল্পই মুনাফা লাভ করতে পারেনা, টিকে থাকতে পারেনা। আগামী শতাব্দিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর একমাত্র হাতিয়ার হবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিকদের সেফটি সম্পর্কে দু'টি কথা

মোঃ বেলায়েত হোসেন
এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট
সাধারণ সম্পাদক
লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন, ঢাকা।

আমাদের শ্রমিক ভাইদের কাজ করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা আছে কিনা। শ্রম আইনের ৬১ ধারায় বর্ণিত আছে যদি কোন পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা ইহার কোন অংশ বা ইহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট এমন অবস্থায় আছে যে, ইহা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য বিপদজ্জনক তাহা হইলে তিনি মালিকের উপর নোটিশ জারী করিয়া উহা যথাযথভাবে মেরামত বা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

ধারা-৬২, অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ভাবে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রত্যেক তলার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী অন্ততঃ একটি বিকল্প সিঁড়িসহ বর্হিগমণের উপায় এবং অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি কোন পরিদর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উপরে উল্লেখিত বিধি অনুযায়ী বহিগর্মনের ব্যবস্থা করা হয় নাই তাহা হইলে তিনি মালিকের উপর লিখিত নোটিশ জারী করিয়া ব্যবস্থা নিবেন এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কোন কক্ষ হইতে বর্হিগমনের পথ তালাবদ্ধ বা আটকাইয়া রাখা যাইবে না। যাহাতে কোন ব্যক্তি কক্ষের ভিতরে কর্মরত থাকিলে উহা তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে সহজে খোলা যায় এবং সকল দরজা, যদি না এই গুলি স্লাইডিং টাইপের হয়, এমন ভাবে তৈরী করিতে হইবে যেন উহা বাহিরের দিকে খোলা যায় অথবা যদি কোন দরজা দুইটি কক্ষের মাঝখানে হয়, তাহা হইলে উহা ভবনের নিকটতম বহির্গমনের পথের কাছাকাছি খোলা যায় এবং এই প্রকার কোন দরজা কক্ষে কাজ চলাকালীন সময়ে তালাবদ্ধ বা বাধাগ্রস্থ অবস্থায় রাখা যাইবে না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সাধারণ বহির্গর্মণের জন্য ব্যবহৃত পথ ব্যতীত অগ্নিকাণ্ড কালে প্রত্যেক জানালা দরজা বা বহির্গমন পথ স্পষ্টভাবে লাল রং দ্বারা বাংলা অক্ষরে বা সহজবোধ্য প্রকারে চিহ্নিত করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিককে অগ্নিকাণ্ড বা বিপদের সময় হুশিয়ার করার জন্য স্পষ্টভাবে শ্রবন যোগ্য হুসিয়ারী সংকেতের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং অগ্নীকাণ্ডের সময় বিভিন্ন বহির্গমনের পথে পৌছার সহায়ক একটি অবাধ পথের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যে প্রতিষ্ঠানের কোন জায়গায় দশজন বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত থাকেন অথবা বিস্ফোরক বা অতিদাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয় বা গুদামজাত করা হয় সেই প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ড কালে বহিগর্মনের উপায় সম্পর্কে সকল শ্রমিকেরা যাহাতে সুপরিচিত থাকেন বা শ্রমিকদের কি কি করণীয় হইবে তৎ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পঞ্চাশ বা ততোধিক শ্রমিক/কর্মচারী সম্বলিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর অন্ততঃ সম্ভব হলে ০৬ মাস অন্তর অগ্নি নির্বাপন মহড়ার আয়োজন করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় একটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

ধারা-৭২, মেঝে, সিঁড়ি এবং যাতায়াত পথ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সকল মেঝে, সিঁড়ি চলাচল পথ মজবুত ভাবে নির্মাণ করিতে হইবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মজবুত রেলিং এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। কর্মস্থলে সকল ফ্লোর, চলাচলের পথ ও সিঁড়ি পরিচ্ছন্ন, প্রশস্থ এবং বাধা-বন্ধকহীন হইতে হইবে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধান থাকিতে হইবে। শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, চিকিৎসক, ক্যান্টিন ও বিশ্রাম কক্ষ থাকিতে হইবে। যে সকল প্রতিষ্ঠানে চল্লিশ বা ততোধিক মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এইরূপ প্রতিষ্ঠানে তাহাদের ০৬ বছরের কম বয়সী শিশু সন্তানগণের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক কক্ষের

ব্যবস্থা থাকিতে হবে। উক্ত কক্ষে যথেষ্ট স্থান সংস্থান, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং কক্ষটি শিশুদের পরিচর্যার জন্য অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলার তত্ত্বাবধানে থাকিবে। মুক্ত বাতাস সংরক্ষণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

ধারা-৬২, যদি কোন পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা উহার কোন অংশ বিশেষ উহার কোন পথ, যন্ত্রপাতি অথবা প্ল্যান্ট এমন অবস্থায় আছে যে, উহা মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ তাহা হইলে তিনি প্রতিষ্ঠানের মালিকের উপর লিখিত আদেশ জারী করিয়া উহাতে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, (ক) উক্ত ভবন, রাস্তা, যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট নিরাপদভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা উহা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নকশা এবং অন্যান্য তথ্য বা বিবরণ সরবরাহ করা; (খ) কোন নির্দিষ্ট অংশের মান বা শক্তি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং উহার ফলাফল পরিদর্শককে অবহিত করা।

কলকারখানার পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে পরিমিত জ্ঞানের অভাবে শ্রমিক মালিকদের বহুল প্রত্যাশার নির্মম পরিনতি ঘটাচ্ছে। এই সকল অব্যবস্থা দূরীভূত করার প্রয়োজনে;

ক শ্রম পরিদপ্তর/কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিটি শিল্প সংগঠনের অন্ততঃ ২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে শ্রম আইনের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণ সেমিনারের মাধ্যমে সম্যক জ্ঞানদান;

গ এবং পরিশেষে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কে ভালোভাবে বিন্যাস ও পুনঃ বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়ন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কে আরো যুগোপযোগী করার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করতঃ এক মাস সময় বেধে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রস্তাবিত কমিটিঃ

১। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব- আহ্বায়ক

২। শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা- সদস্য

৩। আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা-সদস্য

৪। জাতীয় পর্যায়ের একজন শ্রমিক নেতা-সদস্য

৫। বি.জি.এম.ই.এ এর একজন কর্মকর্তা-সদস্য

৬-৭। লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশনের ২ জন সদস্য।

এই কমিটি বর্তমান আইনকে পুনরায় যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়নের সুপারিশ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে, মন্ত্রণালয়ে দাখিল করলে, মন্ত্রণালয় যথাশীঘ্র আইনটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে যথা বিহীত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

মে দিবসের চেতনাঃ শ্রম ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাবনা

মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার
সহকারী শ্রম পরিচালক
শ্রম পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৮৮৬ সনে আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষ তাদের অধিকার আদায়ের দাবীতে যে আন্দোলন সংগ্রাম ও আত্মাহুতি দিয়েছে তার প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে ঐতিহাসিক মে দিবস। মে দিবসের এ চেতনাকে পুঞ্জিভূত করে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ যুগে যুগে ধাপে ধাপে বিভিন্ন দেশে তাদের শ্রমের বিনিময়ে জীবন জীবিকার অধিকার আদায়ে প্রেরণা ও সাহস পেয়েছে। বিশ্বের সকল দেশের মানুষ আজ একটি আধুনিক শ্রম আইন ও শ্রম নীতিমালার মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে,প্রতিষ্ঠিত করেছে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) যেমন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে,তেমনি ভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ কলখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম পরিদপ্তর, শ্রম আদালত, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, এনএসডিসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেশে অবস্থিত শ্রমিকদের কল্যাণে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান এবং দেশে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষ, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমজীবী মানুষের সংস্থার এবং দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে বসবাসকারী শ্রমজীবী মানুষের পরিবার পরিজনের সার্বিক কল্যাণ ও যোগাযোগের জন্য প্রয়োজন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল শ্রম ব্যবস্থাপনা এখন সময়ের চাহিদা। সরকারের ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির সেবা এখন প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ, হাট- বাজার এমনকি চর অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। সে লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তর সমূহে তথ্য প্রযুক্তির পরিসেবা চালু করেছে। নিম্নে শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং তন্মধ্যে অনলাইন সেবাসমূহ সুচারুভাবে উপস্থাপন করা হ'ল ঃ

শ্রম পরিদপ্তরের সেবাসমূহ ঃ

- ট্রেড ইউনিয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসুচি/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও বিনোদনমুলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;

শ্রম পরিদপ্তরের অনলাইন সেবাসমূহ ঃ

- অনলাইনে ট্রেড ইউনিয়ন/ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন/ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন এর নিবন্ধন;
- মালিক/শ্রমিকের পক্ষে অসদাচরণের অভিযোগে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) অনুযায়ী অভিযোগ দাখিল; এবং
- ডাটা ব্যাংকের মাধ্যমে শ্রম সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যাদি সংরক্ষণ;

অনলাইনে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রক্রিয়া ঃ

১। অনলাইনে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন আবেদন করার জন্য প্রথমে শ্রম পদিপ্তরের ওয়েবসাইট www.dol.gov.bd প্রবেশ করতে হবে।

www.dol.gov.bd

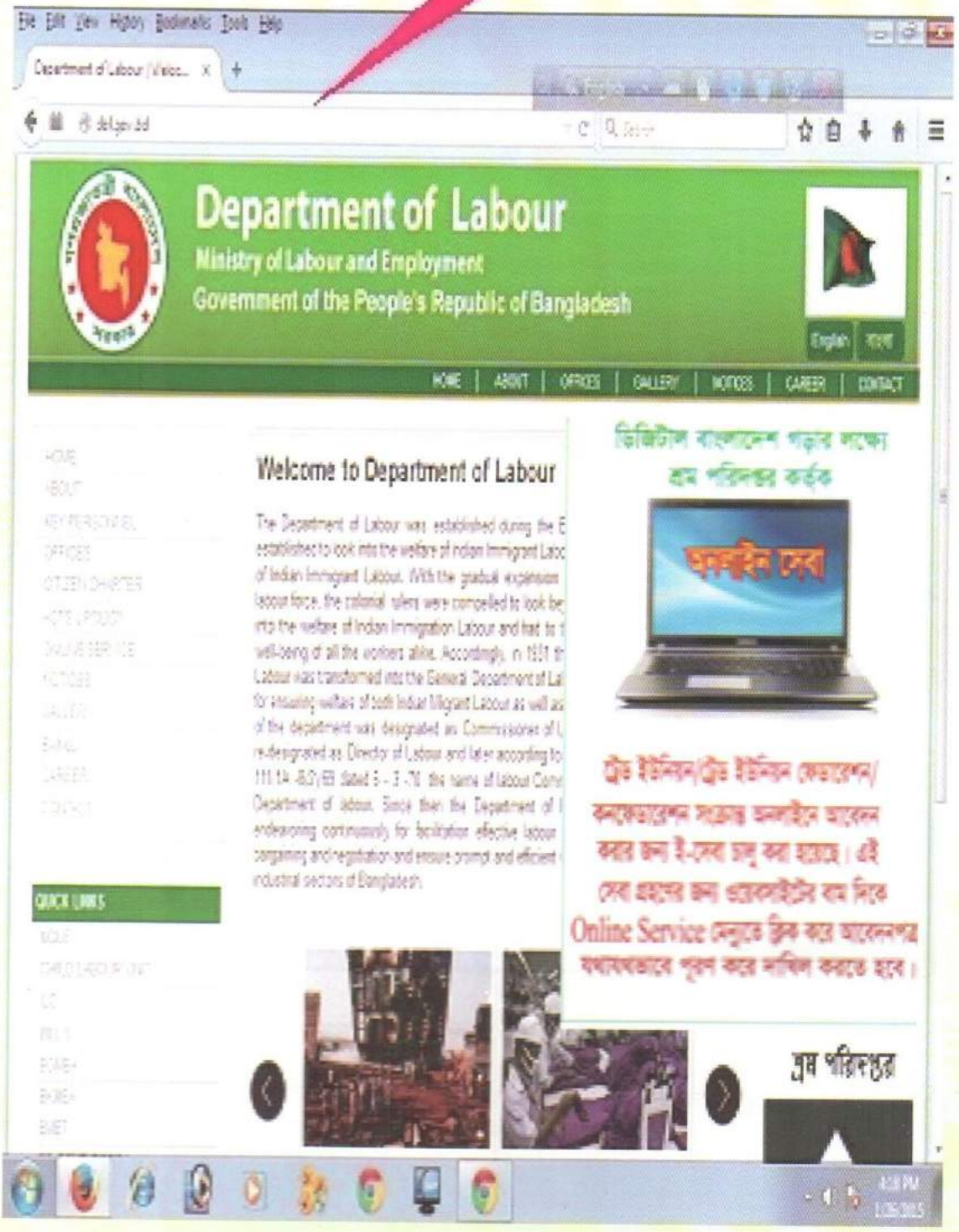

২। এরপর ওয়েবসাইটের বাম দিকে Online service মেন্যুতে ক্লিক করতে হবে।

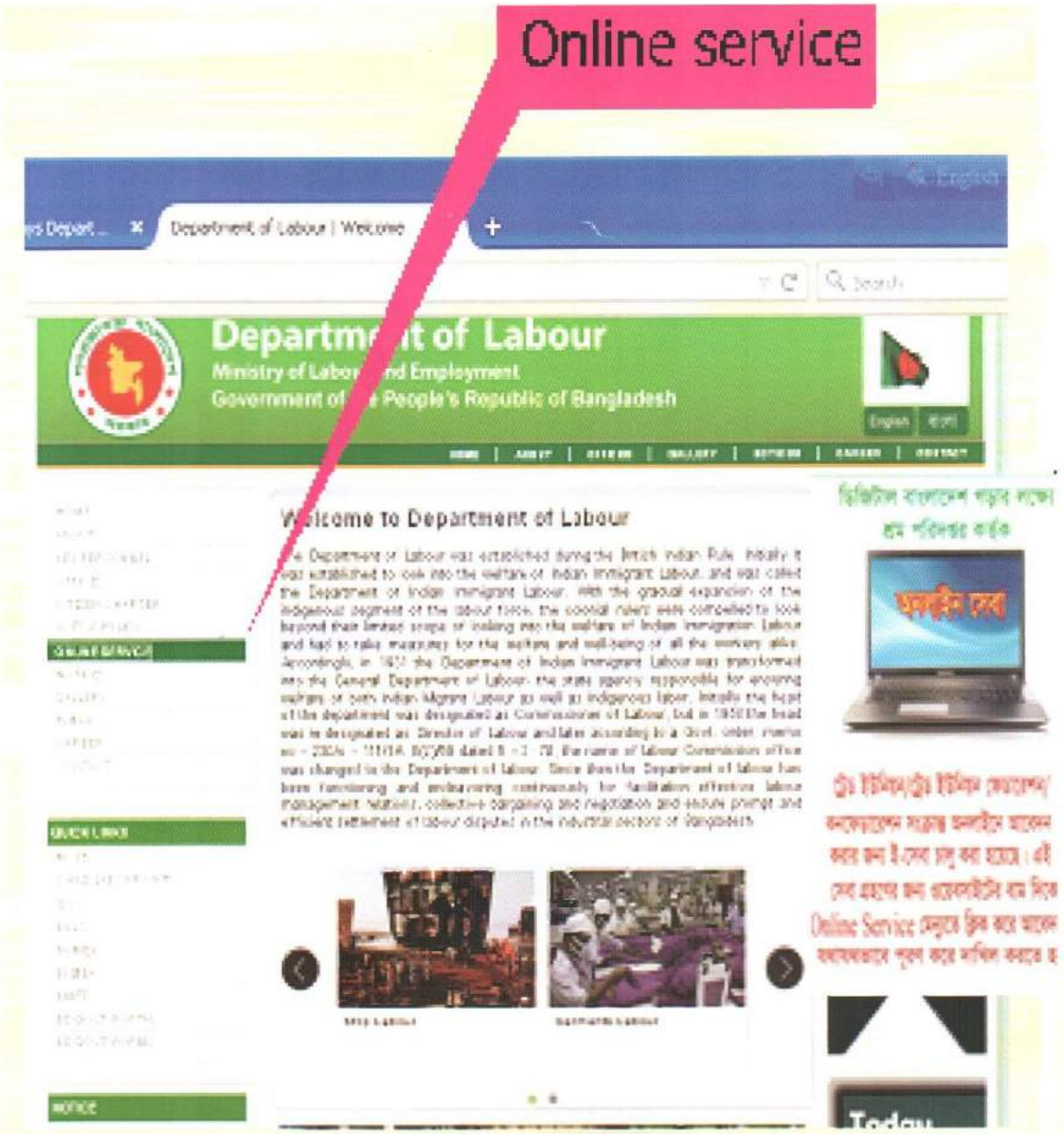

৩। এরপর অনলাইন সেবা নামে একটি পেইজ চলে আসবে সেখানে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন নামে একটি মেন্যু থাকবে। এর সাব মেনুতে ট্রেড ইউনিয়ন বাটনে ক্লিক করার পর আবেদনের Form চলে আসবে।

অনলাইন সেবা

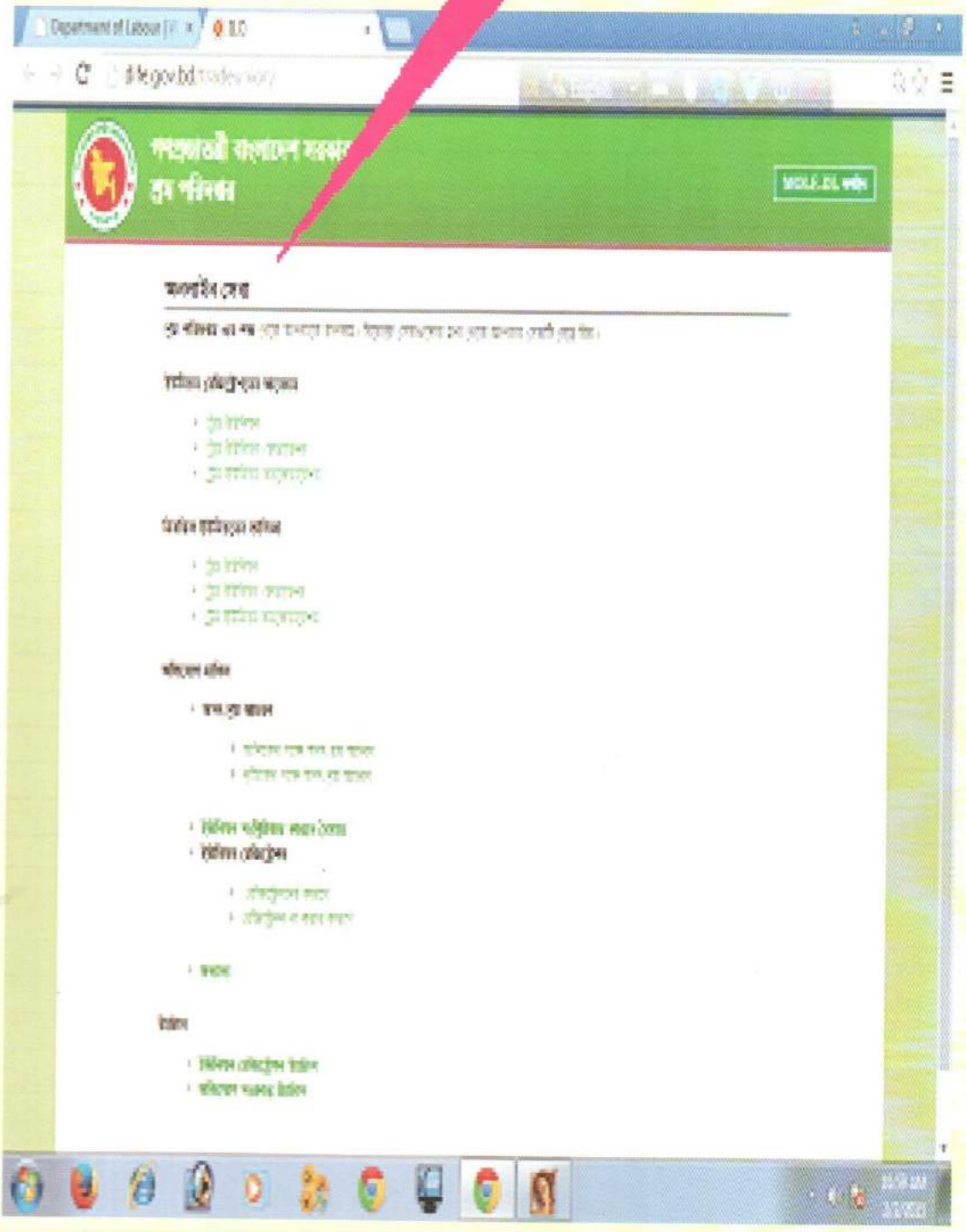

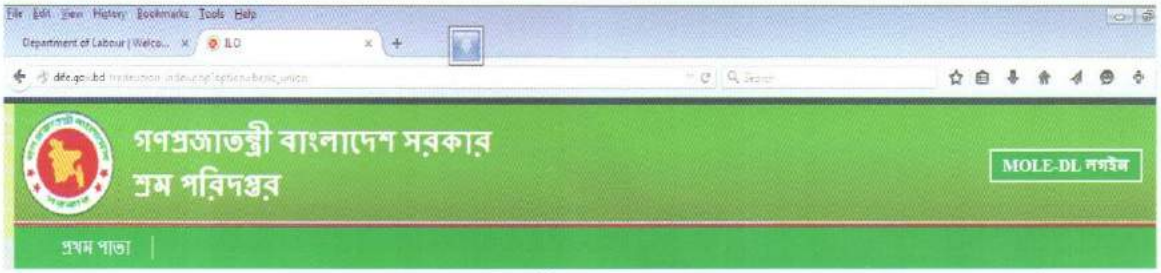

(* অবশ্যই পূরনীয় রেজিষ্ট্রেশন নিয়ম জানার জন্য ডাউনলোড বাটুন ক্লিক করুন)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এর আবেদন পত্র

১. প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নের নাম * :	
২. ন্যাশনাল* :	☐ ঢাকা ☐ রাজশাহী ☐ বরিশাল ☐ খুলনা ☐ চট্টগ্রাম ☐ রংপুর ☐ সিলেট
৩. বিভাগ * :	
৪. জেলা * :	
৫. সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা * :	
৬. প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নের কার্যালয়ের ঠিকানা	
৭ ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে)	
৮. টেলিফোন নাম্বার (যদি থাকে)	
৯. প্রতিষ্ঠানের নাম *	
১০. প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয?নের সংখ্যা*	
১১. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা *	
১২. কর্মরত/নিযুক্ত মোট শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা	
১৩. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের তারিখ *	
১৪. সভাপতির নাম *	
টেলিফোন/মোবাইল *	
১৫. সম্পাদকের নাম *	
টেলিফোন/মোবাইল *	
১৬. ট্রেড ইউনিয়ন সেক্টর *	
১৭. ট্রেড ইউনিয়ন ধরণ*	

১৮. সংযুক্তি দাখিল * (ইউনিয়ন গঠন সংক্রান্ত)	সফট কপি (পি ডি এফ ফাইল)	হার্ড কপি
সভার নোটিশের কপি *	Browse No file Selected	☐
সভার সিদ্ধান্তের কপি সমূহ*	Browse No file Selected	☐
চাঁদা দাতা সদস্যদের তালিকা *	Browse No file Selected	☐
কার্যকরী কমিটির তালিকা *	Browse No file Selected	☐
গঠনতন্ত্রের কপি *	Browse No file Selected	☐
গঠনতন্ত্রের অনুমোদন সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী *	Browse No file Selected	☐
রেজিষ্ট্রীকরণের জন্য দরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত সভার কার্যিবিবরণী *	Browse No file Selected	☐

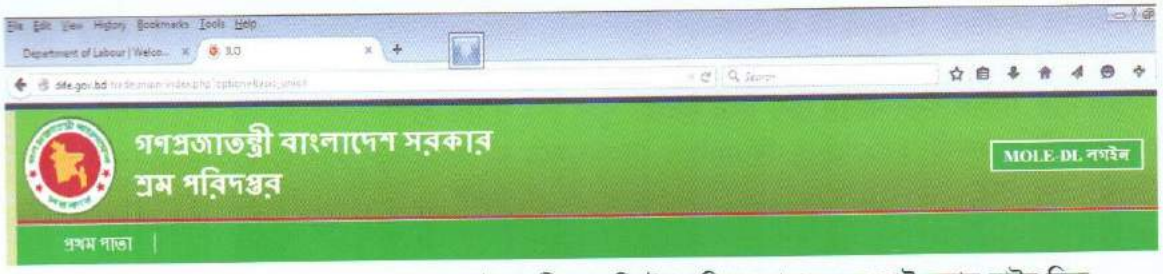

(* অবশ্যই পূরনীয় রেজিস্ট্রেশন নিয়ম জানার জন্য ডাউনলোড বাটুন ক্লিক

(ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এর আবেদন পত্র একটি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন পত্রের নমুনা)

১. প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নের নাম * :	ডি, এন স্পোর্টস লিঃ শ্রমিক ইউনিয়ন
২.ন্যাশনাল*	ঢাকা ☐ রাজশাহী ☐ বরিশাল ☐ খুলনা ☐ চট্টগ্রাম ☐ রংপুর ☐ সিলেট
৩. বিভাগ * :	ঢাকা
৪. জেলা * :	ঢাকা
৫. সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা * :	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
৬. প্রস্তাবিত ট্রেড ইউনিয়নের কার্যালয়ের ঠিকানা *	এইচ/৬১ (৪র্থ তলা), নিউ এয়ারপোর্ট রোড, আমতলী, মহাখালী
৭ ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে)	প্রযোজ্য নয়
৮. টেলিফোন নাম্বার (যদি থাকে)	প্রযোজ্য নয়
৯. প্রতিষ্ঠানের নাম *	ডি, এন স্পোর্টস লিঃ শ্রমিক ইউনিয়ন
১০. প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা*	১
১১. প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা *	এইচ/৬১ (৪র্থ তলা), নিউ এয়ারপোর্ট রোড, আমতলী, মহাখালী
১২. কমর্রত/নিযুক্ত মোট শ্রমিক-কর্মচারী সংখ্যা	১০০
১৩. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের তারিখ *	১০/১২/২০১৪
১৪. সভাপতির নাম *	সেলিনা
টেলিফোন/মোবাইল *	০১০০০০০০০০০
১৫. সম্পাদকের নাম *	মোঃ শফিকুল ইসলাম
টেলিফোন/মোবাইল *	০১০০০০০০০০০
১৬. ট্রেড ইউনিয়ন সেক্টর *	গার্মেন্টস
১৭. ট্রেড ইউনিয়ন ধরণ*	বিভাগীয়

১৮. সংযুক্তি দাখিল * (ইউনিয়ন গঠন সংক্রান্ত)	সফট কপি (পি ডি এফ ফাইল)	হার্ড কপি
সভার নোটিশের কপি *	সভার নোটিশের কপি *	☑
সভার সিদ্ধান্তের কপি সমূহ*	সভার সিদ্ধান্তের কপি সমূহ*	☑
চাঁদা দাতা সদস্যদের তালিকা *	চাঁদা দাতা সদস্যদের তালিকা *	☑
কার্যকরী কমিটির তালিকা *	কার্যকরী কমিটির তালিকা *	☑
গঠনতন্ত্রের কপি *	গঠনতন্ত্রের কপি *	☑
গঠনতন্ত্রের অনুমোদন সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী *	গঠনতন্ত্রের অনুমোদন সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী *	☑
রেজিষ্ট্রীকরণের জন্য দরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী *	রেজিষ্ট্রীকরণের জন্য দরখাস্ত করার ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী *	☑

স্বত্ব - ২০১৪, শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পূববর্তী	প্রিন্ট করুন	দাখিল করুন

৪। এরপর নির্ধারিত Form টি যথাযথভাবে পূরণ করে ফরম এর নিচে পরবর্তী অংশে ক্লিক করতে হবে। এরপর ফরমটির নিচে তিনটি বাটন যেমন পূর্ববর্তী, প্রিন্ট করুন, দাখিল করুন দেখা যাবে। শতভাগ নির্ভুল ও নিশ্চিত হয়ে দাখিল করুন বাটনে ক্লিক করে ফরমটি পূরন শেষ করতে হবে।
৫। পরবর্তীতে একটি Tracking Number দেওয়া হবে যা পরবর্তীতে আবেদনের Status জানার জন্য ব্যবহার করা যাবে।

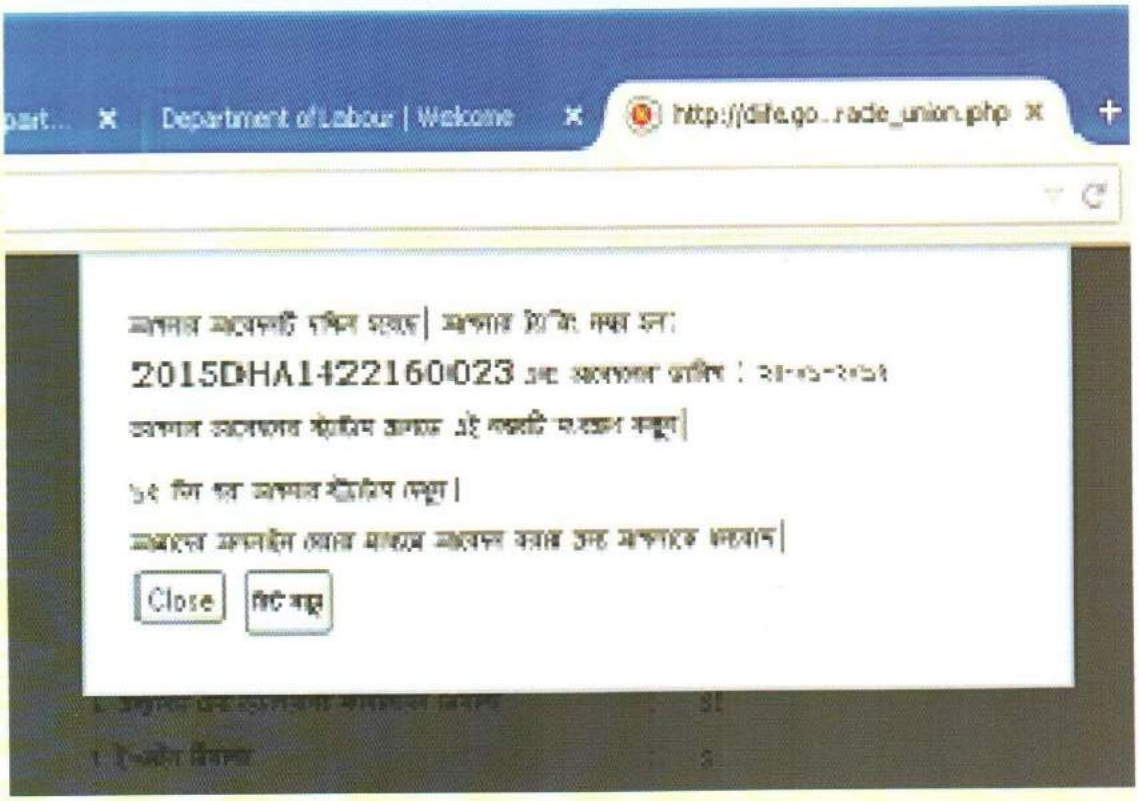

মালিক বা শ্রমিকের পক্ষে অসদাচরনের বিষয়ে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল ঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অদ্যাবধি সংশোধন অনুযায়ী মালিক বা শ্রমিক কর্তৃক যে কেউ সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া ঃ

১। প্রথমে Online Service এ ক্লিক করলে অভিযোগ দাখিল মেনু আসবে। এর নিচে অসৎশ্রম আচরন (মালিকের পক্ষে/ শ্রমিকের পক্ষে) ক্লিক করলে নির্ধারিত ফরমটি চলে আসবে। ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করে পরবর্তী অংশে ক্লিক করতে হবে।

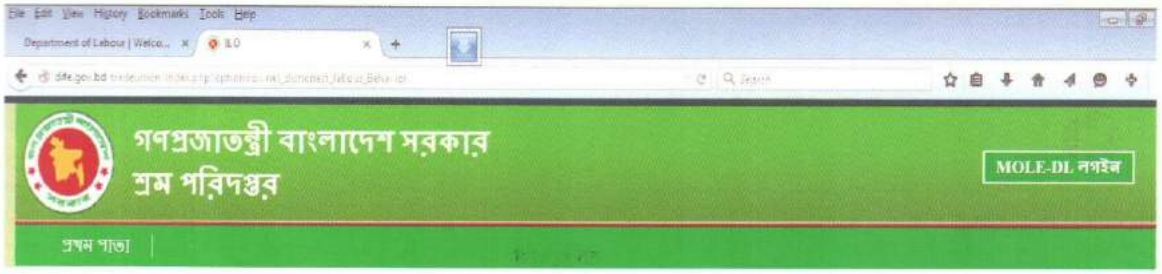

অভিযোগ

মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ

নাম *	
পদবি *	
আইডি *	
বর্তমান ঠিকানা *	
স্থায়ী ঠিকানা *	
টেলিফোন নাম্বার *	
প্রতিষ্ঠানের নাম *	
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা *	
অভিযোগের বিষয় *	
বিবিধ *	

ধারা

✓ ১৯৫। কোন মালিক অথবা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাহাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি- (ক) কোন চাকুরী চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের কোন ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করা অথবা কোন ট্রেড ইউনিয়নে উহার সদস্য পদ চালু রাখার অধিকারের উপর বাধাসম্বলিত কোন শর্ত আরোপ করিবেন না;

✓ ১৯৫। কোন মালিক অথবা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাহাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি- (খ) কোন শ্রমিক কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা আছেন অথবা নহেন-এই অজুহাতে তাহার চাকুরীতে নিয়োজিত করিতে অথবা নিয়োজিত রাখিতে অস্বীকার করিবেন না;

✓ ১৯৫। কোন মালিক অথবা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাহাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি- (ঙ) কোন শ্রমিককে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন সুযোগ দিয়া বা সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া অথবা তাহার জন্য সুযোগ সংগ্রহ করিয়া অথবা সংগ্রহ করার প্রস্তাব দিয়া তাহাকে কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হইতে বিরত রাখার জন্য অথবা উক্ত পদ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করিবেন না;

✓ ১৯৫। কোন মালিক অথবা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাহাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি- (চ) ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শন, কোন স্থানে আটক, শারীরিক আঘাত, পানি, শক্তি এবং টেলিফোন সুবিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া অথবা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিয়া কোন যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি কর্মকর্তাকে কোন চুক্তিতে উপনীত হওয়ার অথবা নিষ্পত্তিনামায় দস্তখত করার জন্য বাধ্য করিবেন না বা বাধ্য করার চেষ্টা করিবেন না;

অভিযোগ
মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ

(একটি অভিযোগ পত্রের নমুনা)

নাম *	মোঃ রফিকুল ইসলাম
পদবি *	অপারেটর
আইডি *	১৫৪
বর্তমান ঠিকানা *	১২/ই মালিবাগ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা *	১২/ই মালিবাগ, ঢাকা
টেলিফোন নাম্বার *	০১০০০০০০০০০
প্রতিষ্ঠানের নাম *	ডি, এন স্পোর্টস লিঃ
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা *	**এইচ/৬১ (৪র্থ তলা), নিউ এয়ারপোর্ট রোড, আমতলী, মহাখালী**
অভিযোগের বিষয় *	ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বাধা
বিবিধ *	

ধারা

১৯৫। কোন মালিক অথবা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাহাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি- (ক) কোন চাকুরী চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের কোন ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করা অথবা কোন ট্রেড ইউনিয়নে উহার সদস্য পদ চালু রাখার অধিকারের উপর বাধাসম্বলিত কোন শর্ত আরোপ করিবেন না;

১৯৫। কোন মালিক অথবা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাহাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি- (খ) কোন শ্রমিক কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা আছেন অথবা নহেন-এই অজুহাতে তাহার চাকুরীতে নিয়োজিত করিতে অথবা নিয়োজিত রাখিতে অস্বীকার করিবেন না;

১৯৫। কোন মালিক অথবা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাহাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি- (খ) কোন শ্রমিক কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা আছেন অথবা নহেন-এই অজুহাতে তাহার চাকুরীতে নিয়োজিত করিতে অথবা নিয়োজিত রাখিতে অস্বীকার করিবেন না;

১৯৫। কোন মালিক অথবা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তাহাদের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি- (ঙ) কোন শ্রমিককে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন সুযোগ দিয়া বা সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া অথবা তাহার জন্য সুযোগ সংগ্রহ করিয়া অথবা সংগ্রহ করার প্রস্তাব দিয়া তাহাকে কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হইতে বিরত রাখার জন্য অথবা উক্ত পদ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করিবেন না;

স্বত্ব - ২০১৪, শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পূববর্তী	প্রিন্ট করুন	দাখিল করুন

২। এরপর ফরমটির নিচে তিনটি বাটন যেমন পূর্ববর্তী, প্রিন্ট করুন, দাখিল করুন দেখা যাবে । শতভাগ নির্ভুল ও নিশ্চিত হয়ে দাখিল করুন বাটনে ক্লিক করে ফরমটি পূরন শেষ করতে হবে।

৩। পরবর্তীতে একটি Tracking Number দেওয়া হবে যা পরবর্তীতে আবেদনের Status জানার জন্য ব্যবহার করা যাবে ।

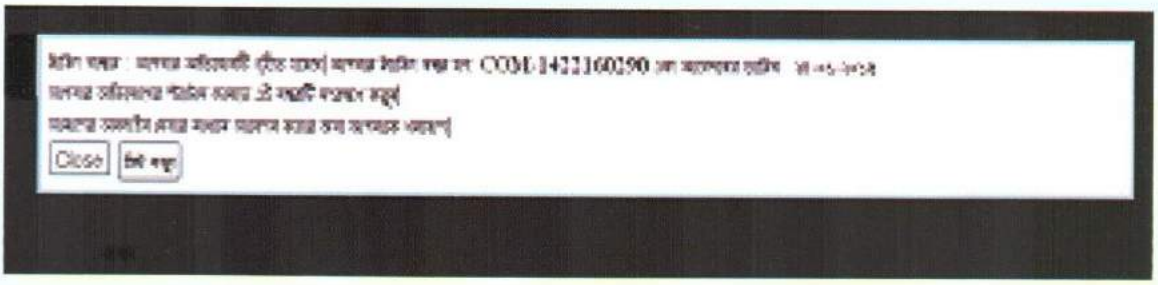

আধুনিকীকরণ মানুষের জীবন যাত্রার একটি দু'টি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনলে সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। ইহা একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া, যা মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের সূচনা করে। আধুনিকীকরণ সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টিংটনের দু'টি মতবাদ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, তা হচ্ছে "সামাজিক গতিশীলতা (Social mobility) ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development)।" আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সূচক গুলো যেমন তর তর করে ওপরের দিকে উঠছে তেমনিভাবে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক সূচকগুলোর উন্নয়ন হচ্ছে না। সামাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা না থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেশীদুর এগুতে পারবে না। তাই আমাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে সমান তালে উন্নয়ন ও গতিশীলতা আনয়ন করতে হবে। আশা করি শ্রম ক্ষেত্র তার ব্যতিক্রম না। তাই শ্রম ক্ষেত্রে সর্বত্র ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির সেবা চালু করতে হবে। বর্তমানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তর সমূহে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে কিছু কিছু সেবা চালু করা হয়েছে। এ দপ্তরগুলোর ওয়েব সাইটে মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলো সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আদালত, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউণ্ডেশনসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় জনকল্যাণ ও সেবা মূলক কার্যক্রমকে সরকারের প্রদত্ত ডিজিটাল নীতিমালার আওতায় আনতে হলে উক্ত দপ্তরগুলোতে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল পদায়ন এবং দপ্তরগুলোকে প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে। প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ের শ্রম দপ্তরে নিজস্ব ওয়েব সাইট তৈরী করতে হবে । এর ফলে প্রচলিত নানা প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ কমে যাবে এবং সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং সোনার বাংলাদেশ গড়তে হলে শ্রম ক্ষেত্রে সর্বত্র ডিজিটালাইজড করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা একটি ডিজিটাল শ্রম ব্যবস্থপনা । এটা করতে পারলে মহান মে দিবস ও আমাদের মহান স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী শ্রমজীবী মানুষের চেতনা বাস্তবায়ন হবে।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

মে দিবসের চেতনায় শ্রমিকের অধিকার

মোঃ শফিকুর রহমান
সহকারী শ্রম পরিচালক
আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়টি দিবস চিরস্মরণীয় হয়ে আছে সেগুলোর মধ্যে মে দিবস অন্যতম। এই দিবসটি সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করে অন্য কোন ঘটনা ততটুকু করে না । এই দিনটি হচ্ছে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের দিন। এই দিনটির উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকদের অবদান ও আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল দিনটিকে স্মরণ করা হয়।

শ্রমজীবী মানুষের প্রেরণা ও উৎসাহের দিন ১লা মে, ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, কি ঘটেছিল এইদিন । এইদিনে আমেরিকার শিকাগো শহরে শোষিত, নির্যাতিত শ্রমিকগণ ৮ ঘন্টা কর্ম, ৮ ঘন্টা বিনোদন ও ৮ ঘন্টা বিশ্রামের দাবিতে ধর্মঘট ডাকে। এই দিনটির পূর্বে শ্রমিকগণের কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না, কাজের নিরাপত্তার পরিবেশ ছিল না, নানা ঝুঁকি ও অব্যবস্থাপনার মধ্যে ১০ থেকে ১৬ ঘন্টা নির্মমভাবে কাজ করতে হতো। তাই তারা শোষক শ্রেণীর অত্যাচারের প্রাচীর ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য বিক্ষোভের সূচনা করেছিল। নির্যাতিত মানুষের চোখে মুখে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা যে, তাদের চিরদিন যারা শোষণ করেছে, যাদের জন্য জীবনের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে গড়ে তুলেছে মুনাফার পাহাড় তাদের দাম্ভিকতা আজ ধুলোয় মিশিয়ে দিবে। এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল তিন (০৩) লক্ষাধিক শ্রমিক। শোষক শ্রেণী শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে অঙ্কুরেই চিরদিনের জন্য ধুলোয় মিশিয়ে দিতে তাদের উপর পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। পুলিশের বন্দুকের গুলিতে ১০ জন শ্রমিক নিহত হয়। রক্তে রঞ্জিত হয় রাজ পথ। শোষক শ্রেণী শুধু গোলা বর্ষন করেই শান্ত হয় নি তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয় এবং সাজানো মামলা হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ৪ জনকে ফাঁসি দেয়া হয় তবুও তাদের আন্দোলন থমকে যায়নি। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের দাবি ৮ ঘন্টা কর্ম। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন ৮ ঘন্টা কর্মের দাবী আদায়ে শিকাগো শহরে আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতিবছর ১ লা মে দিনটি ঐক্যবদ্ধ ভাবে পালন করা হবে। তার পর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১ লা মে থেকে বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণী দিবসটি পালন করে আসছে আন্তর্জাতিক সংহতি ও উৎসবের দিন হিসেবে। এভাবেই শুরু হয় মে দিবস উদ্‌যাপন।

এদেশে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মে দিবস পালিত হয় নারায়ণগঞ্জে। মে দিবসের ছুটি চেয়ে দাবি উঠে সর্বত্র। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে সর্বত্র উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় "মে দিবস"। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশে মে দিবস পালিত হয় ব্যাপক ভাবে এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মে দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মে দিবসকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শ্রমিকদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অন্তর্ভূক্ত করা হয় যে, মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে সমাজ তান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা, যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার, কৃষক শ্রমিকের মুক্তি, মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করা, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা, কর্মকে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার ও কর্তব্যেকে সম্মানের বিষয়, যোগ্যতা অনুসারে স্বীয় কর্মের জন্য উপর্যুক্ত পারিশ্রমিক লাভ, সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায় সংগত সংগ্রামকে সমর্থন করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় ভাগে- মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সর্ব প্রকার বৈষম্য বিলোপ, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ, সকল

প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ করন, সংগঠনের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা ও বাক্ স্বাধীনতা, দেয়া হয়েছে। এসব থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে আমাদের সরকার ব্যবস্থা শ্রম বান্ধব। সর্ব প্রকার শোষণ থেকে শ্রমিকের রক্ষা ও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সারাদেশের সকল প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ও দক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন (শ্রমিকসংঘ) গঠনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আইনগত ভাবে ও সাংগঠনিক ভাবে শ্রমিকদের দক্ষ ভাবে গড়ে তোলার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান "শ্রম দপ্তর" সার্বিক ভূমিকা পালন করছে। এই দপ্তর শ্রমিকসংঘ গঠন থেকে শুরু করে তাদের সনদ প্রদান (শ্রমিকসংঘের) শ্রমিকদের শ্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ, আইনের আলোকে তাদের কি অধিকার আছে, কিভাবে শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি করতে হয়, কিভাবে বৈধ ভাবে ধর্মঘট ডাকা যায় এবং মালিক কিভাবে বৈধ লক আউট ডাকতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। তাছাড়া মালিক কিভাবে শ্রমিকের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা মধ্যস্থতা করে থাকে এবং মধ্যস্থায় না হলে কিভাবে আইনগত ভাবে শ্রম আদালতের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পাবে সে বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে। নিম্নে শ্রমিক অথবা মালিক গণ কিভাবে বৈধ ধর্মঘট বা লক আউট ঘোষণা করতে পারে এবং তা কিভাবে নিষ্পত্তি করতে হয় তার একটা রূপ রেখা নিম্নে দেয়া হল-

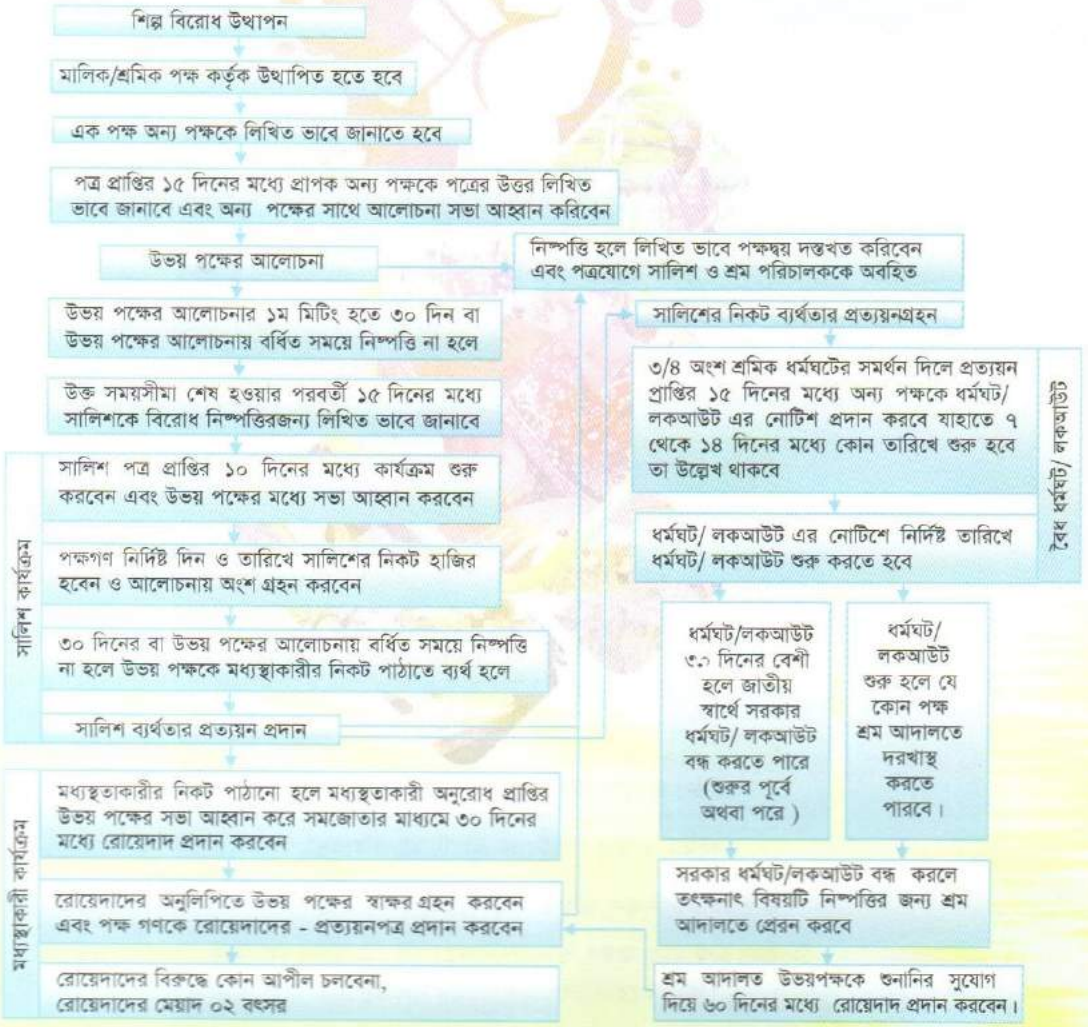

ছক ঃ শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি

আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ এই দিবসকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছে। এই দিবসের চেতনায় যে সকল দেশ যত বেশি শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি বেশি। এর কারন একটাই শ্রমিকরা যত বেশি নিরাপত্তা, উপর্যুক্ত মজুরী, কর্মপরিবেশ পাচ্ছে তাদের কর্মস্পৃহা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং উৎসাহ উদ্দীপনায় নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের উন্নতি হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতা "অংশ গ্রহন কমিটি" গঠনের মাধমে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এবং এটা যে কোন প্রতিষ্ঠানে চালু করতে পারলে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে অংশ গ্রহন কমিটির গঠন, কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হল:-

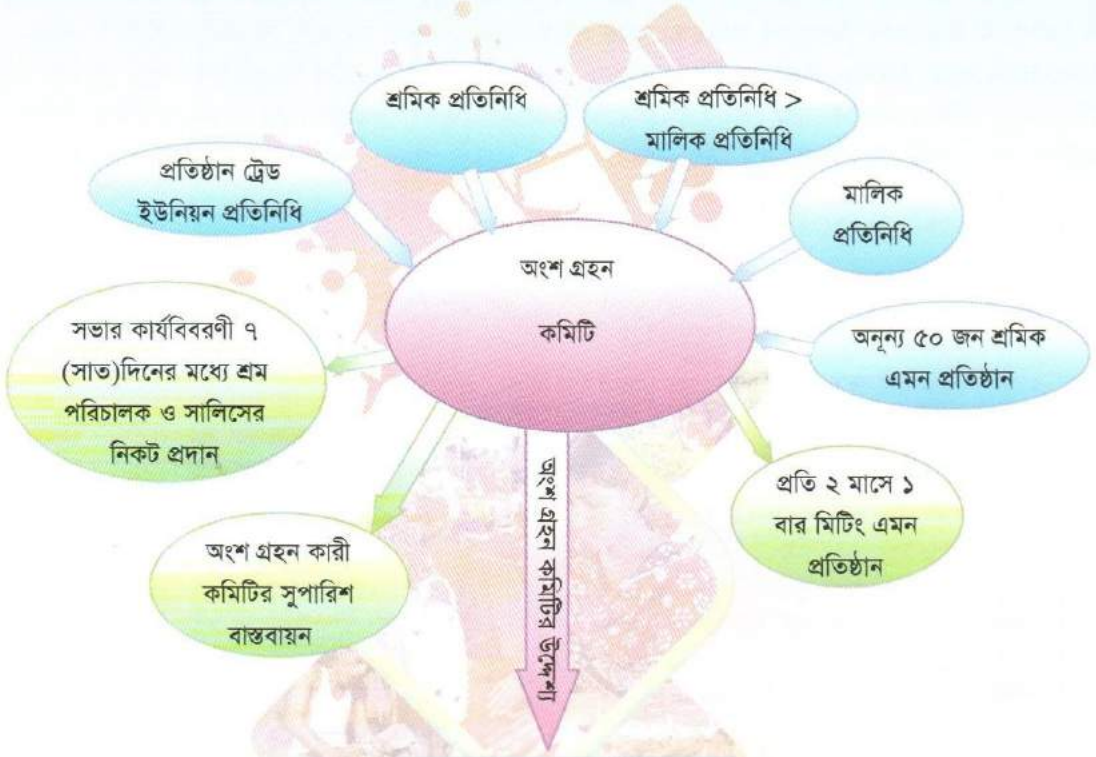

- শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা
- পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস,সমঝোতা ও সহযোগিতার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা
- প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকগণের অঙ্গিকার ও দায়িত্ব বোধ জাগ্রত করা
- শৃঙ্খলা বোধে উৎসাহিত করা, নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষা
- কাজের অবস্থার উন্নতি বিধান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা
- শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ মূলক ব্যবস্থা
- বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণ, শ্রমিক শিক্ষা পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণ
- উৎপাদন লক্ষ মাত্রা অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস অপচয় রোধ,উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নয়ন।

চিত্র ঃ অংশ গ্রহন কমিটির গঠন ও কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য

আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার কারন অনেক কলকারখানা গড়ে উঠছে এবং এতে অনেক শ্রমিক নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এর পাশাপাশি কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে যার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশানুরূপ দ্রুত ঘটছে না। যদি আমাদের দেশের শ্রমিকদের যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করা হতো তাহলে বিগত বছর সমূহের কলকারখানা গুলোতে যে সকল অপ্রীতিকর ও অকল্পনীয় দুর্ঘটনা ঘটেছে সেগুলো ঘটত না। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকরা জীবনের প্রথম পর্যায়ে গার্মেন্টস শ্রমিক ছিল। তাই দুর্ঘটনার মাধ্যমে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে যে অনেকেই গার্মেন্টসের মালিক হতে পারতো তা কখনই অস্বীকার করা যাবে না। তাদের ইউনিয়ন করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সকল প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই। যে গুলোতে আছে এসবের মধ্যে অনেক গুলোতে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকে লাগাম ছাড়া করা যাবে না। তাদের যেমন অধিকার দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি তাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর এমন কিছু করা যাবে না। ট্রেড ইউনিয়নগুলো যেন আইনগত ভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে সে বিষয়টা শ্রমিকদের ভালভাবে বোঝাতে হবে এবং এর পাশাপাশি মালিক পক্ষকে বুঝতে হবে কিভাবে একটি ইউনিয়ন থাকায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। সকল দ্বন্দ্বের মূল কারন ভুল বুঝাবুঝি আমাদের দেশের মালিক শ্রমিকরা এখনো গঠন মূলক ট্রেড ইউনিয়নের উপকারিতা বুঝতে পারছেন না। তাদের বুঝাতে হবে পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বি না হয়ে কিভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

শৃঙ্খলা ছাড়া শ্রমিকদের আজ হারানোর কিছুই নেই। বিভিন্ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোকে মে দিবসের চেতনায় শ্রমিক সমাজ নিজেদের অধিকার আদায়ের পন্থা উপলব্ধি করতে পারছে, তাদের মধ্যে ঐক্য বদ্ধ হওয়ার প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্রমেই তাদের অধিকার আদায়ের পন্থা সম্পর্কে তারা অভিজ্ঞ হয়ে উঠছে। বিভিন্ন কৌশলে সাময়িক ভাবে হয়তো তাদের বিভ্রান্ত করা সম্ভব, কিন্তু দীর্ঘ দিনের সংগ্রামী অভিজ্ঞতাই তাদের সঠিক পথে নিয়ে যাবে। তারা এগিয়ে চলছে এক নতুন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে। শ্রমিকদের গর্ব, অনুপ্রেরণা এই শপথের দিন মহান মে দিবসের চেতনায় তারা তাদের হারানো শৃঙ্খলা ফিরে পাবে এবং শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এটাই হোক আজকের দিনে প্রত্যাশা।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

Tips to prevent fire in the workplace

Md. Omar Faruq
Assistant Director
OSHE foundation.

Tips for you and your workers to follow for maximum fire safety in your workplace:

1. Accessibility - Always ensure accessibility to electrical control panels. Material or equipment stored in front of the panels would hinder the shutdown of power in an emergency. Also, never block sprinklers, firefighting equipment or emergency exits and observe clearances when stacking materials.

2. Good housekeeping - Clutter not only provides fuel for fires, but also prevents access to exits and emergency equipment. Keep your workplace as clutter-free as possible.

3. Proper waste disposal - Discard fire hazards like oily rags by placing them in a covered metal container and emptying it on a regular basis.

4. Maintenance - Make sure the machines in your workplace are properly maintained to prevent overheating and friction sparks.

5. Report electrical hazards - Unless you are qualified and authorized, you should never attempt electrical repairs. Faulty wiring and malfunctioning electrical equipment are key contributors to workplace fires.

6. Safe chemical use & storage - Always read the label and the Material Safety Data Sheet (MSDS) to assess flammability and other fire hazards of a substance. When using and storing chemical materials, always do so in an area with adequate ventilation.

7. Precautions in explosive atmospheres - Follow all recommended and required precautions to prevent ignition in potentially explosive atmospheres, such as those containing flammable liquid vapors or fine particles. These precautions include non-sparking tools and proper static electricity control.

8. Maximum building security - To help prevent arson fires, always lock up as instructed, report suspicious persons or behavior and never leave combustible garbage outside near your building.

9. Smoke areas - Always ensure that there is a smoke area available and that all workers who smoke on the job are using it. Proper extinguishing of smoking materials should always be enforced.

10. Fully charged fire extinguishers - Check fire extinguishers often by looking at the gauges and making sure they're fully charged and ready for use. If they're not fully charged or if the attached tag indicates that the last inspection occurred more than a month ago, call for maintenance. Also, encourage all workers to learn how to use a fire extinguisher.

11. Emergency numbers - Emergency phone numbers, as well as your company address, should be posted by the phone station for quick access.

Making sure your workers return home safely is our mission and passion. Take these 11 tips to your workplace and practice true fire safety, which begins before the fire even ignites.

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

Steps taken by Government and Other Related Stakeholders after Rana Plaza Collapse at Savar on 24th April 2013:

Mikail Shipar
Secretary
Ministry of Labour & Employment

Ministry of Labour & Employment:

Immediate after Tazreen Fire incident and tragic collapse of Rana Plaza, the Government has taken various steps to improve overall workplace safety and compliance, as well as made some commitments to international community which includes adoption of a National Tripartite Plan of Action by the constituents, implementation of the Sustainability Compact and the US Action Plan focusing on legislation and policy reform, administration and practical actions.

1. Amendment of Labour Law: The Bangladesh Labour Act, 2006 has been amended on July 2013 to ensure workers' safety, welfare and rights and promoting trade unionism and collective bargaining. In line with this, the National Occupational Health and Safety Policy has been adopted by the Government in 2013.

2. Trade union registration: After amendment of Labour Act, 2006 trade union registration situation in the RMG sector has got a momentum. Till 20 April, 2015 more than 300 new trade unions have been registered in the RMG sector. ILO has started training program for the office bearers of newly formed unions.

3. Formulation of rules: A committee headed by the Secretary, Ministry of Labour & Employment has been working to formulate the rules of the Bangladesh Labour Act. Consultation on the draft with different stakeholders is going on and hopefully the draft will be finalized within the shortest possible time.

4. Up-gradation of DIFE: The Government, through an accelerated process, upgraded the Directorate of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) to a Department with 993 staff. By this time one Additional Secretary level officer has joined as Inspector General. Recently with the help of Public Service Commission (PSC) government has recruited 218 Inspectors against vacant posts. Now total number of Inspectors working in this department is 285.

5. Training Labour Inspectors: After up-gradation the DIFE, with the support of ILO, has arranged different trainings for the Inspectors. Some examples of the training program are given below:

ⓐ **110 Inspectors** have taken 4 days training on "Introductory Course for Labor Inspectors",

ⓑ **96 Inspectors** have taken 3 days training on 'Labor laws and Inspection Technique",

ⓒ **123 Inspectors** have taken 5 days training on training on "Labor Inspection Induction",

ⓓ **40 Inspectors** have taken 3 days training on "Basic Introductory Course for Labor Inspectors",

ⓔ **20 Inspectors** have taken 5 days training on "Training for Master Trainers",

ⓕ **12 Inspectors** have 2 days "International OSH Regulation Training Course",

ⓖ **52 Inspectors** have taken 2 days "In house Refreshers Course",

ⓗ **37 Inspectors** have taken 5 days training on "Labors Law and Labor Inspection Training",

ⓘ **12 from DIFE and 2 from MOLE** have taken training to prepare Inspection Plan for DIFE in ITC-ILO, Turin, Italy

ⓙ Beside these, the Inspectors also participate in different seminars, workshops and meetings with ILO, GIZ and others.

6. Publicly Accessible Database: The DIFE with support of ILO, has **developed** a publicly accessible database of 3743 export-oriented RMG factories on **30 March 2014.** The database is available at the website of the Department of Inspection for Factories and Establishment (http://database.dife.gov.bd/). It includes related information of all export-oriented RMG factories including names and addresses, number of workers etc. It also includes summary safety assessment reports for **1006 factories** (ACCORD of 607 factories; ALLIANCE of 154 factories and **BUET** of 244 **factories**) which may be viewed at the website of DIFE (http://database.dife.gov.bd/reports /safety-assessment-reports).

7. Hot line (help line): With the Department of Inspection for Factories & Establishments a help line, on pilot basis, has been established in RMG prone area at Ashulia, Dhaka on 15th March 2015. The number of the help line is 0800-4455000

8. Minimum Wages: The Government has declared the minimum wages for the workers of the readymade garments industry with an increase of 77% from the previous one. It has been implemented since 01 December 2013. Now the minimum wage of garments workers is Tk 5300/- which is about US$ 68.

9. Additional Budget for the DIFE: The Government has allotted about 23 Crore for the DIFE for pay and allowances and other related activities in 2014-15 financial year which is about triple in comparison to 2013-14 financial year.

10. Inspection Plan and Inspection Policy: Annual inspection plan for 2015 for the DIFE has developed and formulation of inspection policy is underway.

11. Regular inspections: Guided by the BLA, 2006 regular inspections are being carried out by the inspectors of DIFE. Enforcement of the law is ensured through inspections. In the current year a total of 7406 factories have been inspected. This includes 962 RMG factories. In case of noncompliance, the factory owners are noticed to rectify and cases are filed against the factory owners for failing to rectify. This year 330 cases have been filed against the factory owners for non complacence issues.

12. Tripartite National Plan of Action: A Tripartite National Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the RMG Sector was adopted with the assistance of ILO. To implement the Plan of Action a sixteen members Tripartite Committee headed by Secretary Ministry of Labour & Employment has been formed. In line with the Plan of Action ILO has been implementing a project "Improving Working Condition in the RMG Sector of Bangladesh" of $24.5 million under the Ministry of Labour & Employment. The following areas of intervention have been identified in the project:

(a) Verification of building and fire safety of the factories;
(b) Strengthening inspection activities;
(c) Training on Occupational Safety and Health;
(d) Rehabilitation of the disabled and injured persons;
(e) Implementation of Better Work Program.

13. Assessment on structural, fire & electrical integrity: With the assistance of ILO and under the supervision on National Tripartite Committee (NTC), a plan for assessment of building, fire and electrical safety of all 3532 active export oriented RMG/Knitwear factories has been developed. A Common Standard has been developed for assessment of fire, electrical and building safety of the factories by all initiatives such as National Tripartite Plan of Action for Fire and Structural

Integrity (NTPA); the Bangladesh Accord on Fire and Building Safety (ACCORD); and Alliance for Bangladesh Worker Safety (ALLIANCE).

National Initiatives, ACCORD & ALLIANCE are carrying out the assessment for structural integrity, fire and electrical safety of the RMG factory buildings. In the meantime 2783 factories (845 under National Initiatives, 1291 by ACCORD and 647 by ALLIANCE) have been assessed. To expedite the assessment process, two private sector companies-TUV-SUD Bangladesh Pvt Ltd, and Veritas Engineering & Consulting-under National Initiatives have been engaged in last January. The primary assessment is expected to be completed by May 2015.

According to the recommendation of Review Panel, 32 factories have been fully closed and 26 factories have been partially closed for safety reason. Assessment reports have been sent to concern factory for implementation of detailed engineering assessment and to the District offices of DIFE for close monitoring and supervision. All the factories have started remediation according to the recommendation of assessing authorities. In this regard DIFE has started monitoring those remedial measures taken by factory owners. Two taskforces are working to implement the remedial measures taken by the factory owners.

14. Better Work Program: Implementation of Better Work Program in Ready-Made Garments industry has been launched on 22/10/2013 by ILO. About 300 factories are expected to participate in the Programme.

15. Strengthen of Ministry and the Department of Labour:

(a) The strength of the Ministry of Labour and Employment has been enhanced by creating new posts.

(b) Government has taken steps to upgrade the Directorate of Labour to a Department with increased number of manpower.

16. Training activities by Department of Labour: Under a project on "Promoting Fundamental Principles and Rights at Work in Bangladesh (FPRW)" funded by USDoL and implemented by the ILO training programmes have been conducted for the workers, trade union leaders and employers for capacity building of trade union representatives' and employers' organizations and promoting effective labour-management relations. During Jan 2012 to Feb 2015 a total of 2,611 (Female 1,147) workers' representatives, 251 (F: 85) employers' representatives and 312 (F: 82) government officials from the MoLE, IRI and BEPZA (including 82 female officials) have received training on issues of their respective work, i.e.,

workers' rights and responsibilities, negotiation techniques (IBN approach), labour law etc. The Government is working to raise awareness of the employers and workers regarding the trade union rights and responsibilities by organizing training and education programme through 4 Industrial Relations Institutes (IRI) under the Department of Labour.

17. Co-operation agreement with Germany: A co-operation agreement has been signed on 9 December 2014 among Bangladesh Labour Welfare Foundation (BLWF) of Ministry of Labour & Employment, The Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) of Germany and The Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit Bangladesh (GIZ) to promote an exchange on work injury insurance between Germany and Bangladesh.

18. Letter of intent with Denmark: A letter of intent between the Ministry of Labour & Employment & the Ministry of Employment, Kingdom of Denmark has been signed on 19 March 2015 to jointly explore the possibility of engaging in a strategic sector co-operation on working environment, focusing in particular on Occupational Safety and Health (OSH) in the Ready Made Garment sector.

19. Study by BIDS: A study has been conducted by BIDS with government financing under the Ministry of Labour & Employment to determine the number of factories on the basis of locality, the number of workers and employees working and to identify the existing problem and measures to promote this sector further in the coming year. The Government is taking steps to implement the recommendations in the study.

20. Compensation and Rehabilitation: After tragic incident of Rana Plaza collapse the main challenge was to compensate and rehabilitate the victims and their families. In this process along with the Government, the employers and international brands and buyers came forward to compensate the victims.

(a) From Government side each family of 976 deceased persons has been provided Tk. 1-5 lakh from the Prime Minister's Relief and Welfare Fund. In addition to that each of the 38 workers who lost their limbs has received Tk.10-15 lakh as grant. In total more than Tk. 22 crore 93 lac (app.) has been disbursed from the Prime Minister's Relief and Welfare Fund as financial assistance.

(b) Government provided all sorts of medical facilities of its own expenses to more than 1000 injured persons. With the assistance of the Govt. of Thailand 107 amputees (including 5 amputees of Rana Plaza accident) artificial limbs were provided.

(c) A total of Tk. 50 lac has been given from Prime Minister's Relief & Welfare Fund for DNA test of the unidentified dead bodies of Rana Plaza incident.

(d) Each family of identified 844 dead persons has been received Tk. 20,000/- (Twenty thousand) for funeral and an amount of Tk. 5,000/-(Five thousand) has been given to each 844 injured workers through Dhaka District Administration. Total amount of Tk. 2 crore 54 lac (app.) has been given by the District Administration.

(e) A total of 2785 affected workers/employees of 5 factories housed in that building have been provided with all the dues including salary and allowances by BGMEA. The BGMEA has spent Tk.14 crore 40 lac (app.) for the victims.

(f) With the help of Brands and Buyers and under the neutral Chair of ILO a Global Trust Fund has been established to provide compensation for the victims of the Rana Plaza collapse. More than US $19 million has already been raised for this fund. As of 8th April 2015 a total of Tk. 75.89 Crore (app.) (about US$ 9.84 million) has been already been disbursed to 3 thousand beneficiaries.

(g) The PRIMARK, an international buyer, within a week of Rana Plaza collapse, provided weekly food aid for one month to about 1300 families through local NGO. As short-term financial assistance Primark provided nine months wage to 3600 workers. As long-term compensation Primark distributed a total of Tk. 86.90 Crore (app.) (about US$ 11.0 million) to 668 workers or their beneficiaries of New Wave Bottoms.

Rana Plaza Co-ordination Cell (RPCC): Since the official inauguration on 7th November, 2013 RPCC with this support of NSDC secretariat, ILO and other stakeholders has provided different services to the victims of Rana Plaza collapse. The services include medical support, Job Support/Skills Training, Small Business/Entrepreneurship Development, Financial support/Compensation, Information and advices etc. Till now the Cell communicated more than 4123 people (relatives of deceased/missing workers, survivors, rescue workers and others). The Cell is playing a vital role as a contact point for the victims as well as the service providers.

Other activities by Government and other relevant stakeholders:

1. Visit of ILO DDG: A high level team from ILO Head Quarter, Geneva headed by one Deputy Director General visited Bangladesh from 1-4 May 2013 to express sympathy and co-operation on tragic accident at Rana Plaza. A tripartite declaration was expressed on the 4th of May 2013 with the assistance of ILO with a view to continue export of ready-Made Garments items in overseas market and combating the consequences of Savar incident.

2. Sustainability Compact: Bangladesh, European Union, United States of America and International Labour Organization (ILO) have jointly adopted 'Sustainability Compact' with a view to take joint initiatives to improve labour welfare and safety of working environment in the RMG sector. A stock taking meeting held on 30th October 2014 in Brussels to review the progress of Sustainability Compact.

3. Bangladesh Action Plan: Bangladesh Action Plan 2013 proposed by United States of America to improve building and fire safety and working environment ILO, Development Partners and the foreign buyers have jointly taken the following initiatives:

(i) Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh signed by European buyers;

(ii) Bangladesh Safety Alliance signed by North American buyers;

(iii) Improving working conditions in the Ready-Made Garments Sector Project of $24.5 million proposed by ILO;

(iv) A project of Tk. 100 crore of JAICA for factory building inspection and relocation;

(v) 205 million project of the United State of America to ensure workers right and improve fire safety.

(vi) A project by GIZ to rehabilitate the disabled workers affected by Rana Plaza collapse.

4. Cabinet Committee on Garments Sector: Government formed an eleven member 'Cabinet Committee on Garments Sector' headed by the Honorable Minister, Ministry of Labour & Employment. The committee has formed 2 Task Forces named 'Task Force in Building and fire safety in Ready Made Garments Industry' and 'Task Force on Expansion and Simplification of Ready Made Garments Industry'.

5. Committee on RMG factory improvement: An eighteen member committee headed by Honorable Minister for Jute & Textile has submitted their report with recommendation to protect safe working environment, prevention of accidents and ensure labour welfare in the RMG factories. Government has already taken steps to implement the recommendations of the committee.

6. Compensation assessment committee by Honorable High Court: A committee headed by the GOC, Ninth Infantry Division was formed as per directions of the Honorable High Court to determine the exact amount of compensation payable to the deceased and injured workers in Rana Plaza accident. The committee has submitted its report to the Honorable High Court.

7. Tripartite Standing Committee: A tripartite standing committee headed by the Secretary, Ministry of Commerce to provide all out support to the Cabinet Committee on Garments Industry was also formed.

8. 3+5 Committee: Three secretaries of Commerce Ministry, Labour Ministry and Foreign Ministry and five ambassadors/high commissioners of USA, Canada, EU, UK and the Netherlands constituted 3+5 Committee. The committee holds regular meetings to assess the progress of the Government's commitment in improving working conditions and labour welfare in Bangladesh.

9. Garments Industry Village: A committee headed by a Director General of the Prime Minister's office is functioning to establish a 'Garments Industry Village' on 530 acres of land at Baushia under Gajaria upazilla in Munshiganj district.

10 Activities of Department of Fire Service & Civil Defense: The Ministry of Home Affairs has approved in principle the proposal of establishing nine new fire stations for Department of Fire Service & Civil Defense. The number of inspectors has been increased from 50 to 268 in the Department of Fire Service and Civil Defense by the Ministry of Home Affairs.

11. Increase of Inspectors of RAJUK and CDA: Two different proposals to increase the number of inspectors in the Rajdhani Unnayan Kartipakshya (RAJUK) and Chittagong Development Authority (CDA) has been approved by Ministry of Housing & Works.

12. Reduction of Tax & Duty: A minimum rate of tax was settled by the Govt. regarding import of fire extinguishing equipments in the fiscal year 2013-2014. Government has also made provision for duty free import of prefabricated building materials, fire resistant doors, sprinkler system and equipments, emergency light with exit sign double head etc.

13. Housing Loan: A Memorandum of Understanding has been signed between Housing Fund of Bangladesh Bank & BGMEA to provide loan at the rate of 2% interest from the fund to the owners of the RMG factories for construction of Dormitory for the workers.

14. Adopted of condolence motion: The Cabinet adopted a condolence motion and also declared 25 April 2013 as National Mourning Day on the tragic building collapse of Rana Plaza. The National Flag was at half-mast and all the garments factories remain closed on that day.

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

দু'টি কথা

মহান মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য এক অবিস্মরণীয় দিন। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১ মে সংগ্রাম ও চেতনায় উদ্বেলিত, অনুপ্রাণিত হওয়ার দিন। বিশ্বব্যাপী এ দিনটি পালিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের দীপ্ত শপথ গ্রহণের জন্য। বাংলাদেশে এ দিনটি পালিত হচ্ছে সরকারীভাবে যথাযথ মর্যাদার সাথে। মে দিবস শিক্ষা দেয় ঐক্য, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার। এসব আদর্শ যে কোন দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধশালী ও স্থিতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মে দিবসের এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেই মহান মে দিবস উদ্‌যাপন স্বার্থক হবে।

মহান মে দিবসের পটভূমি, তাৎপর্য এর মাধ্যমে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের যে অর্জন তাকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশে এ দিবসটি প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। মে দিবসের অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে মহান মে দিবসের তাৎপর্য ও গৃহীত কর্মসূচীর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় স্মরণিকা প্রকাশের জন্য সদয় নির্দেশনা এবং উপদেশ দিয়েছেন যার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মহান মে দিবস, ২০১৪ উদ্‌যাপন কমিটির সক্রিয় সদস্য যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান এর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

এবারের মহান মে দিবস উদ্‌যাপনে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, গ্রামীণ ফোন লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ, প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল), বাংলালিংক, এয়ারটেল, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ, থারমেক্স গ্রুপ লিঃ, বাটা সু কোম্পানী বাংলাদেশ লিঃ, বসুন্ধরা গ্রুপ, কোটস বাংলাদেশ লিঃ, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লিঃ, নেস্‌লে বাংলাদেশ লিঃ, নোভারটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা, আকিজ গ্রুপ, রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেল, বেক্সিকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিঃ, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ, দি ওয়েস্টিন হোটেল ঢাকা, এসিআই লিঃ, বি,আর,বি, ক্যাবলস্ লিঃ, ওয়ালটন বাংলাদেশ লিঃ, লিনডে বাংলাদেশ লিঃ, নীট কনসার্ন লিঃ, মেট্রো গ্রুপ, দাদা (ঢাকা) লিঃ, সিন সিন লিঃ, অবন্তি গ্রুপ, ফকির এ্যাপারেলস, ফকির ফ্যাশন, মেটাডোর বল পেন ইন্ডাঃ লিঃ, বার্জার পেইন্ট লিঃ, পিএইচপি গ্রুপ, প্রাণ গ্রুপ, বিএসআরএম গ্রুপ, আফতাব গ্রুপ, নাভানা গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস, অপসনিন ফার্মা, এরিষ্টোফার্মা লিঃ, ফকির নিটিং লিঃ, মাইক্রোফাইবার লিঃ, আর এ কে গ্রুপ, অন্তিম গ্রুপ এবং ডিবিএল গ্রুপ আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন স্মরণিকা প্রকাশে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তথাপি এ প্রকাশনায় নানা অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘাটতির বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। নানা ব্যস্ততার ভেতরও যাঁরা লেখা দিয়ে স্মরণিকা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা। স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদের সক্রিয় সদস্যবৃন্দের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া, স্মরণিকা প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মে দিবস - ২০১৫

স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ

জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন যুগ্ম সচিব (আইও)	আহবায়ক
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম উপ সচিব (শ্রম)	সদস্য
জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া উপ সচিব (প্রশাসন)	সদস্য
জনাব এ,বি,এম, সিরাজুল হক উপ সচিব (বাজেট)	সদস্য
জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান উপ সচিব	সদস্য
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির সিনিয়র সহকারী প্রধান (শ্রম)	সদস্য
জনাব এম জহুরুল হক যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)	সদস্য
জনব এস, এম, এনামুল হক উপ শ্রম পরিচালক	সদস্য
জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম সহকারী শ্রম পরিচালক	সদস্য

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

সিটিজেন চার্টার

শ্রম পরিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম পরিদপ্তর শ্রম আইনসমূহসহ অন্যান্য শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ পরিদপ্তর শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা ও বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উৎপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। শ্রম পরিদপ্তর ১৭৬ জন কর্মকর্তা এবং ৫৩৬ জন কর্মচারী সহ সর্বমোট ৭১২ জনবল কর্মরত রয়েছে। একজন পরিচালক এ পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকতা।

শ্রম পরিদপ্তরের সেবাসমূহ

- ট্রেড ইউনিয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পান ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং অন্যান্য শ্রম আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে শ্রম পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ইউনিট, ৪টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ৩০টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে সরাসরি যোগাযোগ করে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ শ্রম পরিদপ্তর প্রদত্ত নিম্নোক্ত সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারেনঃ

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
১।	ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রেজিস্ট্রেশন ঃ (ক) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন	☐ কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান সমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্সের নিকট দরখাস্ত করবেন (শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক) ☐ যদি শ্রম পরিচালক উক্ত দরখাস্তে অত্যাবশ্যক কোন তথ্যের অসম্পূর্ণতা দেখতে পান তাহলে তিনি দরখাস্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে আপত্তি সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নকে লিখিত ভাবে জানাবেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন তা প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপত্তির জবাব দিবে। ☐ শ্রম পরিচালক কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সন্তোষজনক ভাবে মিটানো হলে নির্ধারিত রেজিষ্টারে তা রেজিষ্ট্রি করা হবে এবং রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিষ্ট্রিকরণ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হবে। ☐ যদি আপত্তি বা আপত্তিসমূহ সন্তোষজনক/আইননুগভাবে মিটানো না হয় তাহলে রেজিষ্ট্রিকরণ দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করা হবে। ☐ যে ক্ষেত্রে শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক কোন দরখাস্ত প্রত্যাখান করেন অথবা আপত্তি মিটানোর পরেও আইনে উল্লিখিত ৬০(ষাট) দিন সময়সীমা মধ্যে রেজিষ্ট্রি প্রদান না করলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন উক্তরুপ প্রত্যাখানের তারিখ অথবা উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে আপীল করতে পারে। ☐ শ্রম আদালতে আপীলটি শুনানীর পর তা উপযুক্ত বিবেচনা করলে রায়ের/কারণ লিপিবদ্ধ করে শ্রমপরিচালক/ সংশ্লিষ্ট যুগ্ম শ্রম পরিচালককে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে অথবা আইনানুগ অসম্পূর্নতার কারণে আপীলটি খারিজ করতে পারবে। ☐ শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আদালতে আদেশ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রম আপীল আদালতে আপীল দায়ের করতে পারবে এবং এ বিষয়ে আপীল আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।	শ্রম পরিচালক ও যুগ্ম শ্রম পরিচালকের কার্যালয় সমূহ (শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
	(খ) ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রেজিস্ট্রেশন	☐ কোন ট্রেড ইউনিয়নের ফেডারেশন রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য পেশাকৃত দরখাস্তে ফেডারেশনভূক্ত সকল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ দরখাস্ত করবেন। ☐ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের বিধানসমূহ যেরূপ প্রযোজ্য হয় ফেডারেশনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে। ☐ বেসিক ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন ফি ৩০০/- টাকা এবং ফেডারেশন রেজিষ্ট্রেশন ফি ৬০০/- টাকা মাত্র।	

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন /প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
২।	সিবিএ নির্ধারণ	☐ কোন প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে তাদের মধ্যে থেকে একটি ইউনিয়নকে গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) ঘোষণা করতে হবে।	শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক আইনের বিধান মোতাবেক স্ব স্ব আওতাভূক্ত এলাকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সিবিএ নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ
৩।	শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	☐ কোন মালিক অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক (একে অপরের বরাবরে) শিল্প বিরোধ উত্থাপিত হতে পারে। ☐ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ইচ্ছুক দু'পক্ষের (মালিক ও শ্রমিক) মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে শিল্প বিরোধ সম্পর্কে উপযুক্ত সালিসকে অবহিত করে সালিসীর মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য তাকে লিখিত অনুরোধ করতে হবে। ☐ কোন নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত/ নিযুক্ত সালিসকারকের নিকট বিরোধটি উপস্থাপন করতে হবে। ☐ সালিসকারক (কনসিলিয়েটর) কর্তৃক আহবানকৃত সভায় বিরোধের পক্ষগণ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে হাজির হবেন এবং আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতির প্রেক্ষিতে বিরোধটির সমাধান হবে। ☐ সালিস নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে এবং উভয়পক্ষ সম্মত হলে কোন মধ্যস্ততাকারীর নিকট বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে। উভয়পক্ষ সম্মত না হলে সালিস ব্যর্থতার ৩ দিনের মধ্যে ব্যর্থতার প্রত্যয়নপত্র দিবেন। ☐ মধ্যস্থতাকারীর প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং রোয়েদাদ প্রদানের কপি উভয়পক্ষ ও সরকারকে ... ত হবে। ☐ সংক্ষুব্ধ কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রম আদালতে যেতে পারে।	আঞ্চলিক/বিভাগীয় এবং শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়
৪।	শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা	☐ দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ৩০টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে আসছে। ☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার-পরিকল্পনা সেবা, চিত্তবিনোদন সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি শ্রম কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। ☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ থেকে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়ে থাকেন। ☐ শ্রমিক পরিবারকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তা করা হয়।	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন /প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
		☐ কেন্দ্রের শ্রম কল্যাণ সংগঠকগণ শ্রমিকদের সংগঠিত করেন এবং শ্রমিক কলোনীগুলো পরিদর্শন করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে পরমর্শ প্রদান করে থাকেন। ☐ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন প্রকার চিত্র বিনোদন সামগ্রী (সংবাদপত্র, টিভি, বই-পস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম) থাকে। শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যগণ এগুলোর সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন ☐ কিছু কিছু শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে কোন কোন সময় শ্রমিকদের জন্য "শ্রমিক প্রশিক্ষণ কোর্স" শীর্ষক ১ (এক) সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকরা দেশের শ্রম আইন, শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব,উৎপাদনশীলতা, কর্মপরিবেশ,পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে।	
৫।	প্রশিক্ষণ প্রদান	☐ দেশের ৪টি পুরাতন বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম রাজশাহী ও খুলনা) ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন রয়েছে। এসব শিক্ষায়তনে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দু'টি কোর্স অন্যতম ঃ- **(ক) চার সপ্তাহব্যাপী শিল্প সম্পর্কে কোর্স ঃ** ☐ শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এ কোর্সে অংশগ্রহণ করে থাকেন। শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম প্রশাসন,আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কার্যাবলী, বিভিন্ন শ্রম কনভেনশন এবং চলমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত থাকে। **(খ) শ্রমিক শিক্ষা কোর্স ঃ** ☐ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সমূহে এবং বিভিন্ন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য এক সপ্তাহ মেয়াদী ও প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। ☐ প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ জন প্রতি দৈনিক টাকা ১৫০/- হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়ে থাকেন।	শিল্প সম্পর্ক (IRI) শিক্ষায়তন সমূহ
৬।	কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে শ্রম সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ	☐ প্রতি বছর দেশের কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে শ্রম আইনের আওতায় নির্ধারিত ফরমে শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবছর সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত একটি লেবার জার্ণাল' শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশ করা হয়। ☐ নির্ধারিত মূল্যে যে কেউ শ্রম পরিদপ্তর থেকে লেবার জার্ণাল" সংগ্রহ করতে পারেন।	শ্রম পরিদপ্তরের পরিসংখ্যান শাখা।

শ্রম পরিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস সমূহের নাম ও ঠিকানা

১. যুগ্ম শ্রম পরিচালক, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ইউনিট, ১৯৬, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০।

২. যুগ্ম শ্রম পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ১৯৬, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০।

৩. যুগ্ম শ্রম পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, জাম্বুরীমাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৪. যুগ্ম শ্রম পরিচালক, খুলনা বিভাগ, বয়রা, খুলনা।

৫. যুগ্ম শ্রম পরিচালক, রাজশাহী বিভাগ, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।

৬. অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, মন্নুনগর, টঙ্গী, গাজীপুর।

৭. অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

৮. অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, সোনালী জুট মিলস, মীরের ডাংগা, খুলনা।

৯. অধ্যক্ষ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ক্যান্টনমেন্ট, তেরখাদা, রাজশাহী।

১০. উপ শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, চকসূত্রাপুর, বগুড়া।

১১. উপ শ্রম পরিচালক, চা-শিল্প শ্রম কল্যাণ বিভাগ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

১২. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

১৩. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, মন্নুনগর, টুংগী, গাজীপুর।

১৪. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সাটিরপাড়া, নরসিংদী।

১৫. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভবন নং ২, কক্ষ নং ২০৫, সিলেট।

১৬. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, হোল্ডিং নং ১০৩, ব্লক এ, কলাবাগান হাউজিং, ধর্মপুর, কুমিল্লা।

১৭. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, পুরাণবাজার, চাঁদপুর।

১৮. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৫ মাহতাবুদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।

১৯. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, মংলা, বাগেরহাট।

২০. সহকারী শ্রম পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, মুলাটোলা, রংপুর।

২১. চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও ঢাকা।

২২. চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মুন্নুনগর, টংগী গাজীপুর।

২৩. চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শিমলা বাজার, সরিষাবাড়ী,জামালপুর।

২৪. চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

২৫. চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

২৬. চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সাটিরপাড়া, নরসিংদী।

২৭. চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পলাশ, ঘোড়াশাল।

২৮. চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

২৯ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পুরাণ বাজার, চাঁদপুর।

৩০ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ষোল শহর, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩১ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কালুরঘাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

৩২ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, খান জাহান আলী রোড, রুপসা, খুলনা।

৩৩ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, খালিশপুর, খুলনা।

৩৪ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলা, বাগেরহাট।

৩৫ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ৫, মাহতাবুদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।

৩৬ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।

৩৭ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী।

৩৮ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ফজলুল হক রোড, মিরপুর, সিরাজগঞ্জ।

৩৯ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চকসূত্রাপুর, বগুড়া।

৪০ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

৪১ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গোডাউন রোড, গাইবান্ধা।

৪২ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ফুসকরী খেজুরী ছড়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

৪৩ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শমশের নগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৪৪ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পাত্রখোলা চা বাগান, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৪৫ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চন্ডিছড়া চা বাগান, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।

৪৬ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড় চা বাগান, জুরি, মৌলভীবাজার।

৪৭ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, লুয়াইউনী চা বাগান, কাজলধারা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

৪৮ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চিকনাগুল খান চা বাগান, সিলেট।

৪৯ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কলেজ রোড, লালমনিরহাট

৫০ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

৫১ চিকিৎসা কর্মকর্তা, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ঘাঘরা, রাঙ্গামাটি।

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

সিটিজেন চার্টার

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কনভেনশন নং ৮১ এর বিধান অনুযায়ী দেশেরে শিল্পক্ষেত্রে কার্যকর ও ফলপ্রসূ শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রম গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭০ সনে শ্রম পরিদপ্তর হতে বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর" যাত্রা শুরু করে। কর্মক্ষেত্রে কাজের শর্তাবলী, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানবলির যথাযথ প্রয়োগের সাথে জড়িত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর ঢাকায় ১টি সদর দপ্তর, ৪টি বিভাগীয় দপ্তর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় দপ্তর, বগুড়া), ৪টি আঞ্চলিক দপ্তর এবং ২৩টি শাখা অফিসের ২০৪ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় গুরুত্ব অনুসারে গত ১৫ জানুয়ারী ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরে জনবল ৩১৪ জনের স্থলে ৯৯৩ জন এ উন্নীত করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের ফলে দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নতুন নতুন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যেখানে কর্মরত আছেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারী। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এ বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীগণের অধিকার, কাজের শর্তাবলী, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানাবলির যথাযথ প্রয়োগের গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

কার্যাবলী

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বিদ্যমান বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, শ্রম কল্যাণ, মজুরী পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় বাস্তবায়নের জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন ও সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা;

- শ্রমিকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগ ভাবে নিস্পত্তি করা;
- আইন অমান্যকারী মালিক/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রজু করা;
- কারখানা নির্মান, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নক্সা অনুমোদন;
- কারখানা রেজিষ্ট্রেশন প্রদান ও সনদপত্র ইস্যু করা;
- শ্রম আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন ও ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্পাঞ্চল বা বিশেষ ধরণের শিল্পের শ্রমিক মালিকগণের সমন্বয়ে মোটিভেশন কর্মশালার আয়োজন করা;
- জনস্বার্থে বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় শ্রম আইনের কতিপয় বিধানসমূহ হতে অব্যাহতি প্রধান করা;
- শ্রম আইনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মাসিক, পাক্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালার সংশোধনসহ শ্রম আইন বাস্তবায়ন, প্রণয়ন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করা;
- আই, এল, ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই, এল,ও এর বিবিধ প্রশ্নমালার জবাব প্রদান করা;
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সার্ভে রিপোর্ট তৈরী সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করা;
- শ্রম পরিদর্শন, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>প্রদত্ত সেবা</th><th>সেবা পাওয়ার পদ্ধতি</th><th>সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়</th></tr>
<tr><td></td><td>কারখানা রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন</td><td>
★ ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ মোতাবেক কলকারখানা কর্তৃপক্ষকে কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণে/ রেজিস্ট্রেশন অথবা লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়নের জন্য মহা পরিদর্শক/উপ-মহা পরিদর্শক এর বরাবরে আবেদন করতে হবে।
★ খ) লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন/নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ-
১। কারখানার বিস্তারিত নির্মাণ নক্সা;
২। ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি;
৩। নির্ধারিত ১ নং ২ নং ফরমের তথ্যাদি;
৪। মেমোরেন্ডাম (লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে):
৫। বিধিতে উল্লিখিত হারে চালানের মাধ্যমে লাইসেন্সে ফি এবং নবায়ন ফি পরিশোধের মূল কপি।
★ গ) শ্রমিক সংখ্যানুযায়ী ক্যাটাগরী ভিত্তিক লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন ফি (Scale of fees payable for licence and annual renewal of licence by factories) ঃ
<table>
<tr><th colspan="2">Maximum nubmer of workers to be employed on any day during the year</th><th>Licence Fees (Tk)</th><th>Renewal Licence Fees (Tk)</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td>A</td><td>05-30</td><td>500/-</td><td>250/-</td></tr>
<tr><td>B</td><td>31-50</td><td>1,000/-</td><td>500/-</td></tr>
<tr><td>C</td><td>51-100</td><td>1,500/-</td><td>800/-</td></tr>
<tr><td>D</td><td>101-200</td><td>2,500/-</td><td>1,200/-</td></tr>
<tr><td>E</td><td>201-300</td><td>3,000/-</td><td>1,500/-</td></tr>
<tr><td>F</td><td>301-500</td><td>5,000/-</td><td>2,500/-</td></tr>
<tr><td>G</td><td>501-750</td><td>6,000/-</td><td>3,000/-</td></tr>
<tr><td>H</td><td>751-1000</td><td>8,000/</td><td>4,000/-</td></tr>
<tr><td>I</td><td>1001-2000</td><td>10,000/-</td><td>5,000/-</td></tr>
<tr><td>J</td><td>2001-3000</td><td>12,000/</td><td>6000/-</td></tr>
<tr><td>L</td><td>3001-5000</td><td>15,000/-</td><td>7,000/-</td></tr>
<tr><td>L</td><td>5001 of above</td><td>18,000/-</td><td>8,000/-</td></tr>
</table>
★ ঘ) কারখানা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আবেদন পাওয়ার পর সে বিষয়ের উপর সরেজমিনে তদন্ত করা হয় এবং যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি নিস্পত্তি করা হয়।
★ ঙ) ইস্যুকৃত কারখানার লাইসেন্সসমূহ প্রতিবছর ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নবায়ন করতে হবে।
★ চ) কারখানা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আবেদন প্রাপ্তির ২ (দুই) মাসের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি নিস্পত্তি করতে হয়।
★ ছ) যদি কর্তৃপক্ষ কোন কারণে কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণ অথবা রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারী উক্ত অপরাগতা প্রকাশের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকারের কাছে আপীল করতে পারবেন।
</td><td>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে দপ্তর</td></tr>
</table>

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা পাওয়ার পদ্ধতি	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
২।	শিল্প-কারখানা/প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের চাকুরী বিধি অনুমোদন কর	★ ক) শিল্প-কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত চাকুরী বিধি প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মহাপরিদর্শকের নিকট আবেদন করবে। ★ খ) আবেদন প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মহাপরিদর্শক যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন নিস্পত্তি করবেন। মহা পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন ব্যতীত কোন চাকুরী বিধি কার্যকর হবে না। ★ গ) আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিদ্যমান শ্রম আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলে অনুমোদন প্রদান করা হয়। অসঙ্গতিপূর্ণ হলে সুপারিশসহ সংশোধনের জন্য তা আবেদনকারী/কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত দেয়া হয়। ★ ঘ) মহাপরিদর্শকের আদেশে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যাক্তি আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল পেশ করতে পারবেন।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর
৩।	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর বিভিন্ন ধারা ও বিধি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া	★ ক) বিভিন্ন শিল্প-কারখানা মালিক/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পত্র, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল এর মাধ্যমে শ্রম আইন সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উত্তর বা জবাব যথাযথ মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ★ খ) শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা ও বিধি হতে কোন শিল্প-কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি দেয়া হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়। ★ গ) যে সকল জটিল বিষয়ে ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ/ মতামত বা অব্যাহতি দেয়া মহাপরিদর্শকের এখতিয়ার বহির্ভূত, সেই সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা পাওয়ার পর তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়। ★ ঘ) কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বিভিন্ন প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা বা অব্যাহতির জন্য লিখিত আবেদন পাওয়ার পর ৭-৮ দিনের মধ্যে অত্র অধিদপ্তরের উত্তর বা মতামত যথাযথ মাধ্যমে জানানো হয়। ★ ঙ) ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ ব্যতীত ৭-৮ দিনের মধ্যে সেবা প্রদানে ব্যর্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ শাস্তির ব্যবস্থা গৃহীত হয়।	
৪।	শ্রমিক কর্তৃক আনীত লিখিত অভিযোগের বিষয়সমূহ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ	★ ক) শ্রমিক/কর্মচারীদের কল্যাণ/স্বাস্থ্য/নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আওতাধীন কোন সুযোগ সুবিধা হতে মালিক/কর্তৃপক্ষ বঞ্চিত করলে বা তা লংঘন করা হলে এই সকল বিষয় অত্র অধিদপ্তরের গোচরীভূত হলে বা এই সকল বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর/আঞ্চলিক অফিস/শাখা অফিসসমূহে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাধ্যমে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ★ খ) অভিযোগ গোচরীভূত হওয়ার পর অথবা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী ৭-১৫ দিনের মধ্যে সরেজমিনে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়। ★ গ) তদন্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়ে পত্র মারফত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং ১ (এক) হতে দেড় মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ★ ঘ) অত্র অধিদপ্তরে কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলাজনিত ব্যর্থতার কারণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং শাখা অফিসসমূহ

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা পাওয়ার পদ্ধতি	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
	ডক শ্রমিকদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াবলী	★ ডক শ্রমিকদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করার দায়িত্ব অত্র অধিদপ্তরের যেমন: উপকূলের কোন কর্মস্থলে ডক, পোতাশ্রয়, ঘাট, জেটি, নৌ-পথ এবং জাহাজে কর্মরত শ্রমিকদের সার্বিক নিরাত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।	জেলা পর্যায় দপ্তর।
	অত্র দপ্তরের কার্যাবলীর বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান	★ ক) অত্র অধিদপ্তরের মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক তৈরি করা হয়। ★ খ) এছাড়াও রেজিষ্টার্ড কারখানার সংখ্যা, কারখানার শ্রেণী, শ্রমিক সংখ্যা, দূর্ঘটনা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন ধরণের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে রিপোর্ট তৈরী করা হয়।	সদর দপ্তর

শ্রম আইন মোতাবেক সাধারণ নির্দেশিকা

- কলকারখানায় সপ্তাহে ১ (এক) দিন এবং দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রতি সপ্তাহে অন্তত: ১ (দেড়) দিন ছুটি নিশ্চিত করুন।
- শ্রম আইন মোতাবেক শ্রমিকদের নিন্মতম মজুরী নিশ্চিত করুন।
- কোন শ্রমিকের যে মজুরী কাল সম্পর্কে তাহার মজুরী প্রদেয় হয় সেই কাল শেষ হওয়ার পরবর্তী ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে তাহার মজুরী পরিশোধ করিতে হইবে।
- বহুতল ভবনে স্থাপিত কারখানায় বিভিন্ন দূর্ঘটনা বিশেষ করে অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বিকল্প সিঁড়িপথসহ বিকল্প বহির্গমন দরজার ব্যবস্থা রাখুন। প্রতিটি কক্ষে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংরক্ষণ করুন।
- কাজ চলাকালে কারখানার বহির্গমন পথসহ সকল দরজা-জানালা খোলা রাখুন।
- কারখানার সকল সিঁড়িপথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চলাকালে বাঁধামুক্ত রাখুন।
- নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থাপত্য নক্সা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করে নিন।
- মাসে অন্তত ১ (এক) দিন অগ্নিনির্বাপক মহড়া করুন।
- কারখানার রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স নিশ্চিত করুন। এটা আপনার কারখানার সরকারী স্বীকৃতি।
- ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্যে কর্মরত শ্রমিকদের মেডিকেল চেক আপ করুন।
- আপনার শ্রমিককে নৈমিত্তিক, পীড়া, উৎসব ও বাৎসরিক ছুটি এবং মহিলা শ্রমিকদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ ছুটি ও সুবিধা প্রদান করুন।
- ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে কারখানায় কাজ করাবেন না।
- প্রতিটি শ্রমিককে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান করুন।
- শ্রমিকদের সার্ভিস বই সংরক্ষণ করুন।
- শ্রম আইন ভংগকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে আইনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস সমূহের নাম ও ঠিকানা

১. সদর দপ্তর, শ্রম ভবন (৮ম ও ৯ম তলা), ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

২. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, ২৯ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

৩. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।

৪. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, বয়রা, খুলনা।

৫. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, আমেনা স্বপ্ন টাওয়ার নামাপাড়া, ফতুল্লা স্টেডিয়াম, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

৬. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, ৭৭৫, দক্ষিণ চর্থা, সদর হাসপাতাল রোড, কুমিল্লা।

৭. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, ২৬/২, তরোয়া, জেলখানা রোড, নরসিংদী।

৮. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, ভানুগাছা এ্যাপ্রোচ রোড, (রেলগেট), খালেদা বুলবুল নিবাস, শ্যামলী আ/এ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

৯. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, ১৩৭/৭ ঈশান চক্র বক্রবর্তী রোড, পূর্ব শালবন, রংপুর।

১০. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, ৩২ বদরউদ্দিন ম্যানশন (৪র্থ তলা), কলেজ গেট, টঙ্গী, গাজীপুর।

১১. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, ভূইঁয়া ম্যানশন (২য় তলা), সদর হাসপাতাল রোড, পঞ্চসার, মুন্সীগঞ্জ।

১২. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, রাকুয়াইল সরকারি প্রাথমিক স্কুল রোড, ৭৪৬, রহমান ম্যানশন (৩য় তলা), গাইঠাল,কিশোরগঞ্জ।

১৩. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, জেলা পরিষদ ভবন, ময়নমসিংহ।

১৪. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, জেলা সদর রোড, আকুর টাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল।

১৫. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, মির্জা ভিলা (৩য় তলা), ৯/বি, পল্লবী আ/এ, পশ্চিম পাঠানটোলা, সিলেট।

১৬. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, ১৬৯৪ অনামিকা র‍্যাংকার্স হাউজ, কাশিপুর বাজার, বরিশাল।

১৭. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, বাড়ী নং ২৩৬, প্লট নং ৮, সেক্টর ৯, হাউজিং এস্টেট, শেখ হাটি বাবলাতলা, ঢাকা রোড, যশোর।

১৮. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, রাহাত ভিলা, ৫৪/১ ঝিনাইদহ রোড, উপজেলা মোড়, কুষ্টিয়া।

১৯. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, বালুয়াডাঙ্গা মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।

২০. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, লাইব্রেরী বাজার, ডি.সি রোড, পাবনা।

২১. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, ৬৯ আলম এ্যাপার্টমেন্ট, বিসিক মোড়, রাজশাহী।

২২. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, বানীকুঞ্জ সিরাজী বাড়ী, (প্রধান ডাকঘর সংলগ্ন), সিরাজগঞ্জ।

২৩. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, বাড়ী নং ৫৬, ব্লক-বি, গঙ্গাধর পট্টি, মানিকগঞ্জ।

২৪. উপ মহা পরিদর্শকের কার্যালয়, বাড়ী নং-জি-১২৫, রহমান নগর, বগুড়া।

মহান মে দিবস-২০১৫

উদযাপন উপলক্ষে গঠিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	ঃ	জনাব মিকাইল শিপার সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মুখ্য সমন্বয়ক	ঃ	জনাব সৈয়দ আহম্মদ মহা-পরিদর্শক (অতিঃ সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সমন্বয়ক	ঃ	জনাব এস, এম, আশরাফুজ্জামান শ্রম পরিচালক (যুগ্ম সচিব), শ্রম পরিদপ্তর

(০১) অতিথি তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ ও বিতরণ ঃ

১।	জনাব মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন	অতিরিক্ত সচিব
২।	জনাব ডাঃ এ.এম.এম আনিসুল আউয়াল	যুগ্ম-সচিব
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ সচিব (প্রশাসন)
৪।	জনাব মোঃ ওবাইদুল ইসলাম	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৫।	জনাব এম জহুরুল হক	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৬।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক
৭।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	উপ শ্রম পরিচালক
৮।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৯।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
১১।	জনাব সালাহ উদ্দিন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
১২।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক
১৩।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
১৪।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সহকারী শ্রম পরিচালক
১৫।	জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)

র‍্যালী ব্যবস্থাপনা ঃ

১।	জনাব এস, এম, আশরাফুজ্জামান	শ্রম পরিচালক
২।	জনাব মহিউদ্দিন আহম্মেদ খান	উপ-সচিব
৩।	জনাব মোঃ ওবাইদুল ইসলাম	যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৪।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	উপ শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ আলী তপাদার	সহকারী সচিব
৮।	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	উপ পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
১০।	জনাব মোঃ ইকবাল আহম্মেদ	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
১১।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
১২।	জনাব মঞ্জুর মোরশেদ	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
১৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ পাঠান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১৪।	জনাব মোঃ ফয়জুল্লাহ বিশ্বাস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ষ্টোর)

সেমিনার আয়োজন

১।	সৈয়দ আহম্মদ	মহাপরিদর্শক
২।	জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান	যুগ্ম সচিব (শ্রম)
৩।	জনাব মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
৪।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপ সচিব
৫।	বেগম জাহানার বেগম	উপ-সচিব
৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	উপ-সচিব
৭।	জনাব আ.ন.ম আজিজুল হক	উপ-প্রধান (পরিকল্পনা)
৮।	জনাব ওবাইদুল ইসলাম	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৯।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১।	জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান	যুগ্ম সচিব (শ্রম)
২।	জনাব মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
৩।	বেগম শাহীন আখতার	সিনিয়র সহকারী সচিব
৪।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৫।	বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমীর একজন প্রতিনিধি	
৬।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
৮।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সহকারী শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক

মেইন গেইট ও সড়ক দ্বীপ সজ্জিতকরণ এবং ব্যনার স্থাপন

১।	মোঃ মজিবুর রহমান	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
২।	জনাব মোঃ আ.ন.ম আজিজুল হক	উপ-প্রধান (পরি)
৩।	জনাব মোঃ ওবাইদুল ইসলাম	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৪।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব এম জহুরুল হক	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৬।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	উপ-শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক
৮।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব কবির উদ্দিন হাওলাদার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১০।	জনাব আব্দুস সাত্তার	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)

মূল্য প্রবেশ পথে অভ্যর্থনা

১।	জানাব মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন	অতিরিক্ত সচিব
২।	জানাব সৈয়দ আহম্মদ	মহা পরিদর্শক
৩।	জনাব এ,বি,এম, খোরশেদ আলম	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয়, ঢাকা
৪।	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
৫।	জনাব মোঃ এ, কে, ফজলুল হক	যুগ্ম সচিব (আইন ও আদালত)
৬।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্ম সচিব (আইও)
৭।	জনাব এস,এম, আশরাফুজ্জামান	শ্রম পরিচালক
৮।	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান	উপ সচিব

৯।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপ সচিব
১০।	বেগম জাহানারা বেগম	উপ-সচিব
১১।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সহকারী প্রধান (শ্রম)
১২।	জনাব মোঃ গোলাম রাব্বানী	সিনিয়র সহকারী প্রধান
১৩।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী সচিব

স্মরণিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনা

১।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্ম সচিব (আইও)	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপ সচিব (শ্রম)	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ সচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৪।	জনাব এ,বি,এম, সিরাজুল হক	উপ সচিব (বাজেট)	সদস্য
৫।	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ খান	উপ সচিব	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সহকারী প্রধান (শ্রম)	সদস্য
৭।	জনাব এম জহুরুল হক	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)	সদস্য
৮।	জনব এস,এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক	সদস্য
৯।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক	সদস্য

স্মরণিকা বিতরণ

১।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপ-সচিব
২।	জনবা এম জহুরুল হক	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৫।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৮।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক
৯।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সহকারী শ্রম পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ মাসুদ আলম	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)

আসন বিন্যাস ও স্টিকার তৈরি করা

১।	জনাব মোঃ এ, কে, ফজলুল হক	যুগ্ম সচিব (আইন ও আদালত)
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ সচিব (প্রশাশন)
৩।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সহকারী প্রধান (শ্রম)
৪।	জনাব মোঃ ওবাইদুল ইসলাম	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৫।	জনাব মোঃ গোলাম রাব্বানী	সিনিয়র সহকারী প্রধান
৬।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী সচিব
৭।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক
৮।	ডঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৯।	জনাব হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
১০।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সহকারী শ্রম পরিচালক
১১।	জানাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক

আসন সংরক্ষণ

১।	জনাব এ.বি.এম খোরশেদুল আলম	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয়, ঢাকা
২।	ডাঃ এ.এম.এম আনিসুল আউয়াল	যুগ্ম-সচিব
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ-সচিব (প্রশাসন)
৪।	জনাব বিজয় রঞ্জন সাহা	উপ-সচিব
৫।	বেগম জাহানারা বেগম	উপ-সচিব
৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	উপ-সচিব
৭।	জনাব আ.ন.ম আজিজুল হক	উপ-প্রধান (পরিকল্পনা)
৮।	জনাব মোঃ মতলেব হাওলাদার	সহকারী সচিব
৯।	জনাব মোঃ ওবাইদুল ইসলাম	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
১০।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক
১১।	জনাব মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
১২।	জনাব মোঃ ইকবাল আহম্মেদ	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
১৩।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
১৪।	মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
১৫।	জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)
১৬।	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল হক ভূইয়া	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেয়ার স্থাপন

১।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী সচিব (প্রশাসন)
২।	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	অফিস সহায়ক
৩।	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	অফিস সহায়ক
৪।	জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন	অফিস সহায়ক
৫।	জনাব মোঃ লিটন আহম্মেদ	অফিস সহায়ক

বহিরাঙ্গন অভ্যর্থনা

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ সচিব (প্রশাসন)
২।	জনাব মোঃ নজরুল আলম	উপ সচিব
৩।	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	উপ পরিচালক
৪।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব সালাহ উদ্দিন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ ইকবাল আহম্মেদ	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৮।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	অফিস সহকারী

আলোচনা মঞ্চ সজ্জিতকরণ

১।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	যুগ্ম সচিব (আইও)
২।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপ সচিব (শ্রম)
৩।	জনাব এস,এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব সালাহ উদ্দিন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ আব্দুল কাইউম	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৮।	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল হক ভূইয়া	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)

পবিত্র কোরআন শরীফ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল পাঠকারী ও সঞ্চালক আনা-নেওয়ার দায়িত্ব

১।	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	উপ পরিচালক
২।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান	সহকারী শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব নঈমুল আজিজ	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)
৬।	জনাব আব্দুস সাত্তার	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)

এস,বি/ডিউটি পাসের ব্যবস্থা করা

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ সচিব (প্রশাসন)
২।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৩।	জনাব মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ মাসুদ আলম	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)
৫।	জনাব মোঃ জহিরুল হক	পরিসংখ্যান সহকারী
৬।	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	হিসাব রক্ষক

রেডিও ও টিভিতে অনুষ্ঠান প্রচার

১।	জনাব অমর চান বণিক	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব
২।	জনাব এস,এম, আরিফুজ্জামান	তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা
৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ ইকবাল আহম্মেদ	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)

মোবইল/ব্যাগ সংরক্ষণ

১।	জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
২।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
৩।	জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৪।	জনাব সুব্রত নাথ	পরিসংখ্যান সহকারী
৫।	জনাব মোঃ আবুল বাশার	সার্টলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর

গেঞ্জি, টুপি বিতরণ

১।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
২।	জনাব মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব সালাহ উদ্দিন মাহমুদ	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল হক ভূইয়া	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
৫।	জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৬।	জনাব মোঃ আবুল খায়ের	সার্টলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
৭।	জনাব মোঃ আবদুস সামাদ সিকদার	দপ্তরী

ক্রেষ্ট সংরক্ষণ

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ সচিব (প্রশাসন)
২।	জনাব শামীমা আক্তার চৌধুরী	লাইব্রেরিয়ান

ফোকাল পয়েন্ট

১।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপ সচিব (শ্রম)
২।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)

দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি

১।	জনাব মোঃ ওবাইদুল ইসলাম	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
২।	জনাব মোহাম্মদ আমিনুল হক	যুগ্ম শ্রম পরিচালক (চঃ দাঃ)
৩।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	উপ শ্রম পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৫।	জনাব অধীর চন্দ্র বালা	রেজিষ্ট্রার

আয়-ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত কমিটি

১।	জনাব মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপ সচিব
৩।	জনাব মোঃ ওবাইদুল ইসলাম	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৪।	জনাব মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	উপ শ্রম পরিচালক
৬।	জনাব মোহাম্মদ আকতারুজ্জামান	সহকারী শ্রম পরিচালক

মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী, সচিব মহোদয়ের বাণী এবং মহাপরিদর্শক ও শ্রম পরিচালক এর বাণীর খসড়া তৈরী ও সংগ্রহের দায়িত্বে থাকেন যথাক্রমেঃ

১।	জনাব এস,এম, এনামুল হক	উপ শ্রম পরিচালক
২।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৩।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক
৪।	বেগম রাজিয়া সুলতানা	সহকারী শ্রম পরিচালক
৫।	মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৬।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	সহকারী শ্রম পরিচালক

প্রচার সংক্রান্ত কমিটি

১।	জনাব মোঃ ওবাইদুল ইসলাম	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
২।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	উপ শ্রম পরিচালক
৩।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
৪।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	সহকারী শ্রম পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী শ্রম পরিচালক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের ভাষনের খসড়া প্রস্তুত কমিটি

১।	জনাব এম জহুরুল হক	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)
২।	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মোল্লা	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
৩।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	উপ মহাপরিদর্শক (চঃ দাঃ)

বিজি প্রেসে দাওয়াত কার্ডের প্রুফ দেখা ছাপানোসহ দায়িত্বে থাকবেন

১।	জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান	উপ শ্রম পরিচালক
২।	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল হক ভূইয়া	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি"

অনুষ্ঠানসূচি

১ মে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ /১৮ বৈশাখ ১৪২২ বঙ্গাব্দ

স্থান ঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

বিকাল

৪.০০ মিঃ	ঃ	আমন্ত্রিত অতিথিদের আসন গ্রহণ।
৪.৩০ মিঃ	ঃ	প্রধান অতিথির আগমন।
৪.৩১ মিঃ	ঃ	পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ থেকে তেলাওয়াত/পাঠ।
৪.৩৯ মিঃ	ঃ	স্বাগত বক্তব্য ঃ **জনাব মিকাইল শিপার** সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৪.৪৪ মিঃ	ঃ	শ্রমিক প্রতিনিধির বক্তব্য ঃ **জনাব শুক্কুর মাহামুদ** সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ।
৪.৪৯ মিঃ	ঃ	মালিক প্রতিনিধির বক্তব্য ঃ **জনাব তপন চৌধুরী** সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন।
৪.৫৪ মিঃ	ঃ	আইএলও প্রতিনিধির বক্তব্য ঃ **Mr. Srinivas B. Reddy** ILO Country Director, Bangladesh.
৪.৫৯ মিঃ		বিশেষ অতিথির বক্তব্য ঃ **বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম. পি.** সভাপতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
৫.০৬ মিঃ	ঃ	সভাপতির বক্তব্য ঃ **জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম. পি.** মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ।
৫.১৬ মিঃ	ঃ	প্রধান অতিথির ভাষণ ঃ **শেখ হাসিনা** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

- অনুগ্রহপূর্বক আমন্ত্রণপত্র সাথে আনবেন। এ আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- ব্রীফকেস, মোবাইল ফোন, হাত ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, ক্যামেরা, ইত্যাদি সাথে না আনার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অনুষ্ঠান শুরুর অন্তত ৩০ মিঃ পূর্বে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহান মে দিবস-২০১৫

র‍্যালী-সেমিনার
উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কর্মসূচি
স্থান ঃ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জ

মে দিবস র‍্যালী

০১, মে শুক্রবার

সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় শ্রম ভবন থেকে আরম্ভ হয়ে দৈনিক বাংলার মোড় হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হবে।

মে দিবস সেমিনার

০৪, মে সোমবার

প্রথম সেমিনার	ঃ	সকাল ১০.৩০ টা থেকে বেলা ১.০০ টা পর্যন্ত।
আয়োজক	ঃ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স ও সেফটি এ্যান্ড রাইটস্‌।
বিষয়	ঃ	জাতীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল শক্তিশালীকরণ: ভূমিকা, প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক।
প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব মিকাইল শিপার, মাননীয় সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
বিশেষ অতিথি	ঃ	সৈয়দ আহম্মদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
		শাহ্‌ মোঃ আবু জাফর, যুগ্মসমন্বয়ক, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ।
		ড. হামিদা হোসেন, আহ্বায়ক, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম।
সভাপতি	ঃ	জনাব হাবিবুর রহমান সিরাজ, চেয়ারম্যান, বিলস্‌।

০৪, মে সোমবার

দ্বিতীয় সেমিনার	ঃ	বিকাল ৩.০০ টা থেকে ৫.০০ টা পর্যন্ত।
আয়োজক	ঃ	কর্মজীবী নারী ও ওশি ফাউন্ডেশন।
বিষয়	ঃ	অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণে আইনি সুরক্ষা ও করণীয়।
প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
বিশেষ অতিথি	ঃ	শিরীন আখতার, এম.পি, সদস্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
		জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম এম.পি, সদস্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।
সভাপতি	ঃ	রোকেয়া রফিক বেবী, নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবী নারী।

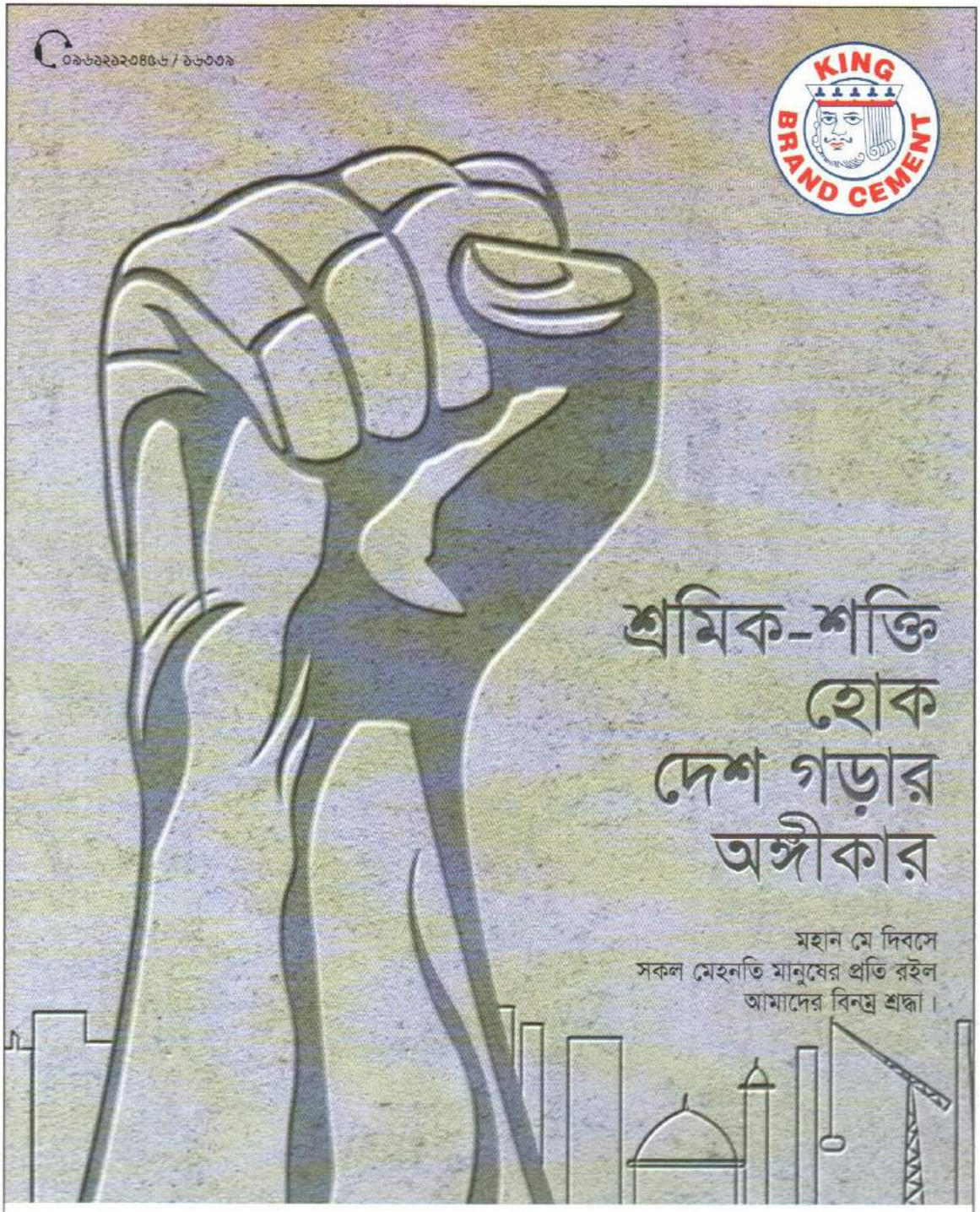

মেঘনা সিমেন্ট মিলস্ লিমিটেড

কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট

যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত

Unilever

গত ৫০ বছর ধরে ইউনিলিভার বাংলাদেশের মানুষের মন জয় করে চলছে বিভিন্ন রকম ভোগ্যপণ্যের সম্ভার নিয়ে। হুইল, রিন এবং ভিম ঘরের কাজকে আরো সহজ করে মন জয় করেছে গৃহিণীদের। লাইফবয়, পেপসোডেন্ট এবং পিওরইট নিশ্চিত করেছে লাখো পরিবারের সুস্বাস্থ্য। লাক্স ও ফেয়ার এন্ড লাভলী নারীদের করেছে আত্মবিশ্বাসী। বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে আজ পৌঁছে গেছে ইউনিলিভারের অন্তত একটি পণ্য। আজও, ইউনিলিভার তার ঐতিহ্যের ধারা বজায় রেখে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলছে একটি স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য। আমাদের সাফল্য শুধু ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিতে নির্ভর করে না, একইসাথে পরিবেশগত চাপ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারের উপরও নির্ভর করে। আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে আমরা "সাসটেইনেবল লিভিং" ধারণাটিকে ধারণ করে থাকি।

ইউনিলিভারের "সাসটেইনেবল লিভিং প্ল্যান"-এর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে লগ অন করুন: http://www.unilever.com.bd

Dove POND'S LUX AXE Vaseline Pepsodent CLEAR Rexona sunsilk

Fair & Lovely Wheel Lifebuoy Taaza Knorr Closeup Surf excel Rin Vim Unilever pureit

To find out more visit unilever.com or www.facebook.com/unilever